হরিষে-বিষাদ।

অথবা

নায়ক—নায়িকা শূন্য উপন্যাস।

"FICTIONS TO PLEASE SHOULD WEAR THE FACE OF TRUTH."

"কথাপি তোষয়েদ্বিজ্ঞং যদ্যসৌ-তথ্যবস্তুবেৎ"

হরিবংশম্

"স্বর্ণলতা" প্রণেতা

৺তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

বিরচিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

শ্রীশরৎকুমার লাহিড়ী এণ্ড কোং
৫৪ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সন ১৩০৪ সাল।

উৎসর্গপত্র।

শ্রীযুত ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

পরম স্নেহাস্পদেষু।—

ইন্দ্র!

বহু দিবস পরে "হরিষে বিষাদ" সম্পূর্ণ হইল। ইহা যে সম্পূর্ণ হইবে এরূপ আশা ইদানীং আমার ছিল না। তোমার বিশেষ উৎসাহ ছিল বলিয়াই পুস্তকখানি শেষ করিতে পারিয়াছি, সেই জন্য ইহাকে তোমার করে সমর্পণ করিলাম।

তোমার নামে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিবার আর ও এক কারণ আছে, সেইটী এই—আজ কাল সাধারণের এই বিশ্বাস যে বাঙ্গালা লেখকগণের মধ্যে তুমি একজন সর্ব্ব প্রধান। বলা বাহুল্য যে আমারও সেই মত। অতএব তোমার নামে পুস্তকখানি উৎসর্গীকৃত হইলে ইহার সমধিক আদর বাড়িবে তাহার আর সন্দেহ নাই।

আশীর্ব্বাদক শ্রীতারকনাথ শর্ম্মণঃ।

হরিষে বিষাদ।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কুটীর।

পৌষ মাস। অমাবস্যার রাত্রি প্রায় দেড় প্রহর হইয়াছে। গ্রামে সকলেই নিদ্রিত। পল্লিগ্রামে লোক অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত জাগিয়া থাকে না, বিশেষ এরূপ শীত পড়িয়াছে যে অন্যান্য রাত্রি অপেক্ষা অদ্য অনেক অগ্রেই সকলে শয়ন করিয়াছে। পশু পক্ষী সমস্ত সুষুপ্ত, বৃক্ষের পত্রাদি পর্য্যন্ত নড়িতেছে না। সমস্ত গ্রাম নিঃশব্দ। দশ দিক নিবিড় তিমিরাচ্ছন্ন। প্রকৃতি যেন নিজেই নিদ্রা যাইতেছেন। এমন সময়ে একখানি কুটীর অভ্যন্তরে দীপালোক দৃষ্ট হইল। ক্ষণকাল পরে সেই কুটীর হইতে প্রদীপ হাতে করিয়া অলৌকিক-রূপলাবণ্যসম্পন্না একটী বিধবা বাহির হইল। বাহির হইয়া চৌকাটের উপর প্রদীপটী রাখিয়া শিকল দ্বারা দরজা বন্ধ করিল, পরে প্রদীপ পুনরায় হাতে করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল।

বিধবার বয়ঃক্রম অনুমান পঁচিশ বৎসর, দেহ অপেক্ষাকৃত লম্বা। শরীর স্থূলও নয় কৃশও নয়। মুখমণ্ডল চিন্তাকুল। প্রশস্ত চক্ষু দুটী চঞ্চলভাবে সর্ব্বদা এদিক ওদিক ঘুরিতেছে। বাটীর বাহির হইয়া, সমস্তই নির্জ্জন নিঃশব্দ ও অন্ধকারময় দেখিয়া বিধবা হঠাৎ চমকিয়া থামিল। পরে একটু চিন্তা করিয়া পুনরায় চলিতে আরম্ভ করিল। ক্রমে ক্রমে গ্রামের প্রান্তভাগে গমন করিল। রাস্তায় কাহারও সহিত দেখা হইল না। কোন রূপ শব্দও বিধবার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। কেবলমাত্র গৃহস্থদিগের বাটীর নিকট হইতে যাইবার সময় দু একটা কুকুর ডাকিয়া বিধবার নিকটে আইল কিন্তু পরিচিত ব্যক্তি দেখিয়া পুনরায় যে যাহার ছাই গাদায় গিয়া শয়ন করিল।

বিধবা গ্রামের প্রান্তভাগে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া দক্ষিণ হস্ত প্রদীপ শিখার উপরে দিয়া সম্মুখে যত দুর দৃষ্টি চলিল ততদূর মনোনিবেশ পূর্ব্বক কিয়ৎক্ষণ অবলোকন করিল। কিন্তু কিছু যেন না দেখিতে পাইয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে ফিরিয়া আসিল। গৃহে প্রবেশ করিবার সময় প্রদীপটী বাহিরে রাখিয়া অভ্যন্তরে গমন করিল।

বিধবার কুটীর খানি অতিশয় সঙ্কীর্ণ। কুটীরের এক পার্শ্বে রন্ধন করিবার স্থান। অপর পার্শ্বে মাটীর উপর দুইটী বিছানা রহিয়াছে। একটী মলিন আর একটী অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। চালের বাতা হইতে তিন গাছি শিকা ঝুলানো রহিয়াছে। প্রত্যেক শিকায় দুই তিনটী করিয়া হাঁড়ি সাজান আছে। যে স্থানে রন্ধন হয় সেখানে রন্ধনোপযোগী দ্রব্যাদি রহিয়াছে। এতদ্ভিন্ন

সমস্ত গৃহ এরূপ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন যে দেখিলে বোধ হয় যেন কেহ আসিবে বলিয়াই সেই দিবস কুটীর খানি পরিষ্কার করা হইয়াছে।

বিধবা গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক রন্ধনের দ্রব্যাদির দিকে একবার চাহিয়া দেখিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিল, এবং করতলে কপোল বিন্যাস পূর্ব্বক দ্বারদেশে বসিল। ক্ষণকাল এই রূপ ভাবে অবস্থিতি করিয়া আবার উঠিল। উঠিয়া প্রদীপটী লইয়া প্রাঙ্গনে গিয়া দাঁড়াইল। কিয়ৎক্ষণ দাঁড়াইয়া ফিরিয়া আসিবে এমন সময় দূর-পদধ্বনি তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বিধবা অমনি সেইখানে দাঁড়াইয়া শুনিতে লাগিল। পদধ্বনি ক্রমশঃ অগ্রসর হইল, ক্রমে বিধবার বাটীর নিকট শুনা যাইতে লাগিল। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া বিধবা জিজ্ঞাসা করিল "কেও, নলিন?" সম্মুখ হইতে উত্তর আসিল 'দিদি'? বিধবা অমনি দৌড়িয়া গিয়া আগন্তুকের হস্ত ধরিয়া কহিল "এস, দাদা এস। আমি জানি তুমি আসবেই। তোমার দিদিকে কখন তুমি মিথ্যা কথা কও নাই। তাই আমি এতক্ষণ জেগে বসে আছি; এত রাত হোলো কেন নলিন?"

আগন্তুকের নাম নলিন। নলিন বিধবার সহোদর। এই সহোদর ভিন্ন বিধবার আর পৃথিবীতে কেহই নাই। নলিন বাটী হইতে চারি ক্রোশ দূরে পাচকের কার্য্য করে। সেই কার্য্যে যে বেতন পায় তাহাতেই তাহার নিজের বস্ত্রাদি ও বিধবার ভরণ পোষণ হয়। অদ্য নলিন বাটী আসিবে এ সংবাদ বিধবা পূর্ব্বেই পাইয়াছিল এজন্য প্রাতঃকাল হইতে বিধবা আহারাদির আয়োজন

করিতেছে। প্রত্যূষে উঠিয়া ঘর প্রাঙ্গন সমস্ত পরিষ্কার করিয়াছে, কুটীরের দ্রব্যাদি সমস্ত পরিচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে এবং অন্যান্য জিনিস পাক করিয়া বসিয়া আছে, নলিন বাটী আসিলে অন্ন পাক করিবে কারণ শীতকাল, অগ্রে রন্ধন করিয়া রাখিলে শীতল হইয়া যাইবে। নলিন বাটী আসিয়া আহার করিলে নিজে আহার করিবে এজন্য সমস্ত দিবস কিছু খায় নাই। নলিন প্রতিমাসে একবার শনিবারে বাটী আসিবার বিদায় পায়। অদ্য তাহার আসিবার শনিবার। কিন্তু পূর্ব্বে কখনও বাটী আসিতে নলিনের এত রাত্রি হয় নাই। অদ্য রাত্রি অধিক হইল দেখিয়া বিধবার যার-পর-নাই উৎকণ্ঠা হইতেছিল। নলিনকে দেখিয়া বিধবার সমস্ত চিন্তা দূর হইল। জিজ্ঞাসা করিল "নলিন! আজ আস্‌তে এত রাত হলো কেন?"

নলিন কহিল "দিদি আমি একটার সময়ই আসবার উদ্যোগ করেছিলাম, কিন্তু বাবুর বাড়ীর অন্যান্য লোকে কোন মতেই আস্‌তে দিতে চায় না। কেউ বলে আজ্ যেওনা আর শনিবারে যাবে, কেউ বলে এখনও অনেক বেলা আছে এখন গিয়ে কি করবে। এই রূপে প্রায় চারিটা বেজে গেল। কি করি তারা সকলেই এত ভাল বাসে যে তাদের কথা ফেলে আস্‌তে ইচ্ছা করে না। তাতে গগন আবার আমার বোচ্‌কা দেখে বোল্লে 'তুমি কেমন করে এ বোচ্‌কা নিয়ে যাবে? বাবু বাড়ী এলে আমি বাবুর কাছে থেকে ছুটি নিয়ে তোমার সঙ্গে যাব।' আমি গগনকে বারণ কর্‌লাম কিন্তু গগন শুনলে না। তার পর প্রায় সন্ধ্যার সময় বাবু বাড়ী এলেন। তার পরও প্রায় আধ ঘণ্টা পরে আমরা বেরিয়েছি।

গগন এমনি ভাল মানুষ, আমায় এত ভাল বাসে যে রাস্তায় একবারও বোচ্‌কা আমায় নিতে দেয় নাই। আর এ ছুটিতে তার এক দিনকার মাইনে কাটা যাবে তবু আমার সঙ্গে এসেছে।”

বিধবা জিজ্ঞাসা করিল “গগন কে?” নলিন উত্তর করিল “গগন বাবুর চাকর।”

বিধবা। সে কোথা রইল?

নলিন উত্তর করিল “গগন বাজারে আছে। তাকে এত করে এখানে আস্‌বার জন্য বল্‌লাম সে কোন মতে এল না। বোল্লে ‘তোমার একলা আস্‌বার কথা তুমি যাও, আমি এত রাত্রে যাব না, কাল তোমাদের বাড়ী দেখে আস্‌বো।’ আর বাজারে থাক্‌তে যে পয়সা লাগ্‌বে তা পর্য্যন্ত আমার কাছে থেকে নিলে না।”

উল্লিখিত কথোপকথন করিতে করিতে উভয়ে গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিল। নলিন বিছানায় বসিয়া কহিল “দিদি এই দেখ এক জিনিস এনেছি” এই বলিয়া একটি ক্ষুদ্র পুটুলি বিধবার হাতে দিল।

বিধবা পুটুলি খুলিয়া দেখিল গোটা কতক সন্দেশ। সন্দেশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া নলিনকে জিজ্ঞাসা করিল “কোথায় পেলে?’

নলিন উত্তর করিল “বাবুদের বাড়ী অনেক লোক জন খাওয়ান হয়েছিল। আমি যা খেতে পেয়েছিলাম তা রেখে দিয়েছিলাম।”

বিধবা। না খেয়ে রেখে দিলে কেন ?

নলিন কহিল "দিদি তুমি বাড়ীতে যে কষ্ট পাও তা কি আমি কখন ভুল্‌তে পারি ? তোমার কষ্টের কথা মনে হলে আমার আর কিছুতেই ইচ্ছে থাকে না। তুমি শাক ভাত ছাড়া আর কিছু পাওনা একথা মনে হ'লে আমার সোনার জিনিসেও রুচি হয় না।"

নলিনের কথা শুনিয়া বিধবার চক্ষের জল টস টস করিয়া পড়িতে লাগিল। পাছে নলিন দেখিতে পায় এই জন্য অবিলম্বে উননের নিকট গিয়া উনন জ্বালিতে প্রবৃত্ত হইল। কতক-গুলি তৃণের উপর এক খণ্ড আগুণ রাখিয়া ফুৎকার দিতে লাগিল। প্রতি ফুৎকারে অগ্নি হইতে আলোক উদ্ভূত হইয়া বিধবার মুখে প্রতিভাত হওয়ায় অশ্রুবিন্দু গুলি সেই আলোকে মুক্তা ফলের ন্যায় শোভা সম্পাদন করিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে অশ্রুবেগ সংবরণ করিয়া বিধবা কহিল "নলিন এমন করা কি বেটা ছেলের সাজে ? এখন যেন বাড়ীর কাছে আছ ভাল মন্দ জিনিস আনতে পার, যদি দূর দেশে যেতে হয় তখন কি করবে ?"

নলিন কহিল "দিদি আমাদের মতন লোকের সন্দেশ খাওয়া বছরে কদিন যোটে ? কালে ভদ্রে যখন যোটে তখন না খেলেই হলো।"

বিধবা কহিল "তুমি কি চিরকালই এমনি থাকবে ? কখন কি ঈশ্বর তোমাকে দিন দেবেন না ?"

নলিন। যদি ঈশ্বর তেমন দিনই দেন তবে কি তোমারি দুঃখ থাক্‌বে ? না তুমিই চির কাল এই খানে থাক্‌বে ?

বিধবা এই কথা শুনিয়া গাঢ় স্বরে কহিল "চিরজীবী হয়ে থাক।"

অতঃপর বিধবা সেই সন্দেশ লইয়া নলিনকে খাইতে দিল এবং নিজের জন্য যৎকিঞ্চিৎ রাখিল। পরে অন্ন প্রস্তুত হইলে উভয়ে আহারাদি করিয়া শয়ন করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অট্টালিকা।

সোনাপুরের লালবিহারী বাবু একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি। যদিও প্রথমত তাঁহার অবস্থা ভাল ছিল না, কিন্তু নিজের যত্নে বিদ্যাভ্যাস করিয়া রাজ সরকারে উচ্চপদের কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন। এক্ষণে কর্ম্ম স্থলেই বাস। সোনাপুরের বাটী তাদৃশ উৎকৃষ্ট নহে। লালবিহারী বাবু প্রায় সোনাপুর আইসেন না বলিলে হয়। সেই জন্য তথাকার বাটীর উপর তাঁহার মনোযোগ নাই। লালবিহারী বাবু পূর্ব্বের অবস্থার কথা কাহাকে বলিতেও ইচ্ছা করেন না ও নিজেও তাহা স্মরণ করিতে চান না। কিন্তু সোনাপুর আসিলে সেটা ঘটিয়া উঠে না। সেখানে গ্রামস্থ সকলেই তাঁহার পূর্ব্বের অবস্থার

বিবরণ জ্ঞাত থাকায় তাঁহাকে তাদৃশ সম্মান করে না।

লালবিহারী বাবুর বয়স আন্দাজ চল্লিশ বৎসর। স্থূলও নন কৃশও নন। তাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম, মুখখানি সুন্দর ও সুগঠিত, গুটীকলঙ্ক বসন্তের দাগ সত্ত্বেও মুখশ্রী অতীব রমণীয়। লালবিহারী বাবুর এই একটী সংস্কার ছিল যে তাঁহার ন্যায় রূপবান পুরুষ অতি বিরল।

সুকুলে জন্ম দৈবায়ত্ত এবং পৌরুষ লোকের আত্মায়ত্ত বটে কিন্তু সুরূপ হওয়া বড় সৌভাগ্যের বিষয় এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। পাঠশালায় সর্ব্বাপেক্ষা সুশ্রী বালকের আসিতে বিলম্ব হইলে গুরুমহাশয় তাহাকে বেত্রাঘাত করা দূরে থাকুক, তিরস্কারও করেন না, স্কুলে শিক্ষক মহাশয় তাহার ভুল হইলেও তাহাকে গালি দেন না, কোনস্থানে কর্ম্ম খালি হইলে অন্যান্য লোক অপেক্ষা তাহারই পাইবার সম্ভাবনা অধিক। বস্তুতঃ সুচেহারার ন্যায় সুপারিস আর নাই। লালবিহারী বাবুর বর্ত্তমান উন্নতির প্রধান কারণ সুচেহারা। এই সুচেহারার জন্য গুরুমহাশয় বিনা বেতনে তাঁহাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন। এই সুচেহারার জোরে তিনি কলিকাতায় শীলেদের অবৈতনিক স্কুলে ভরতি হইয়া ইংরাজি বিদ্যাভ্যাস করিয়াছেন এবং এই সুচেহারার প্রভাবেই তিনি উচ্চ পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন। শীলেদের অবৈতনিক কালেজের পাঠ সমাপ্ত করিয়া লালবিহারী বাবু প্রথমত মাসিক বার টাকা বেতনের একটী কার্য্য গ্রহণ করেন। কলিকাতায় বার টাকার মধ্যে বাড়ীভাড়া ও ভৃত্যের বেতন দিয়া বাস করা

সুকঠিন। কিন্তু লালবিহারী বাবুর সুচেহারার সুপারিসে একজন ধনবান কায়স্থ তাঁহাকে নিজ বাটীতে স্থান দান করেন। লাল-বিহারী বাবু সেই বাটীতে থাকিতেন। সেই বাটীর ভৃত্যেরা তাঁহার কর্ম্ম কার্য্যাদি করিয়া দিত, সেই বাটীর রজকে তাঁহার বস্ত্রাদি ধৌত করিত। কিন্তু লালবিহারী বাবু ব্রাহ্মণ, সুতরাং নিজের অন্নব্যঞ্জনাদি নিজে পাক করিয়া লইতে হইত। লালবিহারী বাবু এইরূপে দুই তিন বৎসর কালাতিপাত করিলে, হঠাৎ এক সময়ে জন কয়েক ডেপুটী কলেক্টরের প্রয়োজন হওয়ায় তিনি সেই কর্ম্মের জন্য আবেদন করিলেন। সকলেই প্রথমতঃ লালবিহারী বাবুকে উপহাস করিতে লাগিল, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ দিন কয়েক পরেই তাঁহার সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়ার সম্বাদ গেজেটে প্রকাশিত হইল।

কাহার অদৃষ্টে কখন কি হয় কেহ বলিতে পারে না। যে কায়স্থ বাবুদিগের বাসাতে লালবিহারী বাবু বাস করিতেন তাহাদিগের যে হীনাবস্থা হইবে তাহা কেহ স্বপ্নেও ভাবে নাই; ফলতঃ লালবিহারী বাবুর যত উন্নতি হইতে লাগিল কায়স্থ বাবু-দিগের ততই অবনতি হইতে আরম্ভ হইল। এক্ষণে কায়স্থ বাবু-দিগের কর্ত্তৃপক্ষের সকলেই লোকান্তর গত হইয়াছেন। বাবু-দিগের বংশে একটী মাত্র সন্তান আছে। তাহার নাম নবীন। নবীন এক্ষণে লালবিহারী বাবুর অধীনে কার্য্য করে।

লালবিহারী বাবু সকলকেই স্পষ্ট কথা কন। যদি কাহাকে নিন্দা করিতে হয় তাহার সম্মুখেই নিন্দা করেন। লালবিহারী বাবু বলেন লোকের অনুপস্থিতে তাহাকে নিন্দা করা ভিক্ষু

স্বভাবের পরিচয় দেওয়া মাত্র। কিন্তু নবীনের বিষয়ে কোন নিন্দা করিতে হইলে লালবিহারী বাবু কখন তাহার সম্মুখে নিন্দা করেন না। হিংসক লোকে বলে পাছে তাহার সম্মুখে নিন্দা করিলে তিনি পূর্ব্বকথা প্রকাশ করিয়া দেন এই ভয়েই লালবিহারী বাবু তাঁহার নিন্দা অসাক্ষাতে করিয়া থাকেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে লালবিহারী বাবুর পূর্ব্বের হীনাবস্থা গোপন করিবার জন্য এত যত্ন থাকা সত্ত্বেও তাহা কাহারো অবিদিত ছিল না। সকলেই পরস্পর সেই কথা লইয়া আন্দোলন করিত। কিন্তু লালবিহারী বাবু তাহা জানিতে পারিতেন না।

লোকে সচরাচর বলিয়া থাকে নির্ধনের ধন হইলে ব্যয় করিতে চায় না। বস্তুতঃ সে কথা ভ্রান্তিমূলক। লালবিহারী বাবুর এত ব্যয় যে তাঁহার বেতনের টাকায় কুলায় না। অন্যান্য লোকের বাড়ীতে এক জন ভৃত্যে যে কার্য্য করে লালবিহারী বাবু সেই কার্য্যের জন্য তিন জন ভৃত্য রাখিয়াছেন এবং সেই ভৃত্যদিগের কার্য্য পরিদর্শনের জন্য আর এক জন সর্দ্দার রাখিয়াছেন। লালবিহারী বাবু সেই সর্দ্দারকে হুকুম করেন। সর্দ্দার যাহার বিভাগের কার্য্য তাহাকে আদেশ করে। বাটীর খরচ পত্র সমস্ত সেই সর্দ্দারের হাতে। সর্দ্দার বিবেচনা মতে খরচ করিয়া মাসে মাসে বিল করিয়া টাকা লয়। টাকা দিবার সময় লালবিহারী বাবু বিল্‌টী মাত্র দেখেন। বলেন সমস্ত দেখিতে গেলে যে পরিশ্রম হয় তাহার পরিবর্ত্তে কিঞ্চিৎ লোকসান হয় তাহাতে ক্ষতি নাই।

লালবিহারী বাবুর বিবাহ অতি অল্প বয়সেই হইয়াছিল কিন্তু

একটী মাত্র পুত্র হওয়ার পরেই সে স্ত্রীর মৃত্যু হয়। তাহার পর লালবিহারী বাবু পুনর্ব্বার দার পরিগ্রহ করিবেন না স্থির করিয়াছিলেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র বিবাহের যোগ্য হইলে তাহার বিবাহ দিলেন। অগ্রে যে সমস্ত লোকে লালবিহারী বাবুকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিত তাহারা আর অনুরোধ করে না। কিন্তু লালবিহারী বাবুর মাতা কোন ক্রমেই না শুনায় লালবিহারী বাবুকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিতে হইয়াছে।
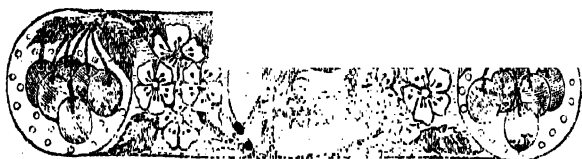
তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সুখ নিজের মনে।

প্রথম অধ্যায়ে যে বিধবার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার নাম মনোরমা। মনোরমা ও নলিন উভয়েই শয়ন করিল কিন্তু নিদ্রা আর হয় না। কত কথাই দুইজনে হইতে লাগিল। অনেক রাত্রিতে মনোরমা বলিল "নলিন ঘুমাও নইলে তোমার অসুখ কোরবে।" নলিন ঘুমাইলে মনোরমা আবার ডাকিয়া দেখিল, তাহার পর আপনিও নিদ্রিত হইল। আবার পরদিন প্রত্যুষেই নিদ্রাভঙ্গ হইল। নলিন শয্যা হইতে উঠিয়া মনোরমাকে কহিল" দিদি, বাবুদের বাড়ী প্রত্যহই সকালে উঠ্‌তে হয়; মনে করেছিলাম আজ বেলা পর্য্যন্ত ঘুমাবো, কিন্তু আজ্ সবদিনকার চাইতে আগে ঘুম ভেঙ্গে গেল, আর বিছানায় থাকৃতে ইচ্ছা হলো না।"

মনোরমা উত্তর করিল "আমারও ঠিক অমনি হয়। যে দিন কর্ম্ম থাকে সে দিন যেন ঘুম ভেঙ্গেও ভাঙ্গে না। আর যে দিন কর্ম্ম না থাকে, মনে করি ঘুমাবো, সেই দিনেই সকলের আগে ঘুম ভেঙ্গে যায়।"

মনোরমার কুটীরখানি পূর্ব্বদ্বারি, রাস্তার ধারেই। কুটী-রের দক্ষিণে ও উত্তরে একটু একটু জমী আছে। সম্মুখে একটী অতি ক্ষুদ্র প্রাঙ্গন। প্রাঙ্গনের সম্মুখেই রাস্তা। উত্তরে ও দক্ষিণে যে জমী আছে তাহাতে গোটাকতক কাঁটাল গাছ, দুইটা কি তিনটা নারিকেল গাছ, ও দুইটা লেবুর গাছ আছে। এতদ্ভিন্ন যেটুকু খালি আছে তাহাতে বেগুন, পালন শাক, কড়াইশুটা ইত্যাদি প্রস্তত করা হইয়াছে। সকলের দক্ষিণে একটু জমা পতিত থাকে তাহাতে উলুখড় হয়, সেই খড় দিয়া বিধবা বৎসর বৎসর কুটীর খানি মেরামত করে।

মনোরমা গাত্রোত্থান করিয়া নলিনকে কহিল "নলিন, এস আমাদের বাগানে যাই।"

উভয়ে বাগান দেখিতে গেল। মনোরমা কহিল "এই দেখ বেগুন গাছ গুলি কেমন সতেজ হয়েছে, আর কত বেগুন ধরেছে। এবার আর মোটে তরকারি কিন্‌তে হবে না। পালন শাক গুলিও সতেজ হয়েছিল কিন্তু গরুতে খেয়ে গিয়ে বড় ক্ষতি করেছে। কড়াইসুটী গুলি কিন্তু ভালো হয় নাই। জল যে দূরে, এনে উঠতে পারি না।"

নলিন কহিল "আচ্ছা আজ আমি জল এনে দেব।"

মনোরমা কহিল "না তুমি কেন আন্‌বে? তুমি এই এক মাসের পর এক দিন অবকাশ পেয়েছ। আজ্‌ও যদি কাজ কোরবে তবে আর ছুটীই বা নিয়েছ কেন বাড়ীই বা এসেছ কেন?

নলিন উত্তর করিল "তুমিও তো রোজেই কাজ কর। তোমারও তো এক দিন বিশ্রাম নাই।"

মনোরমা। তা হলে কি হয়? তুমি চিরকাল বিদেশে থাক আমি রোজ বাড়ী থাকি। এক দিনের তরে বাড়ী এসেছ। আজ ফিরিয়া যাও।" এই কথা বলিতে বলিতে বিধবা কুটীরের দ্বারে আসিল। নলিনও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া কুটীরে প্রবেশ করিল।

নলিন একটী ব্যাগে করিয়া নিজের বস্ত্রাদি আনিয়াছিল। সেই ব্যাগটী খুলিয়া যে বেতন পাইয়াছিল সেই চারটী টাকা মনোরমার হাতে দিল। মনোরমা টাকা কয়েকটী হাতে লইয়া কহিল "নলিন, আবার চারটী টাকাই এনেছ? আমি তোমাকে বার বার করে বলেছি বৈকালে কিছু কিছু খাবার খেও। তুমি আমার কথা শুনবে না? আমার অন্য কোন কথা তো তুমি লঙ্ঘন কর না; কিন্তু এ কথাটা শোন না কেন? তুমি একটী টাকা নিজে খেয়ে যদি তিনটী আমাকে দাও তবে আমি যত খুসি হব চারটী পেলে তত খুসি হব না। এতে যে আমার কত কষ্ট হয় তা যদি তুমি টের পেতে তা হলে এমন কর্ত্তে না।"

নলিন কহিল "দিদি আমার ক্ষিদে পায় না। ক্ষিদে না পেলে কেমন করে খাব। শীতকালের বেলা, সকলকে খাওয়ায়ে দাওয়ায়ে নিজে যখন খাই তখন প্রায় একটা দুটা বেজে যায়। তার পর আর বিকেল বেলা কখন খাব?"

মনোরমা কহিল "তবে রাঁন্ধে যাবার আগে সকাল বেলা কিছু খেও। অবিশ্যি করে খেও। আমার গা ছুঁয়ে বল তা নৈলে শুনবো না।"

নলিন। আচ্ছা তোমার গা ছুঁয়ে বলচি, খাব।

মনোরমা। তারপর আর একটা কথা আছে। ওমাসে যে চারটা টাকা দিয়েছিলে তার দু টাকা এখনও মজুত আছে। সেই দুটাকাতেই আমার এমাস্ চলবে। এ চার টাকা তুমি নেও। একটা গরম কাপড়ের জামা কোরবে বলেছিলে; এই চার টাকা দিয়ে তাই কর গিয়ে।

নলিন। গরম কাপড়ের জামা কোরবো বলেছিলাম বটে কিন্তু ভেবে দেখলেম তাতে আর দরকার নেই। সকাল বেলা যখন বড় শীত থাকে তখন আমি আগুনের কাছে থাকি, রাত্রেও আগুনের কাছে থাকি। যে দু সময় শীত সে দু সময় আমার গায়ের কাপড়ের দরকারই নাই, তবে আর কেন মিথ্যা মিথ্যা জামা কোরবো ?

মনোরমা। "তবে এ চারটাকা থাক। এতে আর এক কাজ কোরবো।" এই বলিয়া মনোরমা ঈষৎ হাসিল।

নলিন একটু আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিল "কি কোরবে দিদি ?"

মনোরমা আবার একটু হাসিয়া উত্তর করিল "আরও দু এক টাকা আমার কাছে আছে। তুমি ভাব, তুমি যা পাঠাও আমি সব খরচ করে ফেলি, তা ত করি না। দু এক টাকা করে ফি মাসে রাখি। তোমার যখন বিয়ে হবে ঐ টাকা দিয়ে বোয়ের গয়না গড়ে দেব।"

মনোরমার কথা শুনিয়া নলিনের মুখ লাল হইল। অধোবদনে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার উদ্যোগ করিল। মনোরমা নলিনের লজ্জাবনত মুখ দেখিয়া বলিল

"নলিন বেলা হলো আমি চান করি গিয়ে। তুমি গগনকে ডেকে আন। সে কাল রাত অবধি বাজারে আছে, তার খাওয়া দাওয়া হলো কি না তার তো কোন অনুসন্ধান কোরলে না?

নলিন কহিল "ভাল কথা মনে করেছ দিদি; আমি এখনই যাই। ঘরে যদি কিছু খাবার থাকে তবে একটু জলখাবার দেবার উদ্যোগ করে রাখ।" এই বলিয়া নলিন গগনকে ডাকিতে গেল। মনোরমা আর কি জলখাবার রাখিবেন। ঘরে ঝুনা নারিকেল ছিল তাহারই একটা কাটিলেন ও একটু গুড় এক খানি রিকিবিতে রাখিলেন। মনোরমা ভাবিলেন গুড়ের পরিবর্ত্তে যদি একটু চিনি দিতে পারিতেন তাহা হইলে ভাল হইত।

গগন জাতিতে সদ্‌গোপ, দীর্ঘায়াতন কিন্তু শরীরে মেদের লেশমাত্র নাই, কেবল অস্থি ও মাংসে গঠিত। মাথায় লম্বা লম্বা চুল; তাহার অগ্রভাগ আকুঞ্চিত, ঘাড় ঢাকিয়া পড়িয়া পৃষ্ঠের উপরিভাগে ঝালরের ন্যায় শোভা পাইতেছে। গোঁপ কামানো, দাঁতগুলিতে পানের রসে পাকা লাল রং ধরিয়াছে, ধুইলে আর উঠে না। মুখ খানি সুগোল। গগনের পরিধান একখানি কালোপেড়ে ধুতি, গায়ে একখানি চেকওয়ালা র‍্যাপার, পায়ে এক জোড়া ঠনঠনিয়ার পম্প জুতা। বাবুর বাড়ীর সকল ভৃত্য অপেক্ষা গগন চালাক। এক কথা গগনকে কখন দুবার বলিতে হয় না। গগন কোন কাজেই ঠকে না। এজন্য বাবু গগনকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসেন। যে কাজ আর কেহই না করিতে পারে গগন তাহা অনায়াসে সম্পন্ন করে।

গগন রাত্রিতে বাজারে জলপান করিয়াছিল। ভোর হওয়া অবধি ক্রমাগত রাস্তার দিকে চাহিতেছে কখন নলিন আসিবে। এমন সময় নলিন গিয়া উপস্থিত হইল। নলিনকে দেখিয়া গগন কহিল "তবু ভাল, আমি বলি বুঝি তুমি বাড়ী চাপা পোড়লে ?" নলিন কহিল "সে কি ? আমি ভোর বেলাই আস্‌তাম কিন্তু বাড়ীর কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তে দেখ্‌তে বেলা হয়ে গেল।" গগন বলিল "এখন তো ভুল্‌বেই ? এখন বল, তোমার ওখানে যেতে হবে, না বাড়ী যাব ?" নলিন কহিল "বিলক্ষণ বাড়ী যাবে কেন ? এস আমার সঙ্গে এস।" এই বলিয়া গগনের হাত ধরিল। গগন আর কিছু না বলিয়া নলিনের সঙ্গে সঙ্গে চলিয়া আসিল।

গগন রাস্তায় আসিতে আসিতে নলিনের ভগ্নীর সহিত কি কথা বার্ত্তা কহিবে স্থির করিয়া আসিতে লাগিল। গগন সহরে কতলোকের সহিত কথা বার্ত্তা কহিয়াছে; বাক্‌চাতুরিতে কত লোককে পরাস্ত করিয়াছে। এ তো পল্লিগ্রাম। এখানে গগন যে সকলকে পরাস্ত করিবে তাহার আর ভাবনা কি ? গগন এই ভাবিতে ভাবিতে নলিনের বাটী উপস্থিত হইল। গগন আসিবামাত্র মনোরমা একখানি কম্বল বাহির করিয়া দিয়া গগনকে কহিল "গগন বোস।" এই বলিয়া কিঞ্চিৎ পরেই মনোরমা পূর্ব্বের প্রস্তুতকরা নারিকেল ও গুড় আনিয়া গগনকে দিল।

গগন রাস্তায় যে সমস্ত কথা রচনা করিয়া আনিয়াছিল মনোরমার মুখ দেখিয়া সমস্তই ভুলিয়া গেল। বিন্দুমাত্রও মনে আসিল না। গগনের মুখ আরক্তিম হইল, কর্ণের অগ্রভাগ

পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। গগন মস্তক অবনত করিয়া বসিল। যতক্ষণ মনোরমা সম্মুখে ছিল ততক্ষণ কথা কহিতে পারিল না, কিছু খাইতেও পারিল না। মনোরমা তথা হইতে চলিয়া গেলে গগন নলিনকে বলিল "তুমি থাক আমি আবার বাজারে যাই।" নলিন কহিল "বাজারে যাবে কেন এই খানে খাওয়া দাওয়া কর। বিকেলে দুজনে একত্র হয়ে যাব।" গগন কোন মতেই থাকিল না। বাজারে গিয়া আপনি রন্ধনাদি করিল এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া রহিল।

গগনকে নলিন ও মনোরমা উভয়ে থাকিবার জন্য অনুরোধ করিল কিন্তু গগন কোন ক্রমে থাকিল না গগন না থাকায়, নলিন বিশেষ দুঃখিত হইল।

মনোরমা স্নান করিয়া রন্ধনাদি করিলেন। অন্য দিন নলিন সকলের জন্য রন্ধন করে আজ নলিনের জন্য বিশেষ করিয়া রন্ধন হইল। চিরসুখও পৃথিবীতে নাই, চিরদুঃখও নাই। বস্তুত প্রত্যহই একরূপ চলিলে জীবন ধারণের ভার দুঃসহ হইত। চিরকাল সুখ থাকিলে সে সুখের আস্বাদ পাওয়া যাইত না। যদি চিরকাল দুঃখ থাকিত, যদি কাল সুখ অবশ্যই হইবে এরূপ আশা না থাকিত তাহা হইলে দুঃখে পড়িলে কয়জন লোক জীবিত থাকিবার বাসনা করিত? পৃথিবীতে সুখেরও যেমন প্রয়োজন আছে, দুঃখেরও তেমনি প্রয়োজন আছে। ক্ষুধা না থাকিলে সুস্বাদ দ্রব্যের কে যত্ন করিত? তাহার গৌরব কোথায় থাকিত? দুঃখ সুখের ক্ষুধা। দুঃখ না থাকিলে সুখের গৌরব থাকিত না। দুঃখকে সহসা জীবনপুষ্পের কীট স্বরূপ

বোধ হয় বটে, বস্তুতঃ তাহা নয়। তবে কেহ কেহ যে দুঃখে নিপীড়িত হয় সে তাহাদের নিজের দোষ। নিজের সহিত অন্যের অবস্থা তুলনা করা মনুষ্যের স্বভাব। এই তুলনা আমাপেক্ষা ছোট বড়, সুখী দুঃখী উভয়ের সহিত করিলে দুঃখের অনেক হ্রাস হয়। কিন্তু এরূপ না করিয়া লোকে বড়রই সহিত তুলনা করে সুতরাং তাহার দুঃখ হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হয়। যাহার একটী মাত্র চক্ষু আছে সে যদি অন্ধের সহিত নিজের তুলনা করে তাহা হইলে দুঃখ থাকে না। কিন্তু সেরূপ কজন করিয়া থাকে ?

উপরে যে জ্ঞানগর্ভ কথাগুলি লেখা হইল তাহা পাঠকবর্গের নিকট যে নূতন বলিয়া বোধ হইবে সে আশয়ে লেখা হয় নাই। সদুপদেশ অনেকেই জানে কিন্তু নিজের প্রয়োজনের সময়ে কাহারও মনে থাকে না। কি জানি যদি কাহারও প্রয়োজন হয় এই জন্য স্মরণ করাইয়া দেওয়া গেল। আমারও ইহাতে এই উপকার হইল যে পরিচ্ছেদটা নিতান্ত ক্ষুদ্র না হইয়া অপেক্ষাকৃত লম্বা হইল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পুরুষের দশ দশা।

লালবিহারী বাবু দ্বিতীয় পক্ষে কলিকাতায় বিবাহ করেন। বিবাহ করা অবধি স্ত্রীকে নিজ বাটী আনেন নাই। তাঁহার কার্য্যস্থান হইতে কলিকাতায় রেলে যাইবার সুবিধা থাকায় নিজে সর্ব্বদাই শ্বশুর বাটী যাইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্ত্রীর নিকট হইতে প্রত্যহই একখানি করিয়া চিটী পাইতেন। এই সমস্ত চিটীর জন্য লালবিহারী বাবু মাঝে মাঝে কাগজ ও খাম তাঁহার স্ত্রীর নিকট রাখিয়া আসিতেন। খামগুলির উপর তাঁহার নাম ও ঠিকানা মুদ্রাঙ্কিত করা। পাঠকবর্গ বোধ হয় অবগত আছেন যে ডেপুটী কালেক্‌টরেরা সকলেই "রায় বাহাদুর" খ্যাতিযুক্ত। লালবিহারী বাবুর নামের শেষে এই উপাধিযুক্ত না থাকিলে তিনি কোন চিটী পত্র লইতেন না। তাঁহার স্ত্রীর নিকট যে ছাপান খাম রাখিয়া আসিতেন তাহাতেও এই উপাধি মুদ্রাঙ্কিত থাকিত।

লালবিহারী বাবু স্ত্রীকে নিজ বাটী লইয়া আইসেন না এজন্য তাঁহার মাতা অত্যন্ত দুঃখিত ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা কহিতেন "লালবিহারী, এখনও আমার চক্ষু আছে, এই বেলা একবার বউটীকে এনে দেখাও। এর পর আন্‌বেই আন্‌বে কিন্তু আমার চক্ষের সুখ হবে না। এতকাল খোসামোদের পর যদি বিবাহই কোর্‌লে তবে একবার দেখায়ে কেন আমার চক্ষু জুড়াও না?" লালবিহারী বাবু এসমস্ত কথায় ভাল মন্দ কিছুই বলিতেন না। সমবয়স্ক আত্মীয় স্বজন স্ত্রীকে আনিবার কথা কহিলে লালবিহারী বাবু কহিতেন যে তাঁহার স্ত্রী ও পুত্রবধূ উভয়েই সমবয়স্ক, উভয়ে একস্থানে থাকিলে ঝগড়া বিবাদ হইবার সম্ভাবনা। এই জন্যই তিনি নিজ স্ত্রীকে বাটীতে আনেন না।

একদা সরস্বতী পূজার বন্ধোপলক্ষে লাল বিহারী বাবু শ্বশুর বাটী যাইবেন। সর্দ্দার বস্ত্রাদি সমস্ত প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে। লালবিহারী বাবুর কলিকাতায় যাইবার জন্য এক প্রস্থ স্বতন্ত্র বস্ত্রাদি আছে। সে সমস্ত কলিকাতায় যাইবার সময় ভিন্ন অন্য সময় ব্যবহার করেন না। অদ্য কাছারি হইতে বাটী আসিতে অত্যন্ত দেরী হইয়া গিয়াছে রেলের গাড়ী ছাড়িবার আর অধিক বিলম্ব নাই। লালবিহারী বাবু সত্বর বেশভূষা করিয়া বাটী হইতে বাহির হইবেন। প্রাঙ্গনে আসিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহার মাতা আসিয়া পশ্চাৎ হইতে ডাকিয়া কহিলেন "বাবা কলকেতায় যাচ্ছো, বউমাকে নিয়ে এসো।" লালবিহারী বাবু যার-পর-নাই বিরক্ত হইলেন। ইংরাজিতে ব্যুৎপন্ন হইয়াও

লালবিহারী বাবুর কুসংস্কার দুরীভূত হয় নাই। পশ্চাৎ হইতে ডাকায় যে বাধা পড়িল লালবিহারী বাবুর মনে তাহাতে অত্যন্ত অসুখ উপস্থিত হইল। ব্যস্ত হইয়া যাইতেছিলেন মাতার ডাক শুনিয়া অমনি থামিলেন এবং ফিরিয়া চাহিয়া আরক্ত নয়নে এইমাত্র কহিলেন "কি বোলবো যে তুমি মা।" এই কথা কহিয়া পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। এবং কলিকাতায় যাইবার জন্য যে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়াছিলেন তৎসমুদয় খুলিয়া ফেলিলেন। অমনি বাটীর মধ্যে সমস্ত নিঃশব্দ হইয়া গেল। বাহিরে বগী প্রস্তুত। সমভিব্যাহারে যে চাকর যাইবে সে প্রস্তুত কিন্তু বাবু যাইবেন কি না এখন একথা কাহারও জিজ্ঞাসা করিবার সাহস হইতেছে না। লালবিহারী বাবুর মাতা আস্তে আস্তে অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি বাবা, রাগ কল্লে? গায়ের জামা খুলে ফেল্লে কেন? কল্‌কাতায় যাবে না!"

লালবিহারী বাবু রাগতভাবে উত্তর করিলেন "যাও, যাও ওদিগে যাও। আমার কাছে থেকো না। বুড়ো হয়ে একেবারে পাগল হয়ে গিয়েছ?"

"বাবা আমি বুড় মানুষ, আমি কখন কি বলি ঠিক নাই। আমি এক রকম পাগল হয়েছি। আমার কথায় রাগ কোরতে আছে? মায়ে ডাকলে বাধা হয় না। তুমি এত পড়া শুনো কোরেছ বাবা, তোমারে কি আমি বোঝাতে পারি? তুমি আমার পেটে জন্মেছ বটে, কিন্তু জ্ঞান বুদ্ধি তোমার যত অত কি আমার আছে? কলিকাতায় যাবে, সচ্ছন্দে এস গিয়ে।

তোমার কোন অমঙ্গল হবে না। আমি তোমার কল্যাণে যে প্রত্যহ শিব পূজা করি তা কি একেবারেই নিষ্ফল হবে?”

মাতার কথা শুনিয়াই হউক অথবা স্ত্রীকে পত্র লিখিয়াছিলেন সেই জন্যই হউক লালবিহারী বাবু পুনরায় বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কলিকাতায় যাইবার জন্য যাত্রা করিলেন। বাটীর লোক নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচিল।

লালবিহারী বাবু বহির্বাটী আসিয়া নিজের বগীতে আরোহণ করিয়া দ্রুতবেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই ষ্টেশনে উপস্থিত হইলেন। তখন রেলগাড়ী মৃদু মৃদু চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু লালবিহারী বাবুকে দেখিবামাত্র ষ্টেশন মাষ্টার গাড়ী থামাইবার ইসারা করায় গাড়ী থামিল। লালবিহারী বাবু গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। আরোহণ করিলে একটু পরে ষ্টেশন মাষ্টার নিজে আসিয়া টিকিট খানি লালবিহারী বাবুর হাতে দিয়া গেল। লালবিহারী বাবু প্লাটফরমের দিকে চাহিয়া দেখিলেন। মনের ভাব এই যে যদি কোন আলাপী লোক থাকে এই বেলা দেখা যাউক কত খাতির।

বাটী হইতে বাহির হইবার সময় লালবিহারী বাবুর যেরূপ চিত্ত বৈকল্য হইয়াছিল রেলওয়ে ষ্টেশনে আশাতীত খাতির পাইয়া তাহার অনেকটা দূরীভূত হইল। ক্রমে যত সন্ধ্যা সমাগত হইতে লাগিল ও রেলওয়ের গাড়ী কলিকাতার নিকটবর্ত্তী হইতে আরম্ভ করিল ততই মনের উদ্বেগ ঘুচিয়া যাইতে লাগিল। শেষ ষ্টেশন পার হইলে লালবিহারী বাবু

বিলক্ষণ হর্ষোৎফুল্ল হইলেন। দেখিতে দেখিতে গাড়ী কলি- কাতায় উপস্থিত হইল।

লালবিহারী বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া ক্ষণকাল চাকরের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। চাকর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী হইতে নামিলে, ঘোঁড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া লালবিহারী বাবু শ্বশুরা- লয়ে গমন করিলেন।

এই বৎসর জার্ম্মণ দেশীয় এক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কলিকাতায় আইসেন। তাঁহাকে সম্মান প্রদর্শন জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে বাজি পোড়ান এবং সৈন্যদিগের কৃত্রিম যুদ্ধ হইয়াছিল। লাল- বিহারী বাবু যে রাত্রি কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছিলেন সেই রাত্রিতেই বাজি পোড়ান হয়। বস্তুত লালবিহারী বাবু শ্বশুর বাটী গিয়া দেখিলেন সকলে বাজি পোড়ান দেখিতে যাইবার জন্য বেশভূষা করিতেছে। লালবিহারী বাবুকে দেখিয়া সকলেই যৎপরোনাস্তি আহ্লাদিত হইল এবং তাঁহাকেও তাহাদিগের সমভিব্যাহারে যাইবার জন্য অনুরোধ করিল। লালবিহারী বাবু প্রথমতঃ যাইতে অস্বীকার করিলেন কিন্তু তাঁহার শ্যালক ও তদীয় বন্ধুবর্গ বারম্বার অনুরোধ করায় অবশেষে যাইতে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহার শ্যালক কহিলেন "তবে ও কাপড় ছেড়ে শীঘ্র শীঘ্র ধুতি চাদর পরে নেও।"

লালবিহারী বাবু কহিলেন "তুমি খেপেছো না কি? যদি যেতে হয় তবে এই পোশাকে যাওয়াই উচিত। যেখানে সাহেব বাঙ্গালি একত্র হবার সম্ভাবনা সেখানে ধুতি পরে যাওয়া বড় ভুল।"

শ্যালক কহিলেন "রাত্রে তোমাকে আর কে চিন্তে আসবে? আমরা সকলেই ধুতি পরে যাচ্ছি তুমি তার মধ্যে একটা সং সেজে নাই বা গেলে? লোকে পেটের দায়েই সং সাজে। আমি যখন বেরুই তখন সং সাজি। ইচ্ছা করে সং সাজা আমার কাজ নয়। তুমি যদি সং সাজতে এতই ভাল বাস, তবে চল ঐ কাপড়েই চল।"

লালবিহারী বাবু কহিলেন "তুমি বোঝ না ভাই যেখানে ভীড় হবার সম্ভাবনা সেখানে এই পোশাকই ভাল। ধুতি পরে গেলে কেউ খাতির করে না।

"থাক্ থাক্ আর সে কথায় কাজ নাই, চল তোমার যেমন অভিরুচি তেমনি করেই চল; রাত হলো।" এই কথার পর সকলে গাত্রোত্থান করিলেন। লালবিহারী বাবু নিজ ভৃত্যকে ডাকিয়া কহিলেন "চল রাম সিং।"

সকলে কহিল "আবার রামসিংকে কেন?"

লালবিহারী বাবু ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "দেখ্‌বে এখন।" অতঃপর সকলে গিয়া গাড়ীতে চড়িলেন।

রাম সিং লালবিহারী বাবুর কাছারির আরদালী। লাল-বিহারী বাবুর সহিত সর্ব্বক্ষণ থাকাই তাহার [illegible]। লালবিহারী বাবু যখন গাড়ীতে বাহির হন তখন রামসিং [illegible] পশ্চাতে উপবেশন করে, যখন পদব্রজে বাহির হন তখন তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যায় ও মাঝে মাঝে সম্মুখের লোকদিগকে সাবধান হইতে কহে আর যখন লালবিহারী বাবু ছড়ি হাতে করেন তখন ছাতিটা রাম সিং বহন করে, আর ছাতি হাতে করিলে রামসিং ছড়ি

বাহক হয়। বস্তুতঃ লালবিহারী বাবু, রাম সিং, ছাতি ও ছড়ি এই চারই সর্ব্বক্ষণই একত্র থাকে।

গড়ের মাঠে যে স্থানে, বাজি পোড়ান হইবে সে স্থান বাঁশ দিয়া পরিবেষ্টিত হইয়াছে। তাহার এক দিকে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের জন্য বসিবার স্থান প্রস্তুত করা হইয়াছে। সে স্থানে অপর লোকের গমন বন্ধ করিবার জন্য তাহার দুই প্রান্তে দুইজন পুলিস প্রহরী রহিয়াছে। এতাবৎ তথায় কেহ উপবেশন করে নাই। লাট সাহেব ও যে জার্ম্মণ দেশীয় রাজ পুরুষের জন্য এই ব্যাপার হইতেছে তাঁহারা পূর্ব্বে আসন গ্রহণ করিলে অন্যান্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপবেশন করিবেন এই নিয়ম করা হইয়াছে। কিন্তু এখনও লাট সাহেব ও জার্ম্মণ দেশীয় রাজ-পুরুষ আসিয়া উপস্থিত হন নাই, সুতরাং যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সেই বসিবার স্থানের নিকটে বেড়াইয়া বেড়াইতেছেন। লালবিহারী বাবু ও তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ এমন সময় রঙ্গ ভূমিতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গাড়ী ঘোড়া রাখিবার জন্য রঙ্গভূমির কিয়ৎদূরে একটী স্থান নির্দ্দিষ্ট করা ছিল। তথায় গাড়ী ঘোড়া রাখিয়া লাল-বিহারী বাবুরা পদব্রজে বেষ্টনের বহির্ভাগে গমন করিলেন। গমন করিয়া দেখিলেন তথায় ভদ্রাভদ্রের ইতর বিশেষ নাই। সকলেই গোলেমালে একত্র হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্দর্শনে লালবিহারী বাবুর তথায় থাকিতে ইচ্ছা হইল না। দূরে বসিবার স্থান দেখিয়া সমভিব্যাহারিগণ সহ তথায় যাইবার প্রস্তাব করি-লেন। তাঁহার শ্যালক রমেশ বাবু কহিলেন "ওখানে গিয়ে কাজ নেই, ও জায়গা আমাদের জন্যে করে নাই। সাহেব সুবোরা

এসে ওখানে বস্‌বে।” লালবিহারী বাবু উত্তর করিলেন “বিলক্ষণ! ভদ্রলোকের জন্যই ও জায়গা করেছে। সাহেবেরা ভদ্র লোক, আমরা কি ভদ্র লোক নই? চল ঐখানে যাই। এখানে ছোট লোকের মাঝখানে কেমন করে থাক্‌বো! আর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বা কতক্ষণ দেখবো?” এই কথা শুনিয়া অপর একজন কহিল “তবে তুমি যাও ভাই। তোমার পোশাক পরা আছে, তোমাকে যেতে দিলেও দিতে পারে। আমাদের যেতে দেবে না। আমরা এই খানেই থাকি।” লালবিহারী বাবু কহিলেন “ঐ জন্যেই তো আমি ধুতি পরে আসি নি। টের পেলে তো, পোশাক পরার এত গুণ? যা হোক এস তো চেষ্টা করে দেখা উচিত। যদি তোমাদের বস্‌তে না দেয় ঐ খানে দাঁড়িয়ে থাক্‌বে। তাতে আর বোধ হয় তোমাদের লোকসান হবে না। আসনটা উভয় জায়গায়ই সমান হবে।” এইরূপ শ্লেষ করিতে করিতে লালবিহারী বাবু বয়স্য-বর্গ সহ চলিলেন। তাঁহারাও বসিবার স্থানের নিকট উপস্থিত হইলেন, লাট সাহেবও আসিয়া পৌঁছিলেন। একটু পূর্ব্বে স্তবকে স্তবকে যে সমস্ত ব্যক্তিগণ বেড়াইতেছিল তাহারা সকলে সমবেত হইল, লাট-সাহেবকে সকলেই অভিবাদন করিল। লাট-সাহেব কাহার সহিত দুই একটী কথা কহিলেন, কোন কোন ব্যক্তিকে জার্ম্মণ রাজপুরুষের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন, কোন কোন ব্যক্তির দিকে চাহিয়া একবার মাত্র ঘাড় নাড়িলেন। অতঃপর তিনি ও জার্ম্মণ রাজপুরুষ উচ্চাসনে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন। অন্যান্য সকলে প্রত্যেকেই অগ্রে যাইবার জন্য ব্যস্ত হওয়ায়

একটু গোলমাল হইল। লালবিহারী বাবু দেখিলেন বড় বড় সাহেব উঠিয়া গেলে ক্রমশঃ ফ্রিঙ্গি প্রভৃতি উঠিতে লাগিল। তখন তিনি তদীয় শ্যালককে ডাকিয়া কহিলেন "ওঠোনা ?" তাঁহার শ্যালক কহিল "তুমি আগে যাও, দেখি কি হয়, তার পর আমরা যাব।"

লালবিহারী বাবু পশ্চাদ্ভাগে তাকাইয়া কহিলেন "রামসিং ?"

"হুজুর"

"তোম্ হিঁয়া খাড়া রহ।" এই বলিয়া লালবিহারী বাবু উঠিতে গেলেন। এক পা তুলিয়াছেন এমন সময়ে এক জন কনষ্টেবল আসিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া কহিল " পিছু যাও।"

লালবিহারী বাবু বলপূর্ব্বক হস্ত উন্মোচন করিয়া লইয়া উঠিতে গেলেন। এবার দুইজন কনষ্টেবল আসিয়া দুদিক হইতে দুই হাত ধরিয়া লালবিহারী বাবুকে পশ্চাদ্ভাগে টানিয়া আনিল। লালবিহারী বাবু রামসিং বলিয়া ডাকিলেন। অমনি রামসিং অগ্রসর হইয়া এক কনষ্টেবলকে ধরিয়া দুই চারি হাত তফাৎ আসিল। কনষ্টেবল চীৎকার করিয়া উঠিল শুনিয়া নিকটবর্ত্তী একজন ইংরাজ কনষ্টেবল গোলমাল বন্ধ করিতে কহিল। অমনি আর তিন চারি জন আসিয়া লালবিহারী বাবু ও রামসিংকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল এবং বল পূর্ব্বক তফাৎ করিয়া দিবার চেষ্টা করিল। রামসিং কহিল "তোম লোক জান্তা নেই এ ডেপুটী বাহাদুর হায়।" একজন কনষ্টেবল কহিল "রাখ দেও তোমরা ডেপুটী বাঁদর" এই বলিয়া হস্তস্থিত রুলদ্বারা রামসিংকে প্রহার

করিতে উদ্যত হইল। তদ্দর্শনে রামসিং ও লালবিহারী বাবু আর অনেক কথা না কহিয়া আস্তে আস্তে চলিয়া গেলেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যার মান তার কাছে।

লালবিহারী বাবু গড়ের মাঠে অপদস্থ হইয়া তৎক্ষণাৎ তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। চলিয়া আসিবার সময় তাঁহার সঙ্গিগণ বিদ্রূপ করিয়া কহিল "আমাদের এখানে জায়গা আছে, এইখানে এস। যদি নিতান্ত দাঁড়াতে না পার রেলের উপর ব'সে দেখবে এস।" আর একজন কহিল "পরিচয় দেবে তো একজন সাহেবের কাছে দিলে না কেন? তা হ'লে খাতির হতো।" অপর একজন কহিল "পোশাক প'রে আস্‌বার গুণ আছে যে এত দিনে টের পাওয়া গেল।" লালবিহারী বাবুর কর্ণে কথাগুলি তীরবৎ প্রবেশ করিতে লাগিল। তিনি কোন উত্তর না দিয়া গোলমালের মধ্যে মিশিয়া পড়িলেন। সঙ্গীরা দু এক জনে তাঁহাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার জন্য কিয়দ্দূর পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিল কিন্তু অনতিবিলম্বেই গোলমালের মধ্যে তাঁহাকে আর না চিনিতে পারিয়া পুনরায় রেলের নিকট গিয়া বাজি দেখিতে লাগিল।

যে যত প্রভুত্বাকাঙ্খী সম্মানের ক্রটীতে তাহার তত ভয়। লালবিহারী বাবুর অনেক গুণ সত্বেও সর্ব্বদাই কিসে সম্মান রক্ষা হইবে এই চিন্তার বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করায় কেহ তাঁহাকে ভাল বাসিত না। তিনি এক্ষণে যে স্থানে কার্য্য করেন পূর্ব্বে তথায় একজন ইংরেজ ডিপুটী-কালেক্টর ছিলেন। তাঁহার সহিত আমলাদের কাছারিতে যে দেখা শুনা হইত এতদ্ভিন্ন আর কোন সময়ে দেখা শুনা হইত না। লালবিহারী বাবু তথাকার কার্য্য-ভার গ্রহণ করিলে তিন চারি দিবস পরে কয়েকজন আমলা প্রাতঃকালে তাঁহার বাসায় আইল এবং বাঙ্গালী প্রথানুসারে পূর্ব্বে সংবাদ না দিয়াই একেবারে তাঁহার বৈঠকখানা ঘরে প্রবিষ্ট হইল। লালবিহারী বাবু খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন, আমলা-দিগকে দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনারা কি মনে করে?" আমলারা উত্তর করিল "মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ কোরব বলে এসেছি।"

লাল। কাল কাছারিতে তো সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর আজও তো হবে? তবে কষ্ট স্বীকার করে এতদূর আসবার দরকার কি?

"সেরূপ সাক্ষাৎ তো কাছারিতে প্রত্যহ হয়ে থাকে। তবে আমরা বাঙ্গালী, মহাশয়ও আমাদিগের দেশীয়, তাই মহাশয়ের নিকট হাজির হতে এসেছি।

লাল। কোন প্রয়োজন নাই। উইলকিমসন সাহেব যখন এখানে ছিলেন, তখন কি তাঁহার সহিত তোমরা দেখা কোর্‌তে আস্‌তে?

"আজ্ঞা না। তারা সাহেব লোক, মহাশয় স্বদেশী, এই জন্যই মহাশয়ের নিকট আসা হয়েছে।"

লালবিহারী বাবু ভাবিলেন তাঁহাকে বাঙ্গালী বলায় তাঁহার অবমাননা করা হইল এই হেতু রাগত ভাবে বলিলেন "সাহেবই হই আর বাঙ্গালীই হই, সাহেবের সঙ্গে তোমাদের যে সম্বন্ধ ছিল আমার সঙ্গেও তো তাই, তবে সেই রূপ ব্যবহারই কোরো।"

আমলাদিগের মুখপাত কহিলেন "মহাশয়ের নিকট হাজির হতে আসায় মহাশয়ের যে কিছু সম্মানের ক্রটী হবে এরূপ মনে করি নাই। সেরূপ মনে কোরলে আস্‌তাম না। তবে মহাশয় বাঙ্গালী——"

লালবিহারী বাবু পুনরায় বাঙ্গালী বলিয়া অভিহিত হওয়ায় অত্যন্ত রাগ করিয়া উঠিলেন। কহিলেন "ও সব গোস্তকীর কথা শুন্‌তে চাই নে, যাও সব বাড়ী যাও।"

সেরেস্তাদার আমলাদিগের পক্ষ হইতে কথা কহিতেছিলেন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ, বয়সে বৃদ্ধ, সকলেই তাঁহাকে সম্মান করে। বহুকাল বিনা দোষে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। লালবিহারী তাঁহাকে এরূপ তিরস্কার করিবেন এ তিনি স্বপ্নেও ভাবেন নাই। সুতরাং লালবিহারী বাবুর কথা শুনিয়া তিনি অবাক হইয়া রহিলেন। তখন কেরাণী রসিক বাবু অগ্রসর হইয়া কহিলেন "মহাশয় আমরা আপনাকে অপমান কোরতেও আসি নাই, আপনার নিকট গোস্তকী কোরতেও আসি নাই, তবে আপনি দেশীয় লোক বোলে আপনাকে সম্ভ্রম কোরতে এসে-

ছিলাম্। স্বদেশীয় লোক হলে পরস্পরের পদমর্য্যাদার বিভিন্নতা থাকলেও লোকে এরূপ আসা যাওয়া কোরে থাকে। যখন উইল্‌কিনসন সাহেব এখানে ছিলেন তখন লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর এসে বরাবর তাঁর ঘরে যেতেন, কোন বাঙ্গালী ডেপুটী কালেক্‌টরের বাড়ী কি কখনও কোন লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর গিয়েছেন? আর আপনার পদ এতই কি উন্নত তাও তো বুঝ্‌তে পারি না। সেরেস্তাদার মহাশয়কেও একবার ডেপুটী কালেক্‌টর করে দেবার কথা হয়েছিল, কিন্তু বাড়ী ত্যাগ করে উড়িষ্যায় যেতে হবে বলেই উনি যান নাই। যদি উড়িষ্যার দুর্ভিক্ষের সময় যেতেন, তা হলে এতদিন উনি আপনার অপেক্ষাও উচ্চ শ্রেণীতে উঠতে পারতেন।” এতদূর ডেপুটী বাবুকে বলিয়া পরে সেরেস্তাদারের প্রতি “আসুন সেরেস্তাদার মহাশয়, বেলা হলো, আর এখানে দাঁড়ায়ে থাকায় প্রয়োজন নাই।” এই বলিয়া আর অপেক্ষা না করিয়া সকলেই চলিয়া গেল।

লালবিহারী বাবু যখন নূতন সবডিবিজনে আইসেন তখন এই ঘটনা হয়। ক্রমে ক্রমে সকলের কায কর্ম্ম দেখিয়া লালবিহারী বাবুর রাগ পড়িয়া গেল, আমলাবর্গেরও আর কোন বিরক্তির কারণ রহিল না। কিন্তু রসিক বাবুর প্রতি লালবিহারী বাবুর মনোভাব পরিবর্ত্তন হইল না। রসিককে পদচ্যুত করিবার জন্য লালবিহারী বাবু বিস্তর চেষ্টা পাইয়াছিলেন কিন্তু কোন ক্রমে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অনেক বার রসিককে জরিমানা করিয়াছিলেন কিন্তু প্রতিবারই কালেক্টর সাহেবের নিকট আপিল করিয়া রসিক অব্যাহতি পান। সচরাচর

কেরাণী অপেক্ষা ইংরাজী ভাষায় অধিক ব্যুৎপন্ন হওয়ায় রসিক বাবু সংবাদ পত্রে লালবিহারী বাবুর কার্য্যে যে কোন দোষ ঘটিত তাহা প্রকাশ করিতেন। এইরূপ সংবাদ পত্রে দোষ প্রকাশ হওয়ায় লালবিহারী বাবুকে অনেক বার বিপদে পড়িতে হইয়াছে। সংক্ষেপত রসিক বাবু লালবিহারী বাবুর অধীন হইলেও লালবিহারী বাবু রসিককে সর্ব্বদা ভয় করিয়া চলিতেন।

গড়ের মাঠের ভীড়ের মধ্য হইতে চলিয়া আসিয়াই রসিক বাবুর কথা লালবিহারী বাবুর মনে উদিত হইল। তাঁহার জ্ঞান হইল রসিক যেন অন্তরীক্ষে থাকিয়া আনুপূর্ব্বিক সমস্ত দেখিয়া অন্যান্য আমলাদিগের সহিত হাসিতেছে ও বিদ্রূপ করিতেছে। রসিক যদি এ বিষয় সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে লেখে তাহা হইলে কি ভয়ানক হইবে! ইহাতে যে চাকরি যাইবে অথবা অন্য কোন ক্ষতি হইবে তাহা নয়, কিন্তু দেশাবচ্ছিন্ন লোকে হাসিবে! এখন উপায় কি? সবডিবিজানে ফিরিয়া গিয়া রসিকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলে কি রসিক চুপ করিয়া থাকিবে? কি প্রকারে ক্ষমা প্রার্থনা করা যাইতে পারে? কাছারিতে তো হতেই পারে না, এজলাসের নিকট সর্ব্বদাই লোক থাকে। বাটী ডাকিয়া আনিলে হয় না? যে অবধি আমলাগণকে প্রথম তিরস্কার করা হয় তদবধি কেহই বাটীতে আইসে নাই, কাহাকেও ডাকা হয় নাই। হঠাৎ রসিককে ডাকিলে একটা জানাজানি হইয়া পড়িবে। সকলেই রসিককে জিজ্ঞাসা করিবে, রসিক কথা কখন গোপনে রাখিবে না, ইচ্ছা থাকিলেও পারিয়া উঠিবে না। যদি

তাও পারে তথাপি লোকের মনে কেমন একটা সন্দেহ থাকিয়া যাইবে; হয় তো মনে করিবে কতই গুরুতর দোষের কার্য্য করা হইয়াছে। লালবিহারী বাবু এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছেন, রামসিং পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতেছে। সমস্ত দিবসের কষ্টে ও শীতে রামসিংহের অত্যন্ত ক্লেশ বোধ হইতেছে, আর চলিতে পারিতেছে না। সম্মুখে গাড়ী দেখিলেই রামসিং ভাবে এইবার বাবু গাড়ীভাড়া করিবেন কিন্তু এতাবৎ সেই ভাবনা নিষ্ফল হইয়া আসিতেছে। ক্রমে উভয়ে ধর্ম্মতলায় উপনীত। রামসিং মনে করিল এইবার অবশ্যই গাড়ী হইবে। কিন্তু লালবিহারী বাবুকে ধর্ম্মতলাও পার হইয়া যাইবার উপক্রম দেখিয়া রামসিং কহিল "হুজুর এখানে গাড়ী না নিলে আর পাওয়া যাইবে না।" লালবিহারী বাবু এরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে এতক্ষণ তাঁহার বাহ্যজ্ঞান ছিল না। রামসিংএর কথা শুনিয়া থামিলেন। কহিলেন এক খান গাড়ী আন। রামসিং গাড়ী আনিতে গেল, লালবিহারী বাবু ভবিষ্যৎ ত্যাগ করিয়া বর্ত্তমানের ভাবনায় মগ্ন হইলেন। "এখন কোথায় যাইব, কোথায় থাকিব? শ্বশুর বাড়ী গেলে ত য়গুার দলে দেক সেক করে মারবে। দেখা যাক কি হয়।" রামসিং গাড়ী আনিয়া কহিল "হুজুর উঠুন।" লালবিহারী বাবুর মনে হইল রামসিং যেন ঠাট্টা করিয়া তাঁহাকে হুজুর সম্বোধন করিল। রামসিং ব্যাটা পর্য্যন্ত আমার অপমান দেখিল। এ ব্যাটা ত সবডিবিজানে গিয়াই প্রকাশ করিয়া দিবে। এর মুখ কি প্রকারে বন্ধ করি। ভদ্র লোকের কথার উপর নির্ভর করা যায়, এ দিব্যি করলেও বিশ্বাস হবে না। গাড়ীতে উঠিবার

সময় গাড়য়ান জিজ্ঞাসা করিল "কোথায় যেতে হবে?" রামসিং উত্তর করিল "পটলডাঙ্গা।"

গাড়য়ান। পটলডাঙ্গায় যেতে কি দেবে বাবু বল?

লাল। যা দস্তুর আছে। তুমি কত চাও?

গাড়য়ান। কি দস্তুর বাবু, দস্তুর ফস্তুর আমি কিছু জানিনে। আমি পাঁস্বিকে চাই বাবু।

লাল। তোমার কোন্ ক্লাসের গাড়ী।

গাড়য়ান। তা শুনে মশায়, আপনি কি কোরবে?

লাল। তবু জিজ্ঞাসা করি?

গাড়য়ান। আমার থার্ট ক্লাসের গাড়ী বাবু। কিন্তু পাঁস্বিকের কমে আমি পার্‌বো না।

লাল। তোমার থার্ড ক্লাসের গাড়ী। ধর্ম্মতলা থেকে পটলডাঙ্গায় যেতে পাঁচসিকে নেবে। রামসিং নম্বরটা দেখে ন্যাও তো।

গাড়য়ান। আর লম্বর দেখে তুমি কি কোরবে বাবু?".

"তুমি" বাক্যে সম্বোধিত হইয়া লালবিহারী বাবু সহসা ইতিপূর্ব্বের গড়ের মাঠের ঘটনা বিস্মৃত হইয়া রাগ করিয়া কহিলেন "ব্যাটার যত বড় মুখ তত বড় কথা?"

এবার গাড়য়ান রাগত হইয়া কহিল "কি বাবু তুমি ব্যাটা ব্যাটা কর্‌ছো? হিসেব কিতেব কোরে কথা ক'য়ো। তোমাকে কি আমি ভরাই?"

রামসিং কহিল "হুজুর ও গোঁয়ার আদমী, আপনি ওর কথা শোনেন কেন?"

লালবিহারী বাবুর অমনি পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। কতক

সেই কারণে, কতক রামসিংয়ের কথাক্রমে বাবু আর কিছু না বলিয়া গাড়ীতে প্রবেশ করিলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে রাস্তায় লোকজন নাই। গাড়য়ান্ বেগে গাড়ী হাঁকাইল। লালবিহারী বাবু রাস্তার দুদিক দেখিতে দেখিতে চলিতেছেন। যতই গাড়ী অগ্রসর হইতে লাগিল ততই লালবিহারী বাবুর চিন্তা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। শ্বশুর বাটী গিয়া সকলের সহিত দেখা হইলে, কি বলিবেন, পাড়ার লোকে শুনিয়া কি বলিবে, তাঁহার স্ত্রী শুনিয়া কি বলিবেন? একে তো তাঁহার স্ত্রী তাঁহাকে বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করে, তার উপর এই বিষম ব্যাপার। ভাবিলেন রাত্রে আর কোন স্থানে থাকিতে পারিলে প্রত্যূষে কলিকাতা ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। এমন সময় রাস্তার বামদিকে চাহিয়া দেখিলেন "হিন্দু হষ্টেল" নামক ছাত্রদিগের বাসার নিকট আসিয়াছেন। হিন্দু হষ্টেলে কোন ছাত্রের সহিত আলাপ থাকিলে যে সে সেখানে থাকিতে পারে। লালবিহারী বাবুরও এক জন আলাপী ছাত্র ছিল। মনে করিলেন এই খানেই থাকা যাউক। গাড়ী থামাইতে কহিলেন। গাড়য়ান গাড়ী থামাইয়া কহিল "অনেক রাত হয়েছে, শিগ্‌গির করো।" লালবিহারী গাড়ী হইতে নামিয়া দেখিলেন যথার্থ অনেক রাত্রি হইয়াছে। লোক জন রাস্তায় চলিতেছে না। নিকটবর্ত্তী হোটেলে কএক-জন গোরা মাতাল হইয়া গোলমাল করিতেছে। লালবিহারী বাবু হষ্টেলের দ্বারে গিয়া দরয়ান দরয়ান বলিয়া ডাকিলেন, কিন্তু উত্তর না পাইয়া পুনরায় গাড়ীতে আসিয়া জোরে হাঁকাইতে কহিলেন। ভাবিলেন তাঁহার শ্যালক ইত্যাদির অগ্রে যাইলে

অসুখ হইয়াছে বলিয়া আহারাদি না করিয়া শয়ন করিবেন এবং প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কলিকাতা হইতে চলিয়া যাইবেন। এই অভিসন্ধি স্থির করিয়া লালবিহারী বাবু প্রফুল্লিত হইলেন, কিন্তু বহুবাজারের মোড় ঘুরিবার সময় দক্ষিণ দিক হইতে আর একখান গাড়ী আসিয়া তাঁহার অগ্রে চলিয়া গেল। লালবিহারী বাবু চমকিত হইলেন। এই কি তাঁহার শ্যালকের গাড়ী? না, তা নয়। তাহারা বাজী পোড়ান দেখিয়া ফিরিয়া আসিবে। তাহারা এত শীঘ্র কি প্রকারে আসিবে? তিনি ধর্ম্মতলায় পদব্রজে আসিতে না আসিতেই যে তাহারা সমস্ত বাজী পোড়ান দেখিয়া গাড়ীতে ফিরিয়া আসিতে পারে এ তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হইল না। ফলতঃ লালবিহারী বাবু এরূপ চিন্তায় মগ্ন ছিলেন যে তৎকালে তাঁহার সময়ের জ্ঞান ছিল না।

লালবিহারী বাবু শ্বশুর বাড়ীর গলিতে প্রবেশ করিবার সময় দেখিলেন একখানা গাড়ী ঐ গলী হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। লালবিহারী বাবুর বুক ধক্ ধক্ করিতে লাগিল। গাড়ী ইতাবসরে দ্বারে সংলগ্ন হইল। নামিতে ইচ্ছা নাই, অথচ না নামিলেও নয়। মনে ইতস্তত করিতেছেন এমন সময় বৈঠকখানার জানালা খুলিয়া তাঁহার শ্যালক উচ্চৈস্বরে কহিল "কে? ডেপুটী বাঁদর নাকি?"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

সুবিচার।

যাহার খোসামোদ করা যায় তাহাকে আর পেয়েও পাওয়া যায় না। অল্প বেতনভোগী চাকরের বেতন পাইবার তারিখ আসিয়াও আইসে না। বন্ধের দিন যতই গণনা করা যায় ততই যেন পিছাইয়া যায়, কিন্তু ছুটীর দিন দেখিতে দেখিতে চলিয়া যায়। নলিনের রবিবার কখন আরম্ভ হইল ও কখন শেষ হইল, না নলিন, না মনোরমা কেহই তাহা টের পাইল না। সোমবারের প্রাতে নলিনের বোধ হইল যেন শনিবারের রজনী অবসান হইয়া একেবারে সোমবারের সূর্য্য উদয় হইল। যে পায়ের বেদনা নলিন রবিবারে কিছুই টের পায় নাই সোমবারে সে বেদনা পুনরায় উপস্থিত হইল। কিন্তু বেদনা হউক আর নাই হউক আর বাটী থাকিবার যো নাই। নলিন প্রত্যূষে বাটী হইতে প্রস্থান করিল।

মনোরমা মনোদুঃখে আহারাদি করিলেন। অন্যান্য দিবস আহারের পর কোন না কোন কর্ম্ম করিতেন। কিন্তু অদ্য কোন কর্ম্ম করিতে ভাল লাগিল না। যে কর্ম্ম লইয়া বসেন

তাহাতেই বিরক্ত ধরিতে লাগিল। সুচি কার্য্য করিতে গেলেন কিন্তু কিছুই যেন চক্ষে দেখিতে পান না। পৈতা প্রস্তুত করিতে গেলেন, গুণ গুলি ছিঁড়িয়া যাইতে লাগিল। "দূর হউক" বলিয়া সে সমস্ত তুলিয়া রাখিয়া বাটীর নিকটবর্ত্তী তন্তুবায়দিগের বাটীতে গেলেন। মনোরমা যখন তখন এই তাঁতিদিগের বাটীতে যাইতেন। তাঁতিরা সংগতিশালী গৃহস্থ, অর্থাৎ তাহাদিগের ধার কর্জ্জ করিতে হয় না। ক্ষেত্রে যে ধান্য পায় তাহাতেই সম্বৎসর চলে, কখন কখন কিছু উদ্বৃত্তও হয়, সে গুলি কর্জ্জ দেয়। জমীদারের খাজনা বাকী থাকে না, দোকানে দেনা নাই। ফরসা কাপড় চোপড় পরে। জমীদার মাঝে মাঝে তর্জ্জন গর্জ্জন করেন কিন্তু বুদ্ধি থাকায় ও কিঞ্চিৎ লেখা পড়া জানায় সে সমস্ত তর্জ্জন গর্জ্জনে ভয় পায় না; এজন্য জমীদারের চক্ষের শূল। নকড়ী তাঁতিবাটীর কর্ত্তা, বয়স আন্দাজ ত্রিশ বৎসর। বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু স্ত্রীর বয়স বার তের বৎসরের অধিক নয়। নকড়ীর মাতা প্রাচীনা; বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ বৎসরের অধিক নয়। নকড়ীর মাতার কি নাম তাহা গ্রামে কেহ জানে না, কেহ কখন জিজ্ঞাসাও করে নাই। সকলেই 'নকড়ীর মা' বলিয়া ডাকে। এই তিন জন ভিন্ন নকড়ীর এক ভাগিনেয় নকড়ীর বাটীতে থাকে। তাহার নাম মঙ্গল। মঙ্গল চন্দ্র, কি মঙ্গল কুমার, কি মঙ্গলনাথ কি আর কিছু তাহা কেহই জানে না। সকলে মঙ্গলা বলিয়া ডাকে। মঙ্গলা প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া কৃষাণ চাকর গুলি লইয়া মাঠে যায়, বেলা দুই প্রহরের পর গৃহে ফিরিয়া আইসে। বৈকালে কাজ কর্ম্ম করে। নকড়ী সকাল বেলা কোন দিন

জমীদারের বাটী, কোন দিন মাঠে, বা কোন দিন অন্য কার্য্যে যায়, বৈকালে তাঁত বোনে। নকড়ীর মাতা মনে করে মঙ্গলা কেবল বসিয়া বসিয়া খায়, আর নকড়ীই সমস্ত কাজ কর্ম্ম করে। এই সংস্কার নকড়ীর মাতার মনে বদ্ধমূল থাকায় যে যে ঘটনা হইবার সম্ভাবনা তাহা সর্ব্বদাই ঘটিত অর্থাৎ নকড়ীর মাতার সহিত মঙ্গলার সর্ব্বদা কলহ বিবাদ হইত। মঙ্গলা হারিয়া গেলে সে দিন সেই খানেই কলহের শেষ হইত। যে দিন মঙ্গলা না হারিত সে দিন নকড়ীর মা কাঁদিয়া নকড়ীর নিকট নালিস করিত। নকড়ী চিরকালই মঙ্গলার দোষ সাব্যস্ত করিয়া মঙ্গলাকে প্রহার করিত।

মনোরমা অদ্য যে সময় তাঁতি বাড়ী উপস্থিত হইলেন তখন মঙ্গলায় ও নকড়ীর মায়ে সচরাচর যে রূপ গদ্য হইয়া থাকে তাহাই হইতেছে। নকড়ীর মাতার সংস্কার আছে নকড়ী যতক্ষণ নিজের কার্য্য করিয়া ফিরিয়া না আসিবে ততক্ষণ স্নানাহারের সময় হইবে না। অদ্য নকড়ী এখনও ফিরিয়া আইসে নাই। মঙ্গল মাঠের কাজ কর্ম্ম দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। নকড়ীর মাতা নলী প্রস্তুত করিতেছিল। মঙ্গলাকে বাটী আগত দেখিয়া কহিল "মোংলা, তুই বেলা চারি দণ্ড না হতে হতেই যে বাড়ী এলি ?"

মঙ্গলের চক্ষু লাল। শীতকাল তথাপি কপালে ঘর্ম্ম হইতেছে। নকড়ীর মাতার কথায় কোন উত্তর না দিয়া মঙ্গল প্রাঙ্গনে বসিল। নকড়ীর মাতা সহজে ছাড়িবার পাত্র নয়। মঙ্গলকে বসিতে দেখিয়া কহিল "বড় বসলি যে ? এত সকালে

সকালে মাঠে থেকে ফিরে আস্‌তে তোরে কে বোল্লে? নকড়ী এখনও বাড়ী আসে নি। তোর বুঝি আর খিদে বরদস্ত হলো না?"

মঙ্গল উত্তর করিল "তোমার নকড়ী না এলে বুঝি আর কারুর খিদে লাগবে না। নকড়ীই মানুষ আর আমরা বুঝি গরু? একশ বার অমন বকাবকী কোরো না। খিদের সময় ও সব কথা সয় না।"

"তোর যত বড় মুখ তত বড় কথা। কার খাস তা টের পাস না?"

"তা বেশ টের পাই, তোমার বকুনী, মামার মার আর আমার নিজের মিহন্নতের ভাত। মাঠের কাজ চরকা ঘোরানও না, ঠক্ ঠক্ কোরে তাঁত বোনাও না, যদি একবার কোরে দেখ্‌তে তবে বুঝতে পার্‌তে। তা হলে আর তোমার ডাগর গলা থাক্‌তো না।"

মঙ্গলের কথা শেষ না হইতে হইতেই মনোরমা আসিয়া উপস্থিত হইয়া কহিলেন "কি নকড়ীর মা, আজ আবার কি গোলমাল কোর্‌ছো?"

নকড়ীর মা কহিল "দেখ দেখি দিদি, আমি এর উপায় কি করি? বেলা এক পর না হতে হতেই মঙ্গলা মাঠ ঘাটের কাজ ফেলে বাড়ী এল। সমস্ত বছর মিহন্নত কোরে ধান গুলো হলো, এখন দু এক দিন একটু পরিশ্রম কোল্লেই সেগুলি ঘরে আসে। কিন্তু মঙ্গলা জেদ কোরেছে যে ধান গুলো নষ্ট কোর্‌বেই কোর্‌বে।"

মনোরমা কহিলেন "নকড়ীর মা, বেলা যে গিয়েছে। তুমি বোল্‌ছ এক পর না হতে হতেই মঙ্গলা ফিরে এসেছে, কিন্তু চেয়ে দেখ দেখি বেলা পর থানেকের বেশী নাই। আর মঙ্গলা তোমার ধান নষ্ট কোরবে কেন, মঙ্গলার যত্নেই তো ধান গুলি হয়েছে। ক্ষেতের কাজ তো মঙ্গলা ছাড়া আর কেউ দেখে না।"

নকড়ীর মা। ন্যাও মেনে দিদি, তুমি আর ওরে নাই দিও না। তোমরা ভালো বোলে বোলেই তো ও ছোঁড়াকে নষ্ট কোর্‌লে।"

মঙ্গল। দিদিমা ঠাকুরুণ ঐ কথাটা একবার আইকে বুঝিয়ে বলো। সেই চাষের গোড়া থেকে শেষ পর্য্যন্ত আমি সব কোরে কি এখন আমি সব নষ্ট কোর্‌তে পারি? আমার কি তাতে দুঃখ হয় না? আর একটা কথা বুঝিয়ে বলো যে ওর নকড়ী না এলেও বেলা হয়ে থাকে।"

মনোরমার বিবাদ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিতে ইচ্ছা হইল না। তিনি দু এক কথা মঙ্গলের সাপক্ষে বলিলেই যে মঙ্গলের কোন উপকার হইবে তাহার সম্ভাবনাও ছিল না। এজন্য বিষয়ান্তরে নকড়ীর মাতার মন ফিরাইবার জন্য কহিলেন "নকড়ীর মা, নকড়ী আজ কোথায় গিয়েছে?"

নকড়ীর মাতা রাগতস্বরে উত্তর করিল "বিলেত সাদে গিয়েছে?"

মনোরমা বুঝিতে পারিলেন নকড়ীর পক্ষ সমর্থন করায় নকড়ীর মাতা তাহার উপর রাগ করিয়াছে। নকড়ীর মাতাকে সন্তুষ্ট করিবার জন্য মনোরমা নিকটে বসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন

"কৈ তোমাদের রান্না হয় নাই ?" পরে রন্ধনশালার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন "এই যে রান্না হয়েছে। নকড়ীর মা, আজ কি বউ রেঁদেছে না কি ? বউ কেমন রাঁদে ?"

নকড়ীর মা। আর দিদি আমাকে আর ও সব কথা জিজ্ঞাসা কোরোনা। "এক ভস্ম আর ছার, দোষ গুণ কবো কার। ওঁরা সকলেই ভালো, আমি কেবল মন্দ। বাইরে মঙ্গলা, ভেতরে বউ, এই দুজনের জ্বালাতেই আমার হাড়টা জ্বলে গেল।"

মনোরমা। আজ তুমি অমন হয়েছ কেন, নকড়ীর মা ? বউকে তো তুমি কখনও নিন্দে করো নি ? তোমার অতটুকু বউ, ও যে কাজ কর্ম্ম করে এই ওর বাহাদুরি। ওর উপর রাগ—"

মনোরমা এতদূর বলিয়াছেন এমন সময় নকড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। নকড়ীর মাতা কহিল "এতক্ষণ কোথায় ছিলে ? বেলা যে নেই।"

মঙ্গলা। এখন কেমন আই ? তোমার ছেলের বেলা বেলা নেই, আর আমার বেলা বেলা হয় নি ; এ তোমার খুব বিচার ?

নকড়ীর মাতা। তুই থাম লক্ষীছাড়াটা। তোর কথা আমার সয় না। পরে বউকে সম্বোধন করিয়া "ও বউ, বলি মরে আছ নাকি ? সমস্ত দিন তেতে পুড়ে এল, তেল দাও।"

এই কথা শুনিয়া বউ লজ্জায় জড়সড় ও ঘোমটায় আবৃত হইয়া এক বাটী তৈল-হস্তে কম্পিত-কলেবরে রন্ধনশালা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। নকড়ী বড় লজ্জাশীল। বউকে ঘরের দ্বারে দেখিয়া অমনি "ভালো কথা মনে হয়েছে, আমি আসি" এই বলিয়া তাঁত

বুনিবার ঘরে প্রবেশ করিল। তদ্দর্শনে নকড়ীর মাতার মুখ আহ্লাদে ডগমগ করিতে লাগিল। মনোরমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ইঙ্গিত করিল। মনের ভাব এই "দেখ এত বড় সেয়ানা ছেলে তবু মায়ের নিকট কেমন সুশীল, কেমন নম্র।"

বউ তৈল রাখিয়া নকড়ীর মাতার দিকে চাহিয়া দ্বিতীয় হুকুম প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। নকড়ী ততক্ষণ ঘরেই। যতক্ষণ বউ পুনরায় গৃহ মধ্যে প্রবেশ না করিবে ততক্ষণ নকড়ী বাহিরে আসিবে না জানিতে পারিয়া নকড়ীর মাতা বউকে কহিল "আবার ফ্যাল ফ্যাল কোরে দেখিস কিরে? ঘরে যা। ও রে এমন নিলর্জ্জে বউ তো আমি কখন দেখি নিরে?" নকড়ীর মাতার মুখে মিষ্ট কথা অতি বিরল। যদি কখন মিষ্ট কথা কহিত তাহা অন্য লোকের নিকট তিরস্কারের ন্যায় বোধ হইত।

নকড়ীর মাতার কথা শুনিয়া বউ তথা হইতে প্রস্থান করিল, নকড়ীর তাঁত ঘরের কার্য্য সমাধা হইল। নকড়ী বাহিরে আসিয়া মনোরমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মাসি মা ঠাকরুণ, আপনার আহার হয়েছেন?"

মনোরমা উত্তর করিল "হয়েছে। তোমার আজ এত দেরি হলো কেন নকড়ী?"

নকড়ী কহিল "মাসি মা ঠাকরুণ দেরির কথা কেন জিজ্ঞাসা করেন? রায় মহাশয়দের বাটী পাঁচটা টাকা পাবো, তা কোন মতেই আদায় কোরে উঠ্‌তে পাচ্ছিনে। যদি ধার না দি তাহলেও রাগ করেন, কিন্তু দিলে আর উবুড়হস্ত করেন না। আজ গিয়ে ধন্না দিয়ে বসেছিলাম। বড় বাবু বোল্লেন মোটে টাকা

নেই। একটু পরেই ওপাড়ার স্বরূপ সা এসে কতক গুলা টাকা দিয়ে গেল। আমি বোল্লাম "বড় বাবু এই তো টাকা এল, এখন দিন।" তখন বড় বাবু বোল্লেন "পাগল, এ টাকা কি দেবার যো আছে, এ যে ব্যবসার টাকা।" আমি বোল্লাম 'বাবু আমারও তো ব্যবসার টাকা। বিশেষ প্রায় সাত আট মাস হতে চল্লো, সুদই প্রায় এক টাকা হলো।' এই কথা বলায় সেখানে যারা ছিল হেসে উঠলো। বড় বাবু রাগ করে আমাকে কতকটা গাল দিলেন। বিবেচনা করে দেখ মাসিমা ঠাকুরুণ আমরা গরিব মানুষ, আমাদের যৎকিঞ্চিৎ পুঁজি। তাও যদি কাজের সময় না পাব তবে আমাদের উপায় কি?"

মনোরমা কহিলেন "এ বড় অন্যায় কথা বটে। বাবুরা দু চার টাকার জন্যে এত ঘুরাঘুরি করেন কিন্তু রেয়েৎ জনের খাজনা বাকি থাক্‌লে পেয়াদার উপর পেয়াদা পাঠান। পেয়াদার রোজ দিতে হয়, আর ঘটী বাটী বেচে টাকা দিতে হয়। সে সময় বাবুরা নিজের কথা মনে করে দেখেন না।"

নকড়ী। এবার আমিও লালিস কোরবো। আর সোম-বারের দিন টাকা দেবেন বোল্লেন, যদি না দেন তবে আর মিথ্যা ঘুরো ঘুরি না করে একেবারে মহাকোমায় গিয়ে ছোট আদালতে লালিস রুজু কোরবো।"

মনোরমা কহিলেন "সে যা হয় কোরো। এখন বেলা নেই চান করে এস।"

নকড়ী উঠিয়া গেলে নকড়ীর মাতা কহিল "দেখ্‌লে দিদি, কি সোনার ছেলে আমার? এমন সেয়ান ছেলে তবু আমার

মুখ পানে চেয়ে কথা কয়না। বউ এখানে তেল দিতে আস্‌বে বলেই অমনি ঘরের মধ্যে গিয়াছে ; বউর সঙ্গে তো কথা কওয়া দূরে থাক্। সে দিন শুনলাম বড় বাবুর ছেলে নাকি বোয়ের কথা নিয়ে বড় বাবুর সঙ্গে ঝগড়া করেছে। দিদি, বড় মানুষ হলে কি সরম ভরমও থাকে না ?”

“নকড়ীর মা, নলিনের কথা শুনেছ ? কাল যখন আমি বোল্লাম' আমার কাছে দু এক টাকা আছে। তোমার বিয়ে হলে সেই টাকা দিয়ে বোয়ের গয়না গড়ে দেব। অমনি দাদার আমার মুখখানায় যেন কেউ সিঁদুর ঢেলে দিলে। এমনি রাঙ্গা হলো। লজ্জায় আর মুখ তুলে কথা কইতে পাল্লে না।”
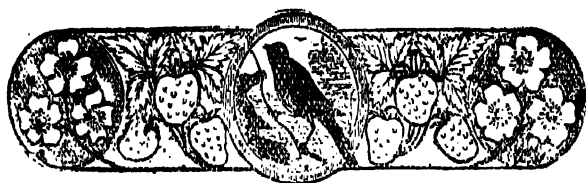
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

পরগৃহে।

লালবিহারী বাবুকে গাড়ী হইতে নামাইয়া হিমে রাখিয়া আসিয়াছি। আর অধিকক্ষণ তাঁহাকে শীতে কষ্ট দেওয়া উচিত নয়। হাজার হউক তবু হাকিম। কালেক্টর সাহেবের নিকট ভূমে মাথা লোটাইয়া সেলাম করুন না কেন, কালেক্টর সাহেবের বকুনি তিরস্কার খা'ন না কেন, কমিসনরের হেড কেরানিকে গুরু ঠাকুরের ন্যায় ভক্তি করুন না কেন, কালেক্টর সাহেবের চাপরাসীদিগকে সমাদরে বসিতে দিন না কেন; তুমি, আমি, রাম, শ্যাম ইত্যাদি ভদ্র লোকের পক্ষে তিনি ব্যাঘ্র বটেন তো? আমাদের কথন তিনি তুই ভিন্ন তুমি বলেন না তো? রাস্তায় চলিয়া যাইবার সময় হঠাৎ ডেপুটী বাবুর সম্মুখে পড়িলে রামসিং আমাদিগকে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দেয় তো? তবে আর কি? আমাদিগের উচিত কি তাঁহাকে কষ্ট দেওয়া। বস্তুত আমি তাঁহাকে কষ্ট দিই নাই। কারণ লালবিহারী বাবু গাড়ী হইতে নামিয়াই বৈঠকখানায় না গিয়া একেবারে তাঁহার শয়নাগারে

গমন করিয়াছেন। একথা আমি জানি বলিয়াই এতক্ষণ অন্যান্য বিষয় লিখিতেছিলাম।

লালবিহারী বাবু ভাবিলেন বৈঠকখানায় প্রথমতঃ গমন করিলেই ডেপুটী বাঁদর বলিয়া একটা কোলাহল উপস্থিত হইবে। চাকরেরা শুনিতে পাইবে। পরে চাকরেরা সেই কথা অন্তঃপুরে বলিবে। ক্রমে তাঁহার স্ত্রীর কর্ণে যাইবে। যিনি যেখানে যাহাই করুন নিজের স্ত্রীর কাছে সকলেই মহৎ হইতে চাহে। লালবিহারী বাবুর স্ত্রী এ কথা শুনিলে তাঁহার মহত্ব কোথায় রহিবে? এই ভাবিয়াই লালবিহারী বাবু বৈঠকখানায় যান নাই। পাঠকবর্গ স্বীকার করিবেন, লালবিহারী বাবু বৈঠকখানায় না গিয়া ভালই করিয়াছেন। কিন্তু বৈঠকখানায় না যাওয়ায় কথাটা গোপনে রহিয়াছে কি না সেটা বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। স্ত্রীলোককে কারারুদ্ধ করিয়াই রাখুন, আর নখিন্দরের মতন ছিদ্রশূন্য লৌহ গৃহেই রাখুন, কিন্তু অজ্ঞাত পুরুষ বাটী আসিলে তাহাকে দেখিবেই দেখিবে, কোন নূতন তামাসার কথা হইলে তাহা শুনিবেই শুনিবে। লালবিহারী বাবু না আসিতে আসিতেই যে ডেপুটী বানরের কথা ভিতরে বাহিরে প্রচারিত হইয়া গিয়াছে তাহা তিনি টের পান নাই। টের পাইলে বোধ হয় শয়নাগারে একেবারেই যাইতেন না। যাহা হউক, তাঁহার শ্যালক চাকর দিয়া, লালবিহারী বাবুকে ডাকিয়া পাঠাইলেন কিন্তু লালবিহারী বাবু "অসুখ হইয়াছে" বলিয়া আর বৈঠকখানায় গেলেন না। ক্ষণকাল পরে আহারের যায়গা হইল। লালবিহারী বাবুর শ্যালক লালবিহারী বাবুকে আহার করিতে ডাকিলেন কিন্তু লালবিহারী

বাবু কহিলেন "আমার অসুখ হয়েছে, আমি আহার কোরবো না।" লালবিহারী বাবুর শ্যালক কহিলেন "কিছু জল খাবেনা?"

লালবিহারী বাবু "না।"

লালবিহারী বাবুর শ্যালক "দুটা একটা কলা?"

লাল। আঃ যাও? এক কথা নিয়ে এক শ বার ঠাট্টা ভাল লাগে না। ও সব রামায়ুণে ঠাট্টা আমার বরদস্ত হয় না।

লালবিহারী বাবু যথার্থ রাগত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া লালবিহারী বাবুর শ্যালক আর কিছু না বলিয়া নিজে আহার করিতে গেলেন।

ক্ষণকাল পরে লালবিহারী বাবুর স্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে? ভাত খাবেনা কেন? তুমি রাত্রে ময়দা খাওনা বোলে কত যত্ন কোরে মা নিজে রেঁদেছেন। না খেলে তিনি দুঃখ কোর্‌বেন। ওঠ, ভাত খাবে এস।"

লালবিহারী বাবুর ক্ষুধায় সর্ব্ব শরীর ঘুরিতেছে, কিন্তু তথাপি ...য়ে যাইতে পারিলেন না। কহিলেন "যদি নিতান্তই না ছাড়‌বে চারটী ভাত নিয়ে এস। দেখি যদি অধিক রাত্রে ক্ষুধা ...য় তবে আহার কোর্‌বো।"

লালবিহারী বাবুর স্ত্রী কহিলেন "তুমি কি ক্ষেপেছ নাকি? দাদা ঠাট্টা করে দু কথা বোলেছে তাইতে অন্ন ত্যাগ? ইচ্ছেয় তোমাকে সকলে বাঙ্গাল বলে।"

লালবিহারী বাবুর জলন্ত মনাগুনে ঘৃতাহুতি দেওয়া হইল। নিজের স্ত্রী তাঁহাকে বাঙ্গাল বলিল। কিন্তু কিছুই করিবার যো

নাই। সুতরাং রাগত হইয়া বলিলেন "যাও যাও আর জ্বালাতে হবে না। আমি ভাত খাব না। যদি বাঙ্গালের এত ঘৃণা থাকে তবে বিয়ে কোরলে কেন?"

লালবিহারী বাবুর তিরস্কারে তাঁহার স্ত্রী রাগ করিয়া কহিলেন বিয়েতে যদি আমার হাত থাক্‌তো তবে মানুষের সঙ্গেই হতো। বানরের সঙ্গে হতো না।"

এই কথা শুনিয়া লালবিহারী বাবুর যে কি পর্য্যন্ত রাগ হইল তাহা বলা যায় না। শয্যা হইতে বিদ্যুতের বেগে গাত্রোত্থান করিয়া এক হাতে তাঁহার স্ত্রীর হস্ত ধরিলেন, অপর হাতে তাঁহাকে প্রহার করিবার উদ্যোগ করিলেন।

বিধুমুখী—লালবিহারী বাবুর স্ত্রীর নাম বিধুমুখী—রাগে কম্পিত-কলেবরা হইয়া কহিলেন "হাঁ মারবেই তো? আমাকে মারবেনা তো আর কাকে মারবে? আমি তো গোরাও নই, কনষ্টেবলও নই যে ফিরে মারবো।"

লালবিহারী বাবু লজ্জায় ও রাগে ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া স্ত্রীর হস্ত ছাড়িয়া দিয়া কহিলেন "চল্লাম আমি এই মাত্রেই চল্লাম, আর এক মুহূর্ত্তও এবাড়ী থাক্‌বো না।" এই বলিয়া পোশাক পরিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে বিধুমুখী কহিলেন "যাও রাস্তায় কিছু কনষ্টেবল আছে?"

লালবিহারী বাবু আর সহ্য করিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। কহিলেন "আজ তুমি স্ত্রী হয়ে আমাকে যে অপমান কোরলে এমন অপমান আমার জীবনে কেউ কথন কোরতে পারে নাই। আমার নিজের বাড়ী হলে যা কোরতাম তা মনেই

রইল, কিন্তু এ তো আমার নিজের বাড়ী নয়, এখানে সকলই সৈতে হবে।” কাঁদিতে কাঁদিতে এই বলিয়া মাটীতে বসিয়া পড়িলেন।

স্বামীকে কাঁদিতে দেখিয়া বিধুমুখীর মনে অত্যন্ত দুঃখ হইল। তখন লালবিহারী বাবুর হাত ধরিয়া কহিলেন “ছি, ছি, কাঁদে হয়? আমি ঠাট্টা করে ছুটা কথা বোলেছি বোলেই কি রাগ কোরতে হয়? ওটো কাপড় ছাড়।”

লাল। ঠাট্টা কোরে ছুটা কথা বলেছ? যদি রাগ ক’রে আমাকে দশ কথা বোল্‌তে তবু আমার এত কষ্ট হতো না। আমার এখানে বিয়ে করাই ব্যাকুবী হয়েছে। অনেকে বারণও কোরেছিল, কিন্তু তখন তাদের কথা শুনি নি। সৎ পরামর্শ লঙ্ঘন করার ফল এত দিনে ফোল্লো।

বিধু। আবার ঐ কথা বোলছো? আমার ঘাট হয়েছে আমি আর তোমাকে রাগাব না।” এই বলিয়া বিধুমুখী অঞ্চল দ্বারায় স্বামীর চক্ষু মোছাইতে লাগিলেন। লালবিহারী বাবুর রাগ গিয়া দুঃখ উপস্থিত হইল। বিধুমুখী যতই চক্ষু মুছিয়া দেন ততই চক্ষে বেশী জল আসিতে লাগিল। ক্রমে বিধুমুখী সহস্তে লালবিহারী বাবুর চাপকান খুলিয়া লইয়া, হস্ত ধরিয়া বিছানায় শয়ন করাই-লেন। লালবিহারী বাবুর ক্রন্দন থামিলে অন্ন ব্যঞ্জন আনিয়া দিলেন। লালবিহারী বাবু অসুখ এবং অক্ষুধা সত্ত্বেও বিলক্ষণ আহার করিয়া পুনরায় শয়ন করিলেন। ক্ষণকাল পরে বিধুমুখীও আহার করিয়া আসিয়া শয়ন করিলেন। শয়ন করিয়া লাল-বিহারী বাবুকে জিজ্ঞাসিলেন “আজ গড়ের মাটে কি হয়েছিল?”

লালবিহারী বাবু কাতরস্বরে কহিলেন "যা হবার হয়েছে। তোমার পায়ে পড়ি আমাকে আর ও কথা জিজ্ঞাসা কোরো না। আমি বাঙ্গালই হই আর যাই হই, তোমার স্বামী তো বটী, তার তো ভুল নেই। আমি যে কথায় কষ্ট পাই তা কি তোমার মুখে আনা উচিত ?"

বিধুমুখী। সে যা হবার তাতো হয়ে বোয়ে গিয়েছে। কষ্ট তো চুকেই গিয়েছে ? এখন সে কথা বোল্‌তে আর কি দোষ ?

লালবিহারী। তুমি আমার কথাটা ভাল কোরে বুঝ্‌লে না। এমন কি কখনও কোন কথা হয় না যা স্মরণ হলে লজ্জা বোধ হয় ? তা তোমাকে আর কি বোলবো ? সকলই আমার অদৃষ্টের দোষ। যদি ভাল বাস্‌তে আমাকে তবে বুঝ্‌তে পার্‌তে। আমার কষ্টে তো তোমার কষ্ট হয় না ? বরঞ্চ যাতে আমার কষ্ট বাড়ে তুমি তাই কর। মহাভারত তো তুমি পড়েছ, দেখ দেখি গান্ধারী কেমন সাধ্যা স্ত্রী ? স্বামীকে কত ভাল বাস্‌তো ? ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিল ব'লে গান্ধারী চিরটা কাল চকে কাপড় বেঁধে থাক্‌তো। স্বামী যে সুখে বঞ্চিত সে সুখ নিজেও ভোগ কোরবে না।

বিধু। তুমি কি আমারে গড়ের মাটে গিয়ে ধাক্কা খেয়ে আস্‌তে বলো নাকি ?

লাল। মহাভারত ! তা আমি বোলছিনে। আমি এইমাত্র বলি যে আমাকে ওকথাটা শুনাইও না।

বিধু। তুমি যে প্রায় নীলকমলের মতন হয়ে পড়লে ?

লাল। নীলকমলের মতন কেমন ?

বিধু। নীলকমলকে চেন না? সে যে আমাদের এখানে প্রায়ই মাঝে মাঝে এসে। তাকে 'বাছা হনুমান' বল্লে আর রক্ষা নেই। রেগে অগ্নি হয়ে ওঠে, আর যা মনে এসে তাই ব'লে গাল দেয়।

লাল। আমার এখনও ততদুর হয় নি। কিন্তু তোমরা যে নেগেছ তাতে হবারও বিচিত্র নেই। সে যা হউক একটা কথা জিজ্ঞাসা করি তার কি বল দেখি? আমার তো আর সর্ব্বদা এখানে যাওয়া আসার সুবিধা হবেনা। এবার যে সাহেব ব্যাটা এসেছে সে বড় দুষ্ট, মোটে ছুটী দেয় না। তাই আমি তোমাকে নিয়ে যেতে চাই।

বিধু। এই বুঝি তুমি কথা ভুলিয়ে দেবার ফিকির কোরছো? আমি ভুলবার লোক নই। আমাকে বোল্‌তেই হবে আজ কি হয়েছে।

লাল। নিতান্তই যদি না ছাড় তবে বলছি কিন্তু আগে আমার কথাটার জবাব দেও। তোমার যাবার সম্বন্ধে কি বল।

বিধু। সে কথা আমি আর কি বোল্‌বো? দাদার কাছে জিজ্ঞাসা কর। তিনি পাঠিয়ে দেন যাব। না পাঠিয়ে দিলে তো আমি জোর করে যেতে পারি না?

লাল। তবে তুমি তোমার দাদাকে জিজ্ঞাসা কোরো?

বিধু। পোড়া কপাল আর কি? তাও কি কেউ কখনও কোর্‌তে পারে?

লাল। আচ্ছা তবে আমি চিটি লিখ্‌বো। আমাকে কাল্ ভোরে যেতে হবে, নৈলে আমিই জিজ্ঞাসা কোরতাম। এই

বলিয়া লালবিহারী বাবু বার দুই হাই তুলিলেন। পরক্ষণেই চক্ষু মুদিত করিলেন।

বিধু। ওকি, ঘুমুলে না কি? বিলক্ষণ! আমার কাছ থেকে কথা ফাকি দিয়ে বার ক'রে নিয়ে আর নিজের বেলা বুঝি ঘুমুলে? এই বলিয়া বিধুমুখী লালবিহারী বাবুর গায়ে হস্ত দিয়া জাগাইবার চেষ্টা করিলেন।

নিদ্রিত ব্যক্তিকে জাগান যায়, কিন্তু যে নিদ্রা ভাণ করে তাহাকে কে জাগাইতে পারে? বিধুমুখী বিস্তর চেষ্টা করিলেন কিন্তু লালবিহারী বাবু কোন মতেই কথা কহিলেন না। বিধুমুখী কিয়ৎক্ষণ পরে নিদ্রিত হইলেন। তখন লালবিহারী বাবু গাত্রোত্থান করিয়া নিজের বস্ত্রাদি ঠিক ঠাক করিয়া রাখিয়া দিলেন, যেন সকাল বেলা আর স্ত্রীকে কাপড়ের জন্য না জাগাইতে হয়। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কখনও শ্বশুর বাটী আসিবেন না।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

হুজুরের হুকুম।

লালবিহারী বাবু রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া রামসিংকে দুখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইতে কহিলেন। রামসিং টিকিট আনিলে লালবিহারী বাবু তাহার একখানা নিজে লইলেন ও অপর খানি রামসিংকে দিয়া কহিলেন "আমি যে গাড়ীতে উঠ্‌বো তুমিও সেই গাড়ীত উঠো।" রামসিং বিনয় পূর্ব্বক কহিল "আমার জন্য এ টিকিট কেন? আমি থাট কেলাসে গেলেই তো হতো?" লালবিহারী বাবু কহিলেন "তোমার সঙ্গে কথা আছে।" এই বলিয়া উভয়ে গিয়া একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে চড়িলেন। রামসিং গাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই মনে করিল বাবু কতই যেন গোপনীয় কথা কহিবেন। কান লম্বা করিয়া বাবুর নিকট দাঁড়াইয়া আছে। লালবিহারী বাবু রামসিংকে বসিতে কহিলেন। হুজুর যেখানে বসিয়া আছেন সেখানে রামসিং কি প্রকারে বসিবে? লালবিহারী বাবু কহিলেন তাহাতে কোন দোষ নাই। তখন রামসিং কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইয়া উপবেশন করিল।

লালবিহারী বাবু মনে করিয়াছিলেন রামসিংকে দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে উঠিতে দেওয়ায় তাহার বিশেষ আহ্লাদ ও কৃতজ্ঞতা হইয়াছে। বস্তুত সেটী ভুল। কারণ বাবুর নিকট বসায় রামসিংয়ের কথা বন্ধ, গল্প বন্ধ, গান বন্ধ, তামাক বন্ধ, সকলই বন্ধ হইয়াছে। কিন্তু যখন বাবু জিজ্ঞাসিলেন "কেমন রামসিং থার্ড কেলাসের চাইতে এ গাড়ী ভাল নয়?" রামসিং আহ্লাদ ভাণ করিয়া কহিল "হুজুর বহুত ভাল।"

বাবু। এখন কি আর থার্ড কেলাসে যেতে ইচ্ছা কোরছে?"

রাম। না হুজুর।

বস্তুত রামসিংয়ের মন এরূপ হইয়াছে যে থার্ড কেলাসে যাইতে পারিলেই বাঁচে। এখানে একে বাবু স্বয়ং উপস্থিত, তদ্ভিন্ন আর আর যাহারা আছে তাহারাও হয় তাঁহার বাবুর মতন নতুবা তাঁহা অপেক্ষাও বড় বড়। যে কেহ গাড়ীতে চড়ে সেই রামসিংয়ের পানে কটমট করিয়া তাকায়। রামসিং লাজে ভয়ে জড়সড় হইয়া বেঞ্চের অগ্রভাগে বসিয়া আছে। লালবিহারী বাবু ঘাড় লম্বা করিয়া এক একবার রামসিংয়ের সহিত কথা কহিতে যান, অমনি আবার ঘাড় গুটাইয়া লন। শ্বশুর বাটী হইতে বাহির হইবার সময় মনে করিয়াছিলেন রেলওয়ে ষ্টেসনে পৌঁছিবার অগ্রেই তাঁহার বক্তব্য বলিবেন। কিন্তু বলিবার চেষ্টা করিয়াও বলিতে পারেন নাই। পরে রেল গাড়ীতে প্রবেশ করিয়াই বলিবেন স্থির করিয়াছিলেন। তাহাও ঘটে নাই কারণ গাড়ীতে অনেক লোক জুটিল। তখন স্থির করিলেন গাড়ীর লোক কমিয়া গেলে যখন কেবল তিনি আর রামসিং

থাকিবেন তখনি বলিবেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! সেকেন কেলাসের গাড়ীতে কতবার লালবিহারী বাবু একাকী গমন করিয়াছেন, কলিকাতা হইতে তাঁহার কার্য্যস্থান পর্য্যন্ত কাহার সহিত দেখা হয় নাই। আজ যেন লোকে তাঁহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধনের ব্যাঘাত করিবার জন্যেই সেকেন কেলাসের গাড়ীতে আসিয়া চড়িতেছে! পরিশেষে লালবিহারী বাবুর আশা পূর্ণ হইল। তাঁহার ঠিকানার এক ষ্টেসন পূর্ব্বে সকলেই নামিয়া গেল। এতক্ষণ লালবিহারী বাবু যে বিজনতা চাহিতেছিলেন তাহা পাইলেন। দেখিলেন গাড়ীতে আর কেহ উঠিল না, ঘণ্টা বাজিল, গাড়ী ছাড়িল। কিন্তু গাড়ী ছাড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই লালবিহারী বাবুর বুক ধক ধক করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনের কথা বলিতে চেষ্টা করিলেন, বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পাখিরা উড়িবার পূর্ব্বেই যেমন গলা বাড়াইয়া দেয় তেমনি বাবু নড়িলে চড়িলেই রামসিং গ্রীবাদেশ লম্বা করিয়া বাবুর মুখের নিকট নিজ মুখ আনয়ন করে। ওরূপ করা দূরে থাকুক, রাম সিংয়ের মতন কেহ পূর্ব্বে লালবিহারী বাবুর সম্মুখে বসিলে তাহাকে অপমান করিয়া তুলিয়া দিতেন। অদ্য সেই রামসিংকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া আনিতেছেন। ইহাতেই লালবিহারী বাবুর মৃত্যুবৎ কষ্ট হইতেছে। ইহার উপর গোপনীয় কথা কহিতে হইলে যে আরও লজ্জা হইবে তাহার আর বিচিত্র কি?

বস্তুত চক্ষুলজ্জা ও লোকলজ্জার ন্যায় ভয়ঙ্কর পদার্থ আর নাই। অন্ধকারে অনেক কথা বলা যায়, কিন্তু দিবসে সে সব

কথা মুখে আনা যায় না। 'রামের সহিত দেখা হইলে আজ বিলক্ষণ দুকথা শুনাবো' প্রতিজ্ঞা করিয়া রাখ কিন্তু রাম সম্মুখে আসিলে তাহার চক্ষের রশ্মিতে তোমার প্রতিজ্ঞা বরফ গলিয়া যাইবে। আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে বলিয়া কত লোক প্রতিশ্রুত হইয়া আইসে, কিন্তু বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া যাহার বিপক্ষে মিথ্যা কথা কহিবে স্থির করিয়া আসিয়াছে তাহাকে দেখিলে সে মিথ্যা আর কহিতে পারে না। পাদরীরা ও ব্রহ্মজ্ঞানীরা যতই মনে মনে কল্পনা করিয়া আসুন, উপাসনা করিবার সময় চক্ষু আপনি বুঁজিয়া আইসে। লোকলজ্জা ইহা অপেক্ষাও ভয়ানক। ঈশ্বরের ভয়ে কজন লোক পাপ কর্ম্মে বিরত থাকে? যাহারা পাপ করে তাহারা কাহাকে ডরায়? ঈশ্বর তো সর্ব্বস্থানেই দেখেন, সর্ব্বক্ষণই দেখেন। হাটে বসিয়া যে যাহা করে তাহাও দেখেন, আলোকে ও দেখেন, অন্ধকারেও দেখেন। তবে পাপী লুকাইয়া পাপ করে কাহার ভয়ে? সে কেবল আমার ও চাহিয়া-পড়িতে-ইচ্ছুক-কিন্তু-অর্থব্যয়-করিয়া-কিনিয়া-পড়িতে-অনিচ্ছুক পাঠক! আপনারই। আপনাকে আমাকে লোকে যত ভয় করে নিয়ত নৃত্যগীতানুরক্ত ঈশা, মূশা, চৈতন্য, শাক্য, মহম্মদ ইত্যাদি পরিবেষ্টিত যে হরি, তাঁহাকেও তত ভয় করে না।

গাড়ী ক্রমে লালবিহারী বাবুর ষ্টেসনে পৌঁছিবার উপক্রম করিল। বেগ কম পড়িল। দূরে ষ্টেসন ঘর দেখা যাইতে লাগিল। এখন না বলিলে আর বলা হইবে না। তখন লাল-বিহারী বাবু কহিলেন "রামসিং শুনো।" রামসিং লম্বগ্রীব হইয়া

কর্ণ বাড়াইয়া দিলে লালবিহারী বাবু কহিলেন "দেথ রামসিং কলিকাতার কথা কারুকে বলো না। তোমার যাতে ভাল হয় আমি তাই কোরবো। কিন্তু গড়ের মাঠের কথা কোন ক্রমেই যেন কেউ শুন্তে পায় না।"

রাম। হুজুর ও কথা আমাকে বল্‌তে হবে না। আমার জান থাকতে গড়ের মাঠের কথা কেউ টের পাবে না। আপনি আমার মনিব, আমি আপনার গোলাম, আপনি মর্‌তে বল্লে আমি এথনি মর্‌তে পারি, একটা কথা গোপন করে রাথা তো সামান্য। আমি এমন জিব রাথি না যে—

গাড়ি আসিয়া ষ্টেসনে পৌঁছিল দেথিয়া লালবিহারী বাবু রামসিংকে কহিলেন "বস্ বস্ আর বোলতে হবে না কিন্তু মনে থাকে যেন, এই চাই।"

রাম সিং। হুজুর যে হুকুম করবেন তা আর মনে থাকবে না ?

লালবিহারী বাবু গাড়ী হইতে নামিয়া ষ্টেসন মাষ্টারের সহিত সেক হ্যাণ্ড করিলেন। এটা কলিকাতায় যাইবার সময় ষ্টেসন মাষ্টার যে খাতির করিয়াছিলেন তাহারই পুরস্কার; নতুবা লালবিহারী বাবু পোষ্ট মাষ্টার, ষ্টেসন মাষ্টার ইত্যাদি কর্ম্মচারিগণকে গ্রাহ্য করেন না।

অদ্য লালবিহারী বাবুর ফিরিয়া আসিবার কথা নহে। সুতরাং বাটী হইতে গাড়ী আইসে নাই। এজন্য একখানি ঠিকা গাড়ী ভাড়া করিয়া বাটী গমন করিলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কথন বাধা ফেলিয়া কোন স্থানে যাইবেন না।

নবম পরিচ্ছেদ।

নানাবিধ।

একদা গ্রীষ্মের অপরাহ্নে দিগম্বরী, রাধামণি, রাইকিশোরী, রেবতী, শঙ্করী ইত্যাদি বিধবা গিন্নিরা মনোরমার বাটীতে সমাগত হইয়া প্রাঙ্গনে পিঁড়ির উপর উপবিষ্ট হইয়াছেন। আজ একাদশী অর্থাৎ বিধবাদিগের রবিবার। সাংসারিক কাজ কর্ম্ম আজ তাঁহাদিগকে করিতে হইবে না। বয়ঃক্রমে ইহাঁদিগের কেহই চল্লিশ বৎসরের কম নহেন, সুতরাং ইহাদিগের লজ্জাও অধিক। নাভি পর্য্যন্ত অবগুণ্ঠনে আবৃত হইয়া ফিস ফিস করিয়া কথা কহিতে কহিতে রাস্তার এক ধার দিয়া চলিয়া আসিয়াছেন, মনোরমার প্রাঙ্গনে আসিয়া মুখ অনাবৃত করিয়া বাঁচিলেন। দিগম্বরী কুটীরের দ্বারে গিয়া কহিলেন "কৈ গো বাড়ী আছ কি?" মনোরমা কুটীরের মধ্য হইতে উত্তর করিলেন "কে গো ঠাকরুণদিদি নাকি?"

দিগম্বরী। হাঁ দিদি কত দিন আসিনি, তাই আজ ভাবলাম একবার দেখে আসি। আমি একলা নৈ। কিশোরী দিদি, রাধু ও আর আর সকলে আছেন।

মনোরমা এই সমস্ত নাম শ্রবণ মাত্র বাহিরে আসিয়া সকলকে প্রণাম করিয়া বসিতে আসন দিলেন। কহিলেন "যদি গরিবের বাড়ীতে পায়ের ধূলো পড়্লো তবে একাদশীর দিনে কেন? একটী সুপুরি খেতে দেবো তারও যো নেই। আমার এমনই কপাল বটে।"

দিগম্বরী। বেঁচে থাক দিদি। তোমার মিষ্টি কথাই ঢের। খাওয়া আর কোন ছার জিনিস। যে কদিন এ পৃথিবীতে থাকবো সে কদিন খেতেই হবে, কিন্তু ইচ্ছে হয় না, যে পোড়া মহাপ্রাণীকে আর কিছু দি। মনিষ্যি জন্মের সুখ যা তাতো এ জন্মে হলোও না, হবেও না।

রাই কিশোরী। সে কথা মনে করে আর কষ্ট পাও কেন? অদেষ্টের লেখন কে খণ্ডাবে? আজ সমস্ত দিন একাদশী করে আছি এতেও নিষ্কৃতি নেই। এখনো এক সংসারের কাজ পড়ে আছে। বাড়ী গিয়ে এ সমস্ত কোরবো তবে বাড়ীর লোকে অন্ন পাবে। এতদূর বলিয়া মনোরমার কুটীরের মধ্যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া গোটা দুই ডাব নারিকেল দেখিয়া রাই কিশোরী জিজ্ঞাসিলেন "দিদি তোমার তক্তপোষের নিচে ও কি দেখা যাচ্ছে?"

মনোরমা কহিলেন "কিশোরী দিদি ও দুটো ডাব।"

রাই কিশোরী। আ হা! আমার পেঁচো একটা ডাব ডাব করে আমাকে খুন কল্লে। কাকে বোলবো কে এনে দেবে? ছোটঠাকুর পো তার নিজের ছেলে পিলে নিয়েই ব্যস্ত। এত জিনিস আনে, সকলই নিজের ছেলে পিলে দিয়েই খাওয়ায়।

আমার বাছার হাতে যদি স্বপ্নেও কিছু দেয়। বাছা আমার কেঁদে কেঁদে বেড়ায় তবু একবার ফিরে চায় না। ডাব ডাব করে কাঁদছে তা আমি বল্লাম যা তোর মনু মাসীর বাড়ী থেকে খেয়ে আয়। তা আবার এমন লজ্জা যে কারও কাছে কিছু চেয়ে খেতে পারেন না। এত যে ভাল মন্দ জিনিস আসে তা একবার বা সেদিকে চেয়ে দেখে?

মনোরমা এই কথা শুনিয়া কুটীরের মধ্য হইতে একটী ডাব আনিয়া দিয়া কহিলেন "এইটা পেঁচোকে দিও।"

রাইকিশোরী। দিদি তুমি চিরজীবী হয়ে থাক। আমার মাথায় যত চুল এত প্রমাই তোমার হোক্।

মনোরমা। আর ও আশীর্ব্বাদ করো না। বাঁচবার আর সাধ নাই। এখন মলেই বাঁচি।

দিগম্বরী। মরণের কথা শুনে মনে হলো, ও পাড়ার সরলা বুঝি এবার রক্ষা পায় না।

মনোরমা। সে কি? তার কি হয়েছে?

দিগম্বরী। কি হয়েছে তা জানি নে। আমি সে বাড়ী আর থাকিও না যাইও না।

শঙ্করী দিগম্বরীর দিকে তাকাইয়া কহিলেন "শাশুড়ী ননদ বউ ঝি নিয়ে এতকাল ঘরকন্না কোর্‌লাম কখন কারুর সঙ্গে একটা উঁচু কথা হয়নি। কিন্তু প্রমদা আর সরলা এদের দু জায়ের যে কি অশুভক্ষণে দেখা যে একটা দিনও বিনি ঝগড়ায় কাটাতে পাল্লে না।"

দিগম্বরী। ঘরকন্না করেছ বেশ করেছ, তা আমার দিকে

তাকিয়ে তাকিয়ে বোলছো কেন? আমি কি কারুকে ঝগড়া কোর্‌তে বলি? ও সব মুখ চেয়ে চোক তাকিয়ে কথা আমার ভাল লাগে না, আমি কারুর দাসী বাঁদিও নই, কারুর তাঁবে-দারও নই।

গ্রামে যত কলহ বিবাদ হয় দিগম্বরী তাহার কোন না কোন পক্ষে নিয়তই থাকেন। শঙ্করী যে সেই জন্যই প্রমদা ও সরলার বিবাদের কথা দিগম্বরীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিয়াছিলেন তাহা বলিতে পারি না। পাঁচ জনে এক যায়গায় বসিয়া থাকিলে কথা কহিবার সময় কাহারও না কাহারও মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিতে হয়। শঙ্করী হয় তো দিগম্বরীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছিলেন। সুতরাং কথা কহিবার সময় তাঁহাকেই নিরীক্ষণ করিয়া বলিয়াছিলেন। যাহাই হউক দিগম্বরী কিন্তু কথাটী শুনিয়া রাগত হইয়া উঠিলেন শঙ্করীও ছড়িবার পাত্রী নন। তিনিও রাগ করিয়া কহিলেন "তোমার মুখ পানে তাকিয়ে কথা কয়েছি তাতেই কি এত দোষ হলো? তুমি কারুর দাসীও নও বাঁদীও নও তা জানি। যার পাঁচটা আছে, কি যার বাড়ী পাঁচ জন যায় তার দাসীগিরিও কর্ত্তে হয় বাঁদীগিরিও কর্ত্তে হয়।" পরে মনোরমার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া "কি বল মা, এ উচিত কথা বলিচি কিনা? আর যে আঁটকুড়, যার ছেলে নেই, পিলে নেই, বউ নেই, ঝি নেই, সে কেন লোকের দাসী বাঁদী হতে যাবে।"

পাঠকবর্গকে বলিয়া দেওয়া উচিত যে দিগম্বরী বাল্যকালে বিধবা হওয়ায় তাঁর সন্তানাদি কিছুই হয় নাই। শঙ্করীরও

দশটী পুত্রের একটীও জীবিত নাই, কিন্তু পৌত্র পৌত্রীর সংখ্যা করা সুকঠিন।

দিগম্বরী শঙ্করীর কথায় রাগত হইয়া কহিলেন "যাদের ছেলে পিলে হয়নি, তাদের তো হয়ই নি, তাতে আর তাদের দোষ কি? কিন্তু যে ডাইনীরে যে রাক্ষসীরা নিজের ছেলে পিলের শ্রাদ্ধের ভোজ খায় তারা বড় পুণ্যবতী, তাদের পুণ্যিতেই পৃথিবী টিঁকে আছে।"

শঙ্করী। মর সর্ব্বনাসী, লক্ষীছাড়ী তুই আমাকে ডা'ন বল্লি?

দিগম্বরী। তুই সর্ব্বনাসী লক্ষীছাড়ী আমাকে আঁটকুড় বল্লি কেন?

শঙ্করী। বোলেছি খুব করেছি, আরও একশ বার বোল্‌বো।

দিগম্বরী। আমিও বোলেছি খুব করেছি, আরও একশ বার বোল্‌বো।

এই কথোপকথনের পর উভয়ের হাতাহাতি হইবার উপক্রম দেখিয়া আর সকলে মধ্যবর্ত্তী হইয়া উভয়কেই ছাড়াইয়া দিল। পরে উভয়েই উভয়কে গালি দিতে দিতে ভিন্ন ভিন্ন রাস্তায় চলিয়া গেল। স্ত্রীলোকের বিবাদ প্রায় ছেলে পিলের পিঠেই শেষ হইয়া থাকে। পরস্পর যতক্ষণ পারে ঝগ্‌ড়া করিয়া পরিশেষে নিজ নিজ সন্তানের পৃষ্ঠে এক এক চপেটাঘাত করিয়া চুপ করিয়া থাকে। কিন্তু অদ্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাহাদের সন্তানাদি কাহারও না হওয়ায় অথবা রঙ্গভূমীতে উপস্থিত না থাকায়

প্রাগোক্ত কৌলিক প্রথানুসারে এ বিবাদের নিষ্পত্তি হইতে পারিল না।

দিগম্বরী ও শঙ্করী তথা হইতে প্রস্থান করিলে রাইকিশোরী কহিলেন "বাপ্‌রে বাঁচলাম। আর এখানে বসে থেকে কাজ নেই। মনু, চল দেখি একবার তাঁতিদের বাড়ী যাই।"

মনোরমা কহিলেন "না দিদি, আমার কায কর্ম্ম সব পড়ে রয়েছে, দেবতা মেঘ করে এল, খড় কুটো গুলো বাইরে আছে ঘরে তুল্‌তে হবে, আমি আজ যেতে পারবো না, তোমরা যাও।"

রাইকিশোরী এই কথা শুনিয়া দ্বিতীয়বার আর অনুরোধ না করিয়া অন্যান্য যাহারা ছিল তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "চল তোমরা যাবে?" কিন্তু দিগম্বরী ও শঙ্করীর বিবাদ দেখিয়া সকলেরই মনে কোন না কোন অসুখ হওয়ায় সকলেই যে যাহার বাটী চলিয়া গেল। তখন রাইকিশোরী কহিলেন "আচ্ছা যাও তোমরা, আমি একবার নকড়ীর মার সঙ্গে দেখা না কোরে যাচ্চি নে।" এই বলিয়া তিনি নকড়ীর মাতার বাটী গমন করিলেন। প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "ও নকড়ীর মা, নকড়ী কোথায়?"

নকড়ীর মাতা মুখ বাঁকাইয়া রাগত স্বরে কহিল "কি জানি কোথায় গিয়েছে।"

রাইকিশোরী যে সময় নকড়ীর বাটী উপনীত হইলেন তখন মঙ্গলা গাভী দোহন করিতেছিল এবং নকড়ীর মাতা বাছুর ধরিয়া বসিয়াছিল। রাইকিশোরী বাটী হইতে বাহির হইয়া কখনও রিক্ত হস্তে পুনরায় বাটীতে ফিরিয়া আইসেন না। এজন্য

রাইকিশোরী—সংক্ষেপে কিশোরী দিদিকে—সকলেই ডরাইত। রাস্তা দিয়া কিশোরী দিদিকে যাইতে দেখিলে কেহ ডাকিয়া কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিত না। কিশোরী দিদি বাটী আসিলেও কেহ সমাদরে বসিতে বলিত না। পাঠকবর্গের ইত্যগ্রেই জানা আছে নকড়ীর মাতার মুখে মিষ্ট কথা অতি বিরল। অতএব নকড়ীর মাতা যে অধিকতর অনাদর করিবে তাহার আর বিচিত্র কি? লোকে যে কিশোরী দিদিকে বিশেষ যত্ন করে না একথা কিশোরী দিদিও অবগত ছিলেন। কিন্তু প্রাজ্ঞলোকের ন্যায় কিশোরী দিদি তাহা কখনও মনে করিতেন না। বরঞ্চ স্বকার্য্য সাধনার্থ এরূপ তোষামদ করিতেন যে লোকে ইচ্ছা না থাকা সত্বেও কেবল চক্ষুলজ্জার খাতিরে কিশোরী দিদি যাহা চাহিতেন তাহা দিত।

কিশোরী দিদি কহিলেন "আহা নকড়ী বাড়ী নেই? বড় আশা করে এসেছিলাম যে নকড়ীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। এমন ছেলে তো কখনও দেখি নি? নকড়ীর মা, আমার [illegible] নকড়ীকে দাদা বলে ডাকে তা জান? নকড়ীর তাতে কত আহ্লাদ। বাছার আমার মুখে আর হাসি ধরে না" এই কথা বলিয়া কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নকড়ীর মা কি কোরছো? বাছুর ধরেছ? গাই দুচ্চে কে? মঙ্গল বুঝি? ও মঙ্গল! কথা কোস্ নে যে? আহা পেঁচো আমার একটু দুদ দুদ কোরে আমারে পাগল কোল্লে। কোথায় পাব? এমন সংগতি নেই যে কিনে দি। বল্লাম যা তোর নকড়ী দাদার বাড়ী থেকে একটু দুদ নিয়ে আয়। কিন্তু বাছার আমার এমনি

লজ্জা যে চেয়ে খেতে পারেন না। ছোটঠাকুর পো এত জিনিস আনে। সব আপনার ছেলে পিলেকে দিয়ে খাওয়ায়। বাছা আমার কেঁদে কেঁদে বেড়ায় তবু বা একটু দেয়।"

এই কথা শুনিয়া মঙ্গল অর্দ্ধস্ফুটস্বরে কহিল "ঐ শোনো আই আপন বুলী ধরেছে।" নকড়ীর মাতা নিজের পা মঙ্গলের পায়ের উপর লইয়া গিয়া একটু টিপ দিল অর্থাৎ চুপ করিয়া থাকিতে কহিল। রাই কিশোরী কহিতে লাগিলেন "ও নকড়ীর মা বউ কোথায়? ভাল কথা মনে হয়েছে। বউ নাকি পোয়াতি? আমি দৌড়াদৌড়ি করে সেই কথা শুন্‌তে এলাম্। নকড়ীর মা সত্য কি? বউ কি পোয়াতি হয়েছে?" নকড়ীর মাতার সহস্র অনিচ্ছা সত্বেও এবার কথা কহিতে হইল। কিছুতেই নকড়ীর মাতা হাসিত না, কিছুতেই আহ্লাদ প্রকাশ করিত না, কিন্তু পৌত্র হইবে এ কথা শুনিলে নকড়ীর মাতার স্বভাব পরিবর্ত্তন হইয়া যাইত, মুখে আর হাসি ধরিত না। রাই-কিশোরীর কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিল "কে জানে দিদি? লোকে তো বলে।"

রাইকিশোরী। ভাল ভাল একটী পুত্র সন্তান হোক। বোউ কোথায়?

নকড়ীর মাতা। ঘাটে জল আন্তে গিয়েছে।

এই কথার পর গাভী দোহন সমাপ্ত হইলে নকড়ীর মাতা আগে ও মঙ্গল পাত্র হস্তে পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া যে স্থানে রাইকিশোরী দাঁড়াইয়া ছিলেন সেই থানে দাঁড়াইল। কিশোরী দিদি কহিলেন "দেখি কত টুকু দুদ হলো। মঙ্গল পাত্র

দেখাইল। অর্দ্ধ সেরের অধিক দুদ হয় নাই। তখন রাই-কিশোরী কহিলেন "নকড়ীর মা এ দুদ টুকু কেন আজ আমার পেঁচোকে দেও না? কাল আমি পাত্র সকালে পাঠিয়ে দেব কি নিজেই নিয়ে আস্‌বো?"

নকড়ীর মাতা কহিল "নকড়ীর হাঁপের ব্যাম হয়েছে, সে রাত্রে আর কিছুই খায় না, কেবল একটু দুদ খেয়ে বাঁচে। এটুকু তোমাকে দিলে তাকে কি দেব?"

নকড়ীর মাতা যে এরূপ আপত্তি উত্থাপন করিবে এ যেন রাইকিশোরী পূর্ব্বেই জানিতেন। না ভাবিয়া চিন্তিয়া অবিলম্বে উত্তর করিলেন "আজ নকড়ীকে একটু ফ্যান খাওয়ায়ে রেখ।"

কিশোরী দিদির কথা শেষ হইতে না হইতেই নকড়ীর মাতা তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কহিল "বেরো তুই আমার বাড়ী থেকে। ফের যদি এ মুখো হবি তো তাঁতের খেটের বাড়ী দিয়ে তোর ঠ্যাং ভেঙ্গে দেব। বামন বোলে মানবো না। বস্তুত রাইকিশোরীকে ব্রাহ্মণের কন্যা বলিয়া কেহ কিছু বলিত না। কিন্তু অদ্য দেখিলেন যে সে বলও খাটিল না। তখন আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া কিশোরী দিদি তথা হইতে প্রস্থান করিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ।

শক্রকে ভক্ত।

অন্যান্য কথায় ব্যাপৃত থাকায় নলিনের কথা আমরা প্রায় ভুলিয়া যাইবার উপক্রম করিয়াছি। ফলত নলিন সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্যই অধিক নাই। পাচকের কার্য্য রন্ধনশালায়। সে স্থানে উপন্যাসের উপযোগী কোন ব্যাপারই ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। নলিন তাহাতে আবার একটু লাজুক। সুতরাং সে কাহারও কথার মধ্যে থাকে না। সকলের আহার হইয়া গেলে নিজে আহার করিয়া হয় এক খানি পুস্তক লইয়া বসে নতুবা নিকটবর্ত্তী ডাক্তারখানায় যায়। ডাক্তারখানার কম্পাউণ্ডার বাঙ্গালা খবরের কাগজ লয় এবং কাগজখানি আসিলে নিজে পড়িয়া নলিনকে পড়িতে দেয়। নলিন যে স্থান না বুঝিতে পারে কম্পাউণ্ডার তাহা বুঝাইয়া দেয়। কম্পাউণ্ডারের নাম রামহরি। রামহরি ক্ষুদ্র বেতনের কার্য্য করিয়াও মিতব্যয়িতা গুণে ও নিজে চিকিৎসা করিয়া একটু সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারখানায় কম্পাউণ্ডার বটে কিন্তু তাহার নিজের পাড়ায় রামহরি "ডাক্তার বাবু।"

রামহরি কাগজ পড়িতে পড়িতে যে সব কথা কহে তাহা শুনিয়া মাঝে মাঝে নলিনের শরীর শিহরিয়া উঠে। রামহরি কখন লাট সাহেবকে বোকা বলে, কখন স্বার্থপর বলে, কখন বা মিথ্যাবাদী বলে। নলিন শুনিয়া অবাক হইয়া থাকে। সাহস করিয়া তাহার প্রতিবাদ করা দূরে থাকুক, লাট সাহেব কেন বোকা, কি বোকামি করিয়াছেন, কোথায় কাহার নিকট মিথ্যা কথা কহিয়াছেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিতে পারেন না। রামহরি দুই এক দিবস এরূপ গরম হইয়া উঠে যে নলিনের বোধ হয় লাট সাহেব কাছে থাকিলে রামহরি বা দু এক ঘা তাঁহাকেই বসাইয়া দেয়। নলিন খবরের কাগজ পড়ে বটে কিন্তু যে স্থানে সমাচার থাকে সেই স্থানই পড়ে। কোথায় কাহার গরুর দুটা বাছুর হইল, বা দুটা মাথাওয়ালা একটা বাছুর হইল, কোথায় ঝড়ে কোন নৌকা মারা গেল, কোথায় গৃহ দাহ হইয়া কাহার সর্ব্বনাশ হইল এই সমস্তই সমাচার। নলিন এই সমস্তই আগ্রহ সহকারে পড়ে ও যত্ন পূর্ব্বক কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে। রামহরি যে যে স্থান পড়িয়া প্রত্যহ এত গরম হয়, নলিনের সে সব স্থান পড়িতে ভাল লাগে না। এক দিবস নলিন ভীত চিত্তে জিজ্ঞাসা করিল "রামহরি বাবু লাট সাহেব বোকা আপনি কেমন করে টের পেলেন? আর লাট সাহেব বোকা হলে এত বড় দেশ শাসন করে কেমন করে?"

রামহরি উত্তর করিল "লাট সাহেব বোকা না? আজকার কাগজে কি পড়লে?"

নলিন। কৈ আমি তো কিছু টের পেলাম না। আমাকে যায়গাটা দেখিয়ে দেও দেখি?

রামহরি একটী প্রবন্ধ দেখাইয়া দিলে নলিন পড়িতে লাগিল "এইবার লাট সাহেব ধরা পড়িয়াছেন। আমাদের সহযোগী "নেসানল পেপার" স্পষ্টাক্ষরে বলিতেছে রাজনৈতিক আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। লাট সাহেবের এ সমস্ত বিবেচনা করিয়া চলা উচিত ছিল।" এতদূর পড়িয়া নলিন জিজ্ঞাসা করিল "রামহরি বাবু আমি তো এর কিছুই বুঝ্‌তে পারলাম না। লিখেছে 'লাট সাহেব ধরা পড়িয়াছেন' কৈ কিসে ধরা পড়িয়াছেন ?'

রাম। অবশ্যই তিনি কোন না কোন মন্দ কাজ করেছেন তা নৈলে লিখ্‌বে কেন ?

নলিন। সে মন্দ কাজটা কি, তাই আমি জান্তে চাই।

রাম। তা তো "নেসানল পেপারে" আছে।

নলিন। তবে তুমি তা জান না।

রাম। কেন জান্‌বো না, একটা মন্দ কাজ না কোরলে ও কথা লিথবে কেন ? যদি কোন যায়গায় তুমি ধোঁয়া দেখ্‌তে পাও তবে তোমার কি বিবেচনা ক'রে লওয়া উচিত ? এই ভাবা উচিত যে ওর নীচে আগুণ আছে। যেখানে নেসানল পেপারে লিখেছে 'লাট সাহেব ধরা পড়েছেন' সেখানে এই প্রতিপন্ন হচ্ছে যে লাট সাহেব স্পষ্টাক্ষরে এমন কোন কাজ করেছেন যে জন্যে তাঁহাকে লর্ড সভা হতে বিলক্ষণ তিরস্কার খেতে হবে।

নলিন। আচ্ছা ওটা যাক। আমি কতক বুঝলাম কিন্তু তার পর তো আর কিছুই বুঝতে পারি না। আমাদিগের সহযোগী নেসানল কি ?

রাম। সহযোগী এই যাহারা একত্রে যোগ করে। এখানে এ কাগজও যা বোল্‌ছে নেসানলও তাই বোলছে কিনা? সুতরাং নেসানল এ কাগজের সহযোগী হলো।

নলিন। আচ্ছা নেসানল কি? নেসা আছেন আকার অনল আছেন অকার এই উভয়ে তো নেসানল হয়েছে? নেসার কথা এখানে কেন? নলিন দিন কতক টোলে অধ্যয়ন করিয়াছিল এজন্য বর্ণমালার উপর তাহার অচলা ভক্তি জন্মিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগের বিষয়ে সর্ব্বদাই সসম্ভ্রমে কথা কয়। বস্তুতঃ টোলে সংস্কৃত বর্ণমালার যত গৌরব এত গৌরব আর কোন দেশে কোন বর্ণমালার নাই।

নলিনের কথা শুনিয়া রামহরি ঢোক গিলিয়া কহিল "ওটা একটা কাগজের নাম। আমার বোধ হচ্ছে ওটা পারসিক শব্দ।"

রামহরির কথা শেষ না হইতে হইতেই পণ্ডিত মহাশয় টিফিনের ছুটী পাইয়া ডাক্তারখানায় আসিলেন। ইস্কুলের তামাকের আড্ডা ডাক্তারখানায়। এখানে শিক্ষকেরা নিজ নিজ শিথিল মস্তিষ্ক-ঘড়িতে গুড়ুকের দম দিয়া যান। আর বালকেরা ইস্কুলের জলের ঘরে বসিয়া দম দেয়।

পণ্ডিত মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ, দীর্ঘাকার, গোঁপ দাড়ি কামানো, পায়ে চটিজুতা। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয়ের এরূপ বর্ণনা না করিলেও চলিত। কারণ এতদ্দেশীয় ভাষা সমূহের সহিত চুল ও জুতার যে জাতক্রোধ আছে তাহা কাহারও অবিদিত নাই। কি গুরু পুরোহিত, কি টোলের বা ইস্কুলের পণ্ডিত কি ভৈষজ্য ব্যবসায়ী কবিরাজ কাহারও দাড়ী গোঁপ রাখিবার কি ভাল জুতা ব্যবহার

করিবার অধিকার নাই। সুতরাং পণ্ডিত মহাশয় কৃষ্ণবর্ণ দীর্ঘাকার বলিলেই চলিত।

পণ্ডিত মহাশয় আসিলে রামহরি একজন রোগীকে তামাক সাজিতে বলিয়া কহিল "আপনি এসেছেন বেস হয়েছে। নেসা-নল শব্দের অর্থ কি পণ্ডিত মহাশয় ?"

পণ্ডিত মহাশয় "নেসান ল, নেসানল" এইরূপ দুই চারি বার শব্দটী উচ্চারণ করিয়া কহিলেন "দেখি, স্থানটা দেখি; কোথায় কথাটা প্রয়োগ করেছে।"

রামহরি স্থান দেখাইল। পণ্ডিত মহাশয় দক্ষিণ হস্তে হুকা ধরিয়া বাম হস্তের দ্বারা মাথা চুলকাইয়া কহিলেন "আজ থাক্ কাল বোলবো।"

রামহরি কহিল "পণ্ডিত মহাশয় একবার প্রবন্ধটা পড়ে দেখুন। মহাশয় লাট সাহেবের মতন লোকে যদি এত অত্যা-চার করে তবে আমরা দাঁড়াই কোথা ? আমাদের দেশের লোক মূর্খ তাই সব শোভা পায়। যদি আয়র্লণ্ড হতো, কিম্বা কানেডা হতো তা হলে এর প্রতিফল হাতে পেতেন। আমাদের দুর-দৃষ্টক্রমে আবার আমাদের দেশের বড় লোক যাঁরা তাঁরা ধামা ধরা। যিনি লাট সভায় সভ্য আছেন তিনি কোথায় এ সমস্ত প্রতিবাদ কোরবেন, তা না করে যা সাহেবেরা বোলবে তিনি সেই কথায় সীয় দেন, একি বরদস্ত হয় ? আমি হলে উচিত কথা কৈতে কখন ডরাতাম না। তিনি লাট আছেন তাতে আমার ভয় কি ? আমি সে দিন যে প্রবন্ধটা লিখেছিলাম তা দেখেছিলেন তো ?"

পণ্ডিত মহাশয় নেসানল শব্দের অর্থ না বলিতে পারিয়া কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া বসিয়া আছেন। অধিক কথা কহিতে-ছেন না, কিন্তু স্বীকার করিলেন রামহরির প্রবন্ধ পড়িয়াছেন এবং কহিলেন "হাঁ, সেটা খুব সাহসের লেখা বটে।"

রামহরি। আমাদের সাহস হয়। রাজা উপাধি নেই যে কেড়ে নেবে, তালুক মুলুকও নেই যে খাস করে ফেলবে। আমরা যমকেও ডরাই না।

বস্তুতঃ রামহরির সাহস কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন। এই ধনের প্রভাবেই রামহরি কখন কাহার নিকট নম্রতা স্বীকার করিত না। কহিত "মনুষ্য মাত্রেই সমান। তোমাতে আমাতে তফাত কি? তুমি আজ জজ আছ, কাল চাকরি গেলে তুমিও যেমন, আমিও তেমনি। বরঞ্চ আমি ভাল। তুমি আর এক পয়সা রোজগার কোরতে পারবে না। আমি যা শিখেছি এতে আমি অন্ন করে খেতে পারবো।"

রামহরির কথা শেষ না হইতে হইতেই তাহাদিগের গ্রামের গমস্তা একজন পেয়াদা সমভিব্যাহারে উপস্থিত হইয়া কহিল "কৈ রামহরি, তুমি তো সে ব্যাড়াটা এখনও কেটে দাও নাই। উভয় পক্ষের মধ্যস্থ থেকে যে সীমানা স্থির কোরে দিয়েছে তা মান না কেন?"

গমস্তা রামহরিকে বাবু বলিয়া সম্বোধন করে নাই। ইহাতে রামহরি রাগত হইয়া কহিল "আমি মধ্যস্থের কথা মানি না। তুমি আদালতের হুকুম না দেখালে আমি ব্যাড়া ট্যাড়া কাটবো না।"

গমস্তা। কি আমার সঙ্গে তুমি আমি?

রামহরি। কেন তুমি কে? তুমি আমাকে তুমি বল্লে কেন? আমি তোমাকে তুমি বলেছি এতে যদি অপমান হয়ে থাকে, এখনই গিয়ে আমার নামে নালিস কর।

গমস্তা। বটে? পেয়াদা রামহরিকে ধরে কাছারি নিয়ে চল।

পেয়াদা ধরিতে গেলে রামহরি কহিল "আমি এখন সরকারি কাজে আছি, বুঝে পড়ে হুকুম দিও।"

গমস্তা। রেখে দে তোর সরকারি কাজ। ধর পেয়াদা।

পেয়াদা হস্ত ধরিলে রামহরি আর অন্য উপায় না পাইয়া কহিল, "আমার অন্যায় হয়েছে। আপনাকে আমি কখন 'তুমি আমি' বলি নাই। আজ হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরুয়ে গেল। আমাকে মাপ করুন। আর আমি আজিই বেড়া কেটে দেব।"

রামহরির বিনয় বাক্যে গমস্তা নরম হইয়া পেয়াদা লইয়া চলিয়া গেল। তখন পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন "রামহরি বাবু তুমি লাট সাহেবকে ডরাও না। সকলকেই উচিত কথা বল, গমস্তার নিকট অমন করে ঘা'ট মান্‌লে কেন?"

রামহরি বিরক্ত হইয়া কহিল "আমি ভয়ে ঘা'ট মানি নাই। এ সরকারি ঘর, বিশেষ ডাক্তার বাবু এখানে নাই, একটা হ্যাঙ্গাম হওয়া খারাপ। যদি আমার বাড়ীতে কিম্বা রাস্তায় হতো তবে কেমন গমস্তা আজ টের পেয়ে যেতেন।"

নলিন কহিল "লাট সাহেবের সভাও তো সরকারি ঘরে হয়, সেখানে তুমি কেমন করে উচিত কথা বোলবে?"

পণ্ডিত। ঠিক, এ কথার জবাব কি রামহরি বাবু?

রামহরি রাগত হইয়া কহিল "যান্ যান্, এখন এখানে তামাক খাবার আড্ডা নয়। যাও নলিন, তোমার এখানে আসবার অধিকার নেই?"

পণ্ডিত। এত রাগ কেন, আমার কাছে পেয়াদা নেই বলে বুঝি? শক্তকে সকলেই ডরায়।

রামহরি। আপনি যান, এই দণ্ডেই যান, নৈলে আমি ডাক্তার সাহেবের কাছে রিপোর্ট কোরবো। এই বলিয়া এক খানা কাগজ লইয়া লিখিতে বসিল।

পণ্ডিত মহাশয় কহিলেন "আর আপনার রিপোর্ট কোরতে হবে না আমি চল্লাম।" এই বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। নলিনও নিজ বাটী চলিয়া গেল।

একাদশ পরিচ্ছেদ।

উপায় উদ্ভাবনা।

ডেপুটী বাবু নিজের কার্য্য স্থানে পৌঁছিয়াছেন। পাঠকবর্গ মনে করিতে পারেন যে বাজী দেখিতে গিয়া যে দুর্ঘটনা হইয়াছিল তাহা স্মরণ হইলে আর তাঁহার অধিক কষ্ট হয় না। কিন্তু ফলতঃ তাহা নয়। কখন রামসিং কাহাকে সমুদয় বৃত্তান্ত বলিয়া দিবে এই ভয়ে তিনি সর্ব্বদাই ভীত থাকেন। যদি রামসিং অনুপস্থিত থাকে অমনি তাঁহার ভয় হয় সে কাহারও নিকট সেই কথা বলিতেছে। যদি রামসিং কাহার সহিত ফিস ফিস করিয়া কথা কয় ডেপুটী বাবু মনে করেন সে তাঁহারি কথা কহিতেছে। যদি রামসিং হাসে তবে তাঁহার গা কাঁপিয়া উঠে, ভাবেন এই-বারই সমস্ত প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে। অমনি রামসিংকে ডাকেন। রামসিং আসিয়া উপস্থিত হইলে কোন না কোন একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন কিম্বা কোন না কোন একটা সামান্য কার্য্য করিতে বলেন। ডেপুটী বাবুর মনোগত ভাব যে রামসিংকে

অন্যান্য ভৃত্যবর্গের সহিত বসিতে বা তাহাদিগের সহিত কথা কহিতে দিবেন না। সুতরাং যাই রামসিং একটা কার্য্য করিয়া কিম্বা একটা কথার জবাব দিয়া পুনরায় অন্যান্য ভৃত্যবর্গের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে অমনি তাহাকে ডাকিয়া আর একটা কার্য্য করিতে বলেন কিম্বা আর একটা কথা জিজ্ঞাসা করেন। রবিবারের দিবস দুই প্রহরের সময় ডেপুটী বাবুর বিশেষ ভয় হয়, কারণ সে দিবস সরকারি কায কর্ম্ম না থাকায় রামসিং গল্প করিবার অধিক অবকাশ পায়। এই বিপদ পরিহারের জন্য প্রতি রবিবারে আহারাদির পর বাবু রামসিংকে ডাকিয়া তাহার দেশের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করেন। রামসিং বর্ণনা করে, ডেপুটী বাবু শ্রবণ করেন। মধ্যে বাবু জন্মেজয়ের ন্যায় প্রশ্ন করেন, রামসিং শুকদেবের ন্যায় উত্তর করে। এইরূপে কখন কখন তিন চার ঘণ্টা কাটিয়া যায়। অর্থাৎ যতক্ষণ চাকর বাকরেরা নিদ্রার পর বৈকালিক কার্য্যে না প্রবৃত্ত হয় ততক্ষণ আর রামসিংহের নিষ্কৃতি নাই। কখন কখন রবিবারের দিন দুই প্রহরের সময় মুনসেফ ও ছোট আদালতের জজ আসিয়া ডেপুটী বাবুর বাড়ী তাস পাসা খেলিবার জন্য আইসেন। সে দিবস বাবু আর রামসিংকে লইয়া বসিতে পারেন না। আগন্তুক-দিগের সহিত ক্রীড়া বা গল্প করিতে হয়। কিন্তু বাবুর কর্ণ ভৃত্যেরা যে গৃহে থাকে সেই গৃহের প্রতি আকৃষ্ট থাকে। যখন একটু হাসি বা উচ্চ কথা শুনিতে পান অমনি রামসিংকে ডাকেন। ডাকিয়া কখন পান, কখন তামাক কখনও বা জল দিতে বলেন।

বাবু মনে করেন যে রামসিংহের সহিত কথোপকথন করায় ও তাহাকে সর্ব্বদা কায কর্ম্ম করিতে বলায় রামসিংকে বিশেষ বাধিত করা হইতেছে। রামসিংহের নিজের বিবেচনায় তাহার জীবন-ভার বহন করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। অন্যান্য চাকর-বর্গের শাকে বালি ঘুচিয়া দুগ্ধে চিনী হইয়াছে। মনিব তফাতে থাকিয়া ভৃত্যবর্গকে স্নেহ করেন এই ভৃত্যবর্গের বাঞ্ছনীয়। মনিবের নিকট যতই কম যাইতে হয় ততই তাহাদিগের পক্ষে ভাল। লালবিহারী বাবু হয় এ কথা জানিতেন না অথবা জানিয়া আপনার বেলা বিস্মৃত হইয়াছেন।

এক দিন রবিবারে রামসিং আহার করিয়া শয়ন করিয়াছে। ক্ষণকাল পরে একটু নিদ্রা আসিয়াছে। অন্যান্য ভৃত্যেরা অস্পষ্ট-স্বরে কথোপকথন করিতেছে ও মৃদু মৃদু হাসিতেছে। বাবু সর্ব্বদাই সশঙ্কিত, ভাবিলেন বুঝি রামসিং তাঁহারই কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। অমনি রামসিং রামসিং বলিয়া ডাকিয়া উঠিলেন। রামসিং বিরক্ত হইয়া হুজুরে হাজির হইল। অন্য দিন পাছে বাবু টের পান বলিয়া রামসিং মনের ভাব যতদূর পারে গোপন করিয়া বাবুর সম্মুখে যায়। কিন্তু অদ্য সেরূপ না করিয়াই বাবুর নিকট উপস্থিত হইল। লালবিহারী বাবু মুখ দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে রামসিং বিরক্ত হইয়াছে। সুতরাং অন্য দিন অপেক্ষা অদ্য রামসিংকে অধিক আদর করিলেন। রামসিংহের তথাপি মুখ ভারি। ক্ষণকাল পরে বাবু জিজ্ঞাসিলেন "রামসিং, তুমি যে ৬ টাকা তলব পাও এতে তোমার চলে? রামসিং উত্তর করিল "আমরা গরিব মানুষ,

কোন রকমে একবেলা খেয়ে ঐ তলপেই চালাই।” বাবু যেন এতকাল কিছুই জানিতেন না। রামসিং একবেলা খায় শুনিয়া তাঁহার অত্যন্ত কষ্ট হইল। বলিলেন “আচ্ছা তুমি খুব ভাল করে কাজ কর, কাজ অবধি আমি নিজে থেকে তোমাকে আর দু টাকা দিব।”

রামসিং। হুজুর মা বাপ। আমি তো হুজুরেরি গোলাম। হুজুরের জন্য আমি জান দিতে পারি। কাজ কর্ম্ম তো কোর্‌বোই।

ডেপুটী বাবু। আচ্ছা একবার ভাল করে তামাক সাজ দেখি?

রামসিং হর্ষোৎফুল্ল মুখে যে আজ্ঞা বলিয়া তামাক সাজিয়া আনিল।

বাবু তামাক খাইতে খাইতে আর অনেক কথা বার্ত্তা কহিলেন। পরে যখন নাসিকা শব্দ দ্বারা জানিতে পারিলেন অন্যান্য ভৃত্যেরা নিদ্রিত হইয়াছে তখন রামসিংকে যাইবার হুকুম দিলেন।

বাজি পোড়ানর রাত্রের কথা গোপন রাখিবার জন্য লাল-বিহারী বাবুকে যে খালি রামসিংকে খোষামোদ করিয়া চলিতে হইত এরূপ নহে। অল্প বিস্তর বাটী কি কাছারির সকলকেই খোসামোদ করিতে হইত। বাবুর প্রিয় পাত্র হওয়ায় রামসিং সকলের উপর অত্যাচার করিতে ও নিজের প্রভুত্ব খাটাইতে আরম্ভ করিল। কাছারি গিয়া কোন কাজ কর্ম্ম করে না, কেবল সমস্ত দিবস নিদ্রা যায়। আমলারা তাহাকে কোন

সরকারি কাজ করিতে কহিলে অমনি বলে "আমার অসুখ হয়েছে।" এই বলিয়া শয়ন করে। বাবুকে একথা জানাইলে বাবু বলেন "বেচারার ব্যারাম হয়েছে, ওকে দিন কতক কাজ দিও না।" এ "দিন কতক" আর ফুরায় না। রামসিং প্রত্যহ কোন না কোন ছল করিয়া কার্য্যে ফাঁকি দেয়। সকল আমলারা বিরক্ত হইয়া রসিক বাবুর নিকট বলিল। রসিক বাবু রামসিংকে ডাকিয়া কতক গুলা চিটী ডাকঘরে দিয়া আসিতে বলিলেন। রামসিং কহিল "বাবু দোসরা কারুকে বলুন আমি পারবো না।"

রসিক। কেন পার্‌বে না ?

রামসিং। আমি পার্‌বো না বোল্‌সি, তার আর কি।

রসিক। বটে, আচ্ছা থাক। এই বলিয়া অমনি তৎক্ষণাৎ ডেপুটী বাবুর নিকট গিয়া রামসিংহের নামে অভিযোগ করিলেন। বাবু রামসিংকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। রামসিং কহিল "আমার অসুখ হয়েছে, তাই আমি চল্‌তে পারিনে।"

এই কথা শুনিয়া বাবু সকরুণ চক্ষে রসিকের দিকে তাকাইলেন। মনের ভাব বেচারার অসুখ হয়েছে তাই কাজ করে না। রসিক কহিলেন "সে কথা আমাকে বলে নাই কেন ?"

তখন বাবু রামসিংকে জিজ্ঞাসিলেন "কেন তুমি একথা বল নাই ?"

রামসিং। একথা তো সকলেই জানেন। যে অবধি হুজুরের সঙ্গে কল্‌কাতায় গিয়েছিলাম সেই অবধি রোজ রোজ মাথা ধরে।

রসিক বাবু কহিলেন “তবে ওর ছুটী নেওয়া উচিত।”

রামসিং। হুজুর বন্দা গরিব মানুষ, আধা তলবে ছুটী নিলে আমার বাল বাচ্ছা সকলি মারা যাবে।

তখন ডেপুটী বাবু রসিক বাবুর দিকে চাহিয়া কহিলেন “এখন কি কর্ত্তব্য ? ছুটী নিলে গরিব মারা যায়।”

রসিক বাবু দেখিলেন লোকে যাহা বলে তাহাই সত্য। রামসিং বাবুর বড় প্রিয় পাত্র হইয়াছে। তাহাকে আর কেহ কিছু বলিতে পারে না। রামসিং সকলের উপর প্রভুত্ব করে। তখন তিনি রাগতস্বরে কহিলেন “যাই হোক রামসিংকে শাসন না কোর্‌লে কাজ চল্‌বে না। আর সকলে তো অর্দ্ধেক বেতনে ছুটী নিচ্চে, তারাও তো ঐ বেতন পায়। রামসিং বরঞ্চ দু টাকা বেশী পায়।”

ডেপুটী বাবু যদিও স্পষ্ট রামসিংকে বারণ করিয়া দেন নাই তথাপি ভাবিয়াছিলেন যে ও দু টাকার কথা রামসিং কাহাকে বলিবে না। সুতরাং রসিক বাবুর কথা শুনিয়া একটু লজ্জিত হইয়া কহিলেন “ও দু টাকার তো আর অর্দ্ধেক পাবে না! ও আমার নিকট যে থাকবে সেই পাবে।”

রসিক। সে সব কথা এখন হচ্ছে না। হয় মহাশয় রামসিংকে শাসন করে দিন ও কাজ করে আর গোস্তাকি না করে নতুবা ওকে আর যা হয় তাই করুন।

ডেপুটী বাবু বিষম বিপদে পড়িলেন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন “আচ্ছা শেষ কাছারিতে এর হুকুম দেব।”

এই কথা শুনিয়া রসিক বাবু রাগত ভাবে নিজের কর্ম্মে

গেলেন। রামসিং হাসিতে হাসিতে গিয়া অশ্বথ তলায় শয়ন করিল।

কাছারি উঠিবার সময় ডেপুটী বাবু রামসিং ও রসিক বাবু উভয়কে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ রামসিং তোমার গোস্তাকি হইয়াছে। তোমার একটাকা জরিমানা হইল। রামসিং হুকুম শুনিয়া মুখ ভার করিল। রসিক বাবু অপেক্ষাকৃত সন্তুষ্ট হইলেন। পাছে রামসিং কিছু বলে এই ভয়ে ডেপুটী বাবু তৎক্ষণাৎ কাছারি ভঙ্গ করিলেন ও রামসিংকে কাছারির বাক্স লইয়া পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে কহিলেন। রসিক বাবু কহিলেন "একটু দেরি করুন, কতকগুলা জরুরী কাগজ আছে বাক্সতে দিতে হবে।" কিন্তু লালবিহারী বাবু এত ভীত হইয়াছেন পাছে ঐ ক্ষণকালের মধ্যে রামসিং কিছু প্রকাশ করিয়া ফেলে যে তৎক্ষণাৎ নিজের অসুখ হইয়াছে বলিয়া গাত্রোত্থান করিলেন। চলিয়া যাইবার সময় রসিক বাবুকে আর একটা চাপরাসি দ্বারা সে কাগজ গুলা পাঠাইয়া দিতে বলিলেন।

গোলমালের মধ্য হইতে একটু দূরে গিয়াই রামসিংকে বলিলেন "তুমি দুঃখ কোর না রামসিং, তোমার জরিমানার টাকাটা আমি দেব।" রামসিংকে সন্তুষ্ট রাখাই আজ কাল বাবুর উদ্দেশ্য।

রামসিং কহিল "হুজুর মা বাপ। টাকার জন্যে কিছু হচ্ছে না, কিন্তু সাঁরবিস বয়ে একটা বদনাম থেকে যাবে। এতে আমার আখেরে খারাপ হবে।"

ডেপুটী বাবু ততদূর ভাবিয়া দেখেন নাই। রামসিংহের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া চলিয়া গিয়া কহিলেন "আচ্ছা

তবে কাল তুমি রসিক বাবুর কাছে মাপ চাও, তাহলে আমি জরিমানা মকুফ করে দিব।”

রামসিং। হুজুর আমি আপনার নকর রসিক বাবুর নকর না, আপনি মা বাপ, আপনি যা বোলবেন আমি তাই করবো, কিন্তু রসিক বাবুর কাছে মাপ চাইতে পারবো না।

ডেপুটী বাবু। আমিই তো মাপ চাইতে বোলছি।

রামসিং। হুজুর তা হলে কি হয়। আমি আপনার মাপ চাইতে পারি, রসিক বাবুর পারি না।

রামসিংকে এতকাল খোসামোদ করায় যে লালবিহারী বাবুর কতদূর কষ্ট হইয়াছে তাহা লালবিহারী বাবুই জানেন। রামসিং যত আদর পাইতেছে ততই তাহার আবদার বাড়িতেছে, কিন্তু রামসিংহের শেষ কথা আর লালবিহারী বাবুর বরদস্ত হইল না। বিরক্ত হইয়া কহিলেন “আচ্ছা তুমি না পার আমিই মাপ চাইবো।”

রামসিং। হুজুর আপনি মা বাপ। আপনি একথা বন্দাকে বলেন কেন? বন্দার যদি কোন দোষ হয়ে থাকে তবে বন্দাকে দোসরা জেলায় তবদিল করে দেবার হুকুম হয়।

রামসিংহের কথায় লালবিহারী বাবুর রাগ বাড়িয়া উঠিল কহিলেন “তবদিল কি বরতরফ এক রকম হবে।” লোকে যখন অত্যন্ত বিপদে পড়ে তখন অত্যন্ত সাহসও হয়। লালবিহারী বাবু অত্যন্ত রাগত হইয়া ভাবিলেন প্রত্যহ এরূপ ছোট লোকের খোসামোদ না করিয়া সকলের নিকট এক দিনের জন্য অপদস্ত হওয়াও ভাল।

যখন ডেপুটী বাবু ও রামসিং উভয়ে বাসায় সমাগত হইলেন, উভয়েরই বিরস বদন দেখিয়া বাটীর লোকের মনে হইতে লাগিল আজ কাহার না জানি কি অনিষ্ট ঘটে। কিন্তু বাবু হস্ত পদাদি ধৌত করিয়া কিঞ্চিৎ আহারের পর পুনরায় প্রফুল্ল হইলেন। আকাশের মেঘ কাটিয়া গেল। মুখ-চন্দ্র আবার নিজ প্রভা ধারণ করিল। বাটীর লোক দেখিয়া হৃষ্টচিত্ত হইল। লালবিহারী বাবু আসন্ন বিপদ হইতে মুক্তি লাভের উপায় উদ্ভাবন করিয়াছেন। নিজ গৃহের ছাতে বসিয়া বসন্তের সমীরণ সেবন করিতে করিতে রামসিংকে তামাক আনিতে কহিলেন। রামসিং তামাক আনিলে বাবু কহিলেন "রামসিং এক কাজ কর। তুমি তিন মাসের জন্য বিদায় লও। সরকারি তলপ তিন টাকা পাবে, আর তিন টাকা আমি দিব। তা হলে তোমার আর লোকসান হলো না।"

রামসিং। হজুর যে দুটাকা দেন তাতো আর মিলবে না।

লালবিহারী বাবু পুনরায় মুখ বক্র করিলেন, কিন্তু কি করেন সে দুটাকা দিতেও স্বীকৃত হইলেন। রামসিং হাসিয়া "আপনি মা বাপ সব কোরতে পারেন" বলিয়া চলিয়া গেল। লালবিহারী বাবু রামসিংহের মুখে হাসি দেখিয়া পুনরায় আহ্লাদিত হইলেন। চিত্তের ভয় গেল এবং ঘুন্ ঘুন্ করিয়া "এই কি বসন্ত ঋতু ও প্রাণ সখি?" ধরিলেন।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ।

কণ্টকোদ্ধার।

পূর্ব্বাধ্যায়ে বিবৃত ঘটনাবলী যে দিবস হইয়া গেল তাহার পর দিবস লালবিহারী বাবু কাছারী গিয়া রসিক বাবুকে ডাকিলেন। কিন্তু লজ্জাক্রমে একেবারে রামসিংহের কথা না উপস্থিত করিয়া এ ও সে নানাবিধ কথা কহিলেন। রামসিংহের উপর লালবিহারী বাবুর যে পক্ষপাতিত্ব আছে তাহা কেহ জানিতে পারুক বা না পারুক কিন্তু লালবিহারী বাবুর চিত্তে সংস্কার জন্মিয়াছে যেন সকলেই তাহা অবগত আছে। কোন মন্দ কার্য্য করিলে কর্ত্তার মনে সর্ব্বদাই আশঙ্কা হয় যেন সকলেই তাহা জানিতে পারিয়াছে। এজন্য বাবুর সহিত সমুদায় কথা শেষ হইলে যখন রসিক বাবু আপনার স্থানে যাইবার জন্য দ্বার পর্য্যন্ত গমন করিয়াছেন তখন যেন হঠাৎ ডেপুটী বাবুর মনে রাম সিংহের কথা স্মরণ হইল। অমনি রসিক বাবুকে ডাকিলেন "রসিক বাবু আর একটা কথা শুনুন।" রসিক বাবু পুনরায় বাবুর মেজের নিকট অগ্রসর হইলে লালবিহারী বাবু কহিলেন "দেখুন

রামসিং যথার্থ ব্যামতে বড় কষ্ট পাচ্চে। কাল জরিমানা করায় বিস্তর কাঁদাকাঁটী করে জরিমানা মাপ চাচ্ছে আর অৰ্দ্ধেক বেতনে তিন মাসের ছুটী নিতে চাচ্চে। এতে আপনার কি মত?”

রসিক বাবু কহিলেন “আমার আর এতে মতামত কি? আপনি জরিমানা কোরেছেন, আপনি মাপও কোরতে পারেন। যা আপনার ভাল বোধ হয় তাই করুন। সরকারি কায চল্‌লেই হল।”

লালবিহারী বাবু কহিলেন “তবে এবার রামসিংকে মাপ করা যাক্।”

রসিক “যে আজ্ঞা” বলিয়া আপনার স্থানে গিয়া বসিলেন।

অতঃপর রামসিংকে ডাকিয়া লালবিহারী বাবু কহিলেন “তোমার বিদায় মঞ্জুর হইল। তুমি কবে যেতে চাও?”

রামসিং কহিল “হুজুর যে দিন অনুমতি করেন সেই দিনই যাব।”

লালবিহারী। তবে তুমি কালই যাও।

রামসিং “যে আজ্ঞা” বলিয়া দুই হাত তুলিয়া সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। লালবিহারী বাবু অন্যান্য কার্য্যে ব্যাপৃত হইলেন।

পরদিন প্রত্যূষে রামসিং চলিয়া গেল। এত দিন যেন বাবুর হৃদয়ে পাঁষাণ চাপা ছিল। রামসিংহের গমনে সে ভার দূরীভূত হইল। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যদি রামসিং পথে মারা যায়, অথবা যদি সে আর না ফিরিয়া আইসে তবে তিনি জন্মের মতন এক বিষম বিপদ হইতে উদ্ধার হইলেন।

কিন্তু অন্যান্য ভৃত্যবর্গের মনে রামসিংহের গমনে অত্যন্ত ভয়ের সঞ্চার হইল। এত কাল তাহাদিগকে কিছু করিতে হয় নাই বলিলে হয়, রামসিংহই সকল কার্য্য করিয়াছে এখন হইতে সেই সমস্ত কার্য্য তাহাদিগকে করিতে হইবে।

কিয়দ্দিবস এই ভাবে চলিয়া গেল। লালবিহারী বাবুর মনে পূর্ব্ববৎ ফুর্ত্তি হইল। যে হাকিমত্ত ভাব কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইয়াছিল তাহা আবার পূর্ব্বের কলেবরে পরিণত হইল। পুনরায় রাস্তায় বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন। এখন যে রামসিংহের কার্য্যে বাহাল হইয়াছে সে আর বাবুর নিকট যাইতে পারে না। চাকরদিগের হাসিবার বা গল্প করিবার আর জো রহিল না। উচ্চ কথাটী শুনিলেই অমনি গম্ভীর রবে তাড়া দেন। সংক্ষেপতঃ লালবিহারী বাবু সর্ব্ব বিষয়ে আবার পূর্ব্বের ন্যায় হইলেন। একমাত্র তফাৎ এই রহিল যে অদ্যাপি শ্বশুর বাটী যাইবার নাম করেন না। পূর্ব্বে এক দিবসের জন্য বন্ধ হইলেই কলিকাতায় যাইতেন, কখনও বা শনিবারেও যাইতেন, কিন্তু সরস্বতী পূজার পর দুই তিন দিবসেরও বন্ধ হইয়া গিয়াছে তথাপি কলিকাতায় যাইবার উল্লেখ করেন নাই।

রামসিং চলিয়া গেলে দিন কএক পরে তাঁহার পরিবার পাঠাইয়া দিবার জন্য কলিকাতায় চিটী লিখিলেন। তাঁহার শ্যালক উত্তর দিলেন যে তিনি অনবকাশ বশতঃ নিজে গিয়া ভগ্নীকে রাখিয়া আসিতে পারেন না। অতএব লালবিহারী বাবুকে নিজে আসিয়া লইয়া যাইতে কহিলেন অথবা লইয়া-যাইবার জন্য কোন আত্মীয়কে পাঠাইতে বলিলেন। লাল-

বিহারী বাবু অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া স্থির করিলেন নিজে তো কখনই যাইবেন না। তবে কাহাকে পাঠাইয়া দেন? বিস্তর বিবেচনা করিয়া নলিনকে গগনকে ও একজন দাসীকে পাঠাইয়া দিলেন।

নলিন ইতিপূর্ব্বে কখন কলিকাতায় যায় নাই। কলিকাতা দেখিতে তাহার যথেষ্ট ইচ্ছা সত্বেও এরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার লইতে অনিচ্ছুক হইল। কিন্তু বাবুর হুকুম, না গেলে নয়। আর গগন যাইতেছে ইহাতে আরও কিঞ্চিৎ সাহস হইল। অতএব আর ওজোর আপত্য না করিয়া পর দিন প্রাতে তিন-জনে কলিকাতায় রওনা হইয়া সেই দিবসেই বাবুর শ্বশুর বাটী উপস্থিত হইল।

কলিকাতায় নলিনের আশাতীত আদর হইল। নলিন মনে করিয়াছিল বাবুর বাটীতে যেরূপ সকলের আহারাদি হইয়া গেলে তাহাকে নিজে আহার করিতে হইত, এবং অন্যান্য ভৃত্যবর্গের সহিত যেরূপ কালযাপন করিতে হইত, বাবুর শ্বশুর বাটীতেও সেইরূপ করিতে হইবেক। কিন্তু তাহা দূরে থাকুক লালবিহারী বাবুর সহোদর নিজে গেলেও বোধ হয় নলিন যেরূপ আদর পাইয়াছিল তাহার অধিক পাইত না। লালবিহারী বাবুর শ্যালকের সহিত তাহার একত্র স্নান একত্র আহার ও এক স্থানে উপবেশন হইতে লাগিল। নলিন প্রথমত ঐরূপ করিতে অসম্মত হওয়ায় লালবিহারী বাবুর শ্যালক কহিলেন "তাহাতে ক্ষতি কি? তুমি ব্রাহ্মণ, ভদ্র সন্তান, কেন তুমি একত্র স্নানাহার কোরবে না? যাহার নিকট চাকরি কর তাহারি

সহিত একত্র স্নানাহার না কোরলে, তুমি তো আর আমার চাকর নও।”

গগনের সহিত নলিনের খুব সদ্ভাব ছিল একথা গ্রন্থারম্ভেই বলা হইয়াছে। উভয়েই এক জনের ভৃত্য, উভয়েই একত্র থাকে, বাটীর মধ্যে উভয়েরই একরূপ খাতির। কলিকাতায় আসিয়া হঠাৎ নলিনের অবস্থার পরিবর্ত্তন দেখিয়া গগনের মনে যারপরনাই ঈর্ষা উপস্থিত হইল। এখানে নলিন যেন মনিব হইয়া উঠিল আর গগন যে চাকর সেই চাকরই রহিল। লাল-বিহারী বাবুর শ্যালক আহারাদির পর কাছারি চলিয়া গেলে নলিন গগনের সহিত কথা কহিতে যায়, গগন কথা কহে না, অথবা দুই চারিবার কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে একবার অনিচ্ছাপূর্ব্বক উত্তর দেয়। নলিনের ইহাতে অত্যন্ত দুঃখ হইল। কি কারণে গগন যে এরূপ করিতেছে তাহাও নলিনের বুঝিতে বাকি রহিল না। কিন্তু নলিন ইচ্ছা পূর্ব্বক গগনের বড় হয় নাই। বাধ্য হইয়া তাহাকে গগনের সঙ্গ ত্যাগ করিতে হইয়াছে। গগনের মনে মনে নলিনের উপর যৎপরোনাস্তি রাগ জন্মিল। গগন কহিল “আচ্ছা হও, দুদিন বড় হও, এর শোধ দেশে ফিরে গিয়ে যদি না নিতে পারি তবে আমার কান কেটে দিও।”

নলিন যে কেবল লালবিহারী বাবুর শ্যালকের নিকট আদর পাইল, এরূপ নহে। লালবিহারী বাবুর স্ত্রী নলিনকে ডাকিয়া নানাবিধ কথা বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। বস্তুত নলিনের নম্র স্বভাব, ম্লান বদন ও সুকুমার বয়স, অথচ জীবিকা নির্ব্বাহ জন্য

এই বয়সে পাচকের কার্য্য করিতে হয় ইহাতে বাটীর সকলেই নলিনকে স্নেহ করিতে লাগিলেন। লালবিহারী বাবুর স্ত্রীর সহিত কথোপকথনের সময় নলিন তাঁহাকে কি বলিয়া সম্বোধন করিবে স্থির করিতে পারে না। তাহার কষ্ট দেখিয়া বিধুমুখী কহিলেন "নলিন তুমি আমাকে দিদি বোলে ডেকো। আমি তোমাকে সহোদর ভেয়ের মতন দেখবো। আর বাড়ী গেলে তোমার যাতে আর রসুই না কোরতে হয় তা আমি কোরবো।"

নলিন বিধুমুখীর কথা শুনিয়া রোদন সম্বরণ করিতে পারিল না। জন্মাবধি ভগ্নীর নিকট ভিন্ন আর কাহারও নিকট নলিন এরূপ মিষ্ট কথা শুনে নাই। পাছে বিধুমুখী তাহার ক্রন্দন টের পান এই জন্য নলিন বিনীতভাবে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তথা হইতে যাইবার উদ্যোগ করিল। বিধুমুখী কহিলেন "এখনি যাবে কেন? একটু বোস।" নলিন অধোবদনে বসিল। তখন বিধুমুখী তাহার বাটীর সম্বন্ধেই নানাবিধ কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। নলিনের উত্তর শুনিয়া বিধুমুখীও অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। পরে নিজের হস্তে নলিনকে আহারের দ্রব্যাদি দিয়া নলিনকে খাওয়াইয়া কহিলেন "আচ্ছা এখন যাও বৈঠক-খানায় গিয়া বোস। তোমার যখন যা দরকার হবে আমাকে বোলো। এ বাড়ী তোমার নিজের বাড়ী মনে কোরো। আমাকে দিদি বোলে ডেকো। ভুলবে না তো?"

নলিন গাঢ় স্বরে কহিল "না।" পরে বিধুমুখীকে প্রণাম করিয়া বাহির বাটী আসিল।

রাত্রি নিদ্রায় অতিবাহিত হইল। পরদিবস প্রাতে নলিন গগন, দাসী, বিধুমুখী ও তাঁহার নিজের দাসী রেলওয়ে চড়িয়া লালবিহারী বাবুর কার্য্যস্থানে উপস্থিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল।

যমরাজ ভুলেন কিন্তু পাওনাদার ভুলে না। যে দিন, যে ঘণ্টায়, যে মুহূর্ত্তে পাওনাদারকে আসিতে বলিবে, সেই দিন সেই ঘণ্টায়, সেই মুহূর্ত্তে সে আসিবেই আসিবে। পাঠক যদি আমার ন্যায় চিরঋণী হন তাহা হইলে এ কথার সারবত্তা অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন। এরূপ পাঠকের নিকট আমার অধিক আর কিছু বক্তব্য নাই। যাঁহার ঋণ নাই, তিনি একথা বুঝিবেন না। মাথা না থাকিলে মাথা ব্যথা কাহাকে বলে টের পাওয়া যায় না। সুতরাং এরূপ পাঠককে আমার এ সারগর্ভ কথা বুঝাইতে চেষ্টা করা পণ্ডশ্রম মাত্র। রায় মহাশয় যে সোমবারের প্রাতে নকড়ীর টাকা দিবেন বলিয়াছিলেন নকড়ী ঠিক সেই সোমবারে প্রত্যূষে রায় মহাশয়ের বাটী গিয়া উপস্থিত। রায় মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া নিয়মিত গুড়ুক সেবনানন্তর, গাড়ুটী হাতে লইয়া বহির্দ্বারে আসিয়াই নকড়ীকে দেখিতে পাইলেন। অমনি রাগতস্বরে দুর্গা দুর্গা বলিয়া নকড়ীকে যথেচ্ছা তিরস্কার করিয়া

প্রতিজ্ঞা করিলেন "আজ যদি টাকা নাও পাই, তবু ঘটী বাটী বন্ধক দিয়া যদি তোর টাকা না দি তবে আমি ব্রাহ্মণের সন্তান নই।" নকড়ী প্রতিজ্ঞা শুনিয়া ম্রিয়মান ও তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রত্যূষে ব্রাহ্মণ রাগ করিয়াছে, ভয়ে নকড়ীর শরীর কম্পিত হইতে লাগিল। রায় মহাশয় প্রতিজ্ঞা করিয়া চলিয়া গেলেন, নকড়ীও ভীত চিত্তে তথা হইতে প্রস্থান করিল। বাবু মুখ হাত ধুইয়া, প্রাতঃসন্ধ্যা সমাপনানন্তর কাছারি আসিয়া বসিলেন। কিন্তু নকড়ীকে না দেখিতে পাইয়া একজন পেয়াদাকে তাহাকে ধরিয়া আনিবার জন্য প্রেরণ করিলেন।

নকড়ী পেয়াদা আসিতেছে দূর হইতে দেখিতে পাইয়া নিজের ঘরে দ্বার বন্ধ করিয়া রহিল। মাতাকে কহিল যেন সে কোথায় পেয়াদাকে না বলিয়া দেয়। পেয়াদা আসিয়া নকড়ীর মাতার নিকট জিজ্ঞাসা করিল "নকড়ী কোথায়।" কিন্তু নকড়ীর মাতা না বলিতে পারায় ফিরিয়া গেল। পেয়াদার কথা শুনিয়া বাবু রাগত হইয়া আর পাঁচ জন পেয়াদা পাঠাইলেন। হুকুম দিলেন যদি নকড়ী বাড়ী না থাকে, তাহার স্ত্রী ও মাতাকে বন্ধন করিয়া আনে। পেয়াদারা আসিয়া নকড়ীর মাতার নিকট অনুসন্ধান করিয়া নকড়ী কোথায় আছে জানিতে না পারিয়া নকড়ীর মাতাকে কহিল "তোমাকে ও বউকে ধরিয়া লইয়া যাইব।" এই বলিয়া নকড়ীর মাতার হস্ত ধরিতে গেল। নকড়ী নিজ গৃহ হইতে দেখিয়া রাগে—জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় বাহির হইয়া আসিয়া কহিল "যত বড় মুখ তত বড় কথা? চল দেখি তোরা আমাকে

কি করিস? দেশ কি এমনি অরাজক হয়েছে?" পেয়াদারা সকলেই সেই গ্রামের লোক। তাহাদিগের অবস্থা নকড়ীর অবস্থা অপেক্ষা উন্নত নহে। তাহারা কহিল "ভাই আমাদের অপরাধ কি? যেমন হুকুম পেয়েছি তেমনিই করেছি। আমাদের কি ইচ্ছে যে তোমার অপমান হয়? পেটের জ্বালায় চাকারি করি, যা মনিবে বলে তাই কোর্‌তে হয়।

নকড়ী কহিল "আচ্ছা, আচ্ছা চল্ দেখি তোদের বাবু আজ আমার কি করে? দেশে কি আইন কানন নেই যে যা মনে করে তাই কোর্‌বে?"

এই কথা বলিয়া সকলে একত্র হইয়া রায় মহাশয়দিগের বাটীতে গমন করিল।

দূর হইতে নকড়ীকে দেখিয়া রায় মহাশয় রাগে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় হইয়া উঠিলেন। এবং নিকটে আসিলে অবাচ্য ভাষে তাহাকে গালি দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে আদেশ করিলেন।

রায় মহাশয়ের তিরস্কার বাক্যে নকড়ীর চক্ষু রাগে রক্তবর্ণ হইল। কম্পিত কলেবরে কহিল "আপনার যা মুখে আসে তাই বোলছেন। সকলেরি রক্ত মাংসের শরীর। একটু বিবেচনা করে কথা কবেন। আপনি দিনে দুপর বেলা লোকের পরিজনের গায় হাত দিতে পেয়াদা পাঠিয়ে দেন? ভেবেছেন দেশে কি আইন আদালত নেই।"

রায় মহাশয় উপস্থিত ব্যক্তিদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "দেখ দেখ এ ব্যাটার আবার আইন কানন জ্ঞান হয়েছে।" পরে নকড়ীর দিকে সরোষে তাকাইয়া কহিলেন "আইন কানন

আছে, তোমাকে দেখাচ্ছি।" এই বলিয়া দুদিক হইতে দুজন পেয়াদাকে নকড়ীর কান ধরিতে আদেশ করিলেন।

হুকুম শুনিয়া নকড়ীর মুখ রাগে উন্মাদের মুখের ন্যায় হইল। পেয়াদা সাহস করিয়া নকড়ীর নিকট অগ্রসর হইতে পারিল না। তদ্দর্শনে বাবু নিজে জুতা হাতে করিয়া নকড়ীকে প্রহার করিতে উঠিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিগণ হিতে বিপরীত ঘটিবার ভয়ে তাঁহাকে হাত ধরিয়া থামাইল। বাবু বসিয়া পুনরায় নকড়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

বাবুর পুরোহিত সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন "আপনি কি ক্ষেপেছেন? ও চাষা লোক, ওর সঙ্গে কি আপনার বকাবকি শোভা পায়? আপনি পাঁচ কথা বোল্লে ও যদি এক কথা বলে, তা হলেও আপনার মানের হানি। আর গালি দিয়া কাজ নাই। ওকে যে জন্য এনেছেন তাই করুন। ওর যা প্রাপ্য আছে দিয়ে দিন, ও চলে যাক।"

বাবু পুরোহিতের কথা শুনিয়া একটু থামিলেন। কিঞ্চিৎ পরে একজন কর্ম্মচারীকে নকড়ীর হিসাব প্রস্তুত করিতে বলি-লেন। কর্ম্মচারী দক্ষিণকর্ণ বিদ্ধ করা কতকগুলি কাগজ নাড়িয়া চাড়িয়া কহিলেন নকড়ীর নিকট সাবেক হিসাবের বাবদ কিছুই পাওনা নাই। তখন বাবু নিজের বাক্স হইতে পাঁচটী টাকা লইয়া নকড়ীর নিকট নিক্ষেপ করিলেন। নকড়ী টাকা লইয়া চলিয়া যাইবে এমন সময় বাবু পেয়াদাদিগকে রোজ আদায় করিতে বলিয়া দিলেন। নকড়ী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল "ইচ্ছে হয় আপনি সকলি নিন। আমি কিছু চাইনে। এত কালের

পর আমার নেজ্য টাকা দিলেন, তার আবার রোজ দেব কিসের? আমি যে এত হাঁটাহাঁটি করলাম, আমার রোজ কে দেবে?"

বাবু এই কথা শুনিয়া আর রাগ বরদস্ত করিতে পারিলেন না। নক্ষত্র বেগে গাত্রোত্থান করিয়া জুতা লইয়া নিজে নকড়ীকে প্রহার করিতে চলিলেন এবং উপস্থিত ব্যক্তিরা নিবারণ করিবার অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই নকড়ীর মস্তকে তিন চারিবার প্রহার করিলেন। নকড়ীও অপমান বরদস্ত করিতে না পারিয়া বাবুর কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক তাঁহার পৃষ্ঠে চপেটাঘাত করিল। অমনি মুহূর্ত্ত মধ্যে সকলে চমকিত ও ভীত হইয়া পড়িল। কাহারও মুখে কথা নাই। হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত কেহ স্পন্দন করিতেছে না। কাহারো চক্ষে পলক পড়িতেছে না এবং বোধ হইতে লাগিল যেন কেহ নিশ্বাস পর্য্যন্ত ছাড়িতেছে না।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

কুচক্র।

রায় মহাশয় বেদনায়, লজ্জায়, রাগে হতজ্ঞান প্রায় হইয়া বিছানায় আসিয়া বসিলেন। নকড়ী ভয়ে ও রাগে ঠক্ ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। যে কর্ম্ম করিয়াছে তাহাতে যে তাহাকে আস্ত ছাড়িয়া দিবে এরূপ বিশ্বাস ছিল না কিন্তু আত্মরক্ষা করিতে গিয়া পাছে কেহ খুন হয় এই তাহার ভয়। কারণ নকড়ী মনে মনে পণ করিয়াছে তাহার প্রাণ থাকিতে কাহাকে তাহার গায়ে হাত তুলিতে দিবে না। যে কার্য্য হইয়া গিয়াছে তাহার আর চারা নাই। মৃত্যু একবার বই দুইবার হয় না। বাবুকে যেখানে প্রহার করিয়াছে সেখানে তো কাজের চূড়ান্ত হইয়াছে। এখন আর কাহাকে বাছিবে? আর বাছারই বা ফল কি?

অন্যান্য সকলে বিস্ময়ে নিস্তব্ধ। কাহারও মুখে কথা নাই। যে যেখানে বসিয়াছিল ছবির ন্যায় সেই খানেই বসিয়া আছে। হস্ত পদাদি পর্য্যন্ত কেহ নাড়িতেছে না। সম্মুখে আটচালা ঘরে পাঠশালার বালকেরা গোলমাল করিতেছিল তাহারা পর্য্যন্ত

অবাক হইয়া রহিল। গুরু মহাশয় বালকদিগকে ছুটী দিয়া পাঠশালা বন্ধ করিবেন কি না এই ভাবনায় তাঁহার দক্ষিণ হস্তের বেত ও বাম হস্তের হুকা পড়িয়া গেল।

ক্ষণকাল সকলে এই ভাবে থাকিলে লোচনানন্দ ভট্টাচার্য্য (বাবুর পুরোহিত) হরি! হরি! বলিয়া কহিতে লাগিলেন "এ উপস্থিত কার্য্যের এখন কি কর্ত্তব্য? ভদ্রলোকের আর মান থাকে না। ঘোর কলি উপস্থিত হয়েছে। ছোট লোকের এরূপ আস্পর্দ্ধা ঘোর কলি উপস্থিত না হ'লে কেন হবে? শাস্ত্রের কথা ব্যর্থ হয় না।"

বাবুর পারিষদ উদ্ধব বটব্যাল কহিলেন "আপনি যা আজ্ঞা করেছেন যথার্থ, কিন্তু এখনও যেখানে চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌চেন, গঙ্গা আছেন, সেখানে এর একটা বিহিত অবশ্যই কোরতে হবে। আমি বলি ব্যাটাকে মেরে ও হাড় গুঁড়া করে ওর বাড়ী ফেলে আসুক।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "না না সেটা কর্ত্তব্য করে না, তার প্রতি কারণ এই ব্যাটাকে যেরূপ রাগত উদ্ধত ও উন্মত্ত দেখছি তাতে প্রহার কোর্‌তে গেলে একটা খুনাখুনি হয়ে যাবে। তার দরুণ আর কিছু না হয় অন্ততঃ আমাদিগের সাক্ষী দিতে হবে। আমার কোন পুরুষে সে কাজ হয় নাই। রায় মহাশয়ই বা কেমন করে সাক্ষী দেবেন। স্বর্গীয় কর্ত্তারা সমনের পেয়াদাকে খুন পর্য্যন্ত করেছেন কিন্তু তবু সমন নিয়ে সাক্ষী দেন নাই। আমার মতে ব্যাটার হাতে কিছু দিয়ে ওকে চোর বলে থানায় ধরে দেওয়া যাক। তা হলে যে সে দুটা সাক্ষী যোগাড়

করে দিলেই চলবে।” পরে বটব্যালের দিকে চাহিয়া “বটব্যাল ভায়া আজকাল আর জোরের কাল নেই কৌশল করে নিজের জাত মান ধর্ম্ম বজায় রেখে চলতে হয়।”

উপস্থিত সকলেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে মত দিলেন। কেবল নকড়ীর তাহাতে অমত, কারণ বাটীর মধ্য হইতে যখন একটা ঘড়া আনিয়া চৌকিদারকে ডাকিয়া তাহার সম্মুখে নকড়ীর হাতে দিবার চেষ্টা করা হইল, নকড়ী কোন মতেই ঘড়ায় হাত দিতে চাহে না। তখন পুরোহিত মহাশয় কহিলেন, “আচ্ছা ঘড়া হাতে কোরে নিক আর না নিক, চৌকিদার তুমি তো দেখলে এ ঘড়া ইহারই নিকট পাওয়া গিয়াছে? তুমি একে নিয়ে থানায় যাও।”

চৌকিদার নকড়ীকে চিনিত, নকড়ী যে চুরি করিবার লোক নহে তাহাও জানিত। কিন্তু রায় মহাশয় গ্রামের জমীদার তাহার কথা কি প্রকারে লঙ্ঘন করে? অনিচ্ছা পূর্ব্বক অগ্রসর হইয়া নকড়ীর হস্ত ধরিতে গেল। নকড়ী গম্ভীরস্বরে ও আরক্ত লোচনে বলিল “তফাৎ; আমার গায়ে হাত দিলে ভাল হবে না।” নকড়ীর ভঙ্গী দেখিয়া চৌকিদার বলিল “আপনারা দু চার আদমী মদত না দিলে আমি একলা নিয়ে যেতে পারি না।” কিন্তু বাবুর পেয়াদারা কেহ অগ্রসর হইতে ইচ্ছুক নহে দেখিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় বটব্যালকে ডাকিয়া কহিলেন “বটব্যাল ভায়া একটা পরামর্শ শুনে যাও।” উভয়ে ক্ষণেক অন্তরালে গিয়া পরামর্শ করিয়া আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন “আচ্ছা চৌকিদার তুমি বাড়ী যাও। নকড়ী তুমিও বাড়ী যাও। যা

হবার তা হয়ে গিয়েছে। আর কিছুতে তো ক্ষো সারবে না। তবে আর মিথ্যা তোমার শরীরকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? পেয়াদারা তোমরাও যাও, যে যাহার স্নানাহার কর গিয়ে।” পরে গুরু মহাশয়কে ডাকিয়া কহিলেন “গঙ্গাধর তুমি যে এখনও পাঠশালা ছুটী দেও নাই? বেলা বিস্তর হয়েছে, বালকদের ছেড়ে দাও।” গুরু মহাশয় পাঠশালার ছুটী দিলেন; বালকেরা মনে মনে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল। তখন বাবু, ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বটব্যাল আর দু এক জন একত্রে এই পরামর্শ স্থির করিলেন যে রাত্রিযোগে নকড়ীর বাটীর প্রাঙ্গনে খান কএক বাসন ও গহনা পুতিয়া রাখিয়া আসা হইবেক ও বাবুর গৃহে একটা সিদ কাটা হইবেক। প্রত্যূষে থানায় খবর দিয়া দারগাকে আনাইয়া ঐ সমস্ত জিনিষ পত্র গয়েন্দা দ্বারা নকড়ীর প্রাঙ্গন হইতে বাহির করা হইবে। তাহা হইলে আর কোন ভাবনা ভাবিতে হইবেক না। নকড়ীকে নিশ্চয় জেলে যাইতে হইবেক।

এইরূপ পরামর্শ স্থির করিয়া যে যাহার বাটীতে স্নানাহার করিতে গমন করিলেন। সভা ভঙ্গ হইল।

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ।

ইষ্টদেবতা পূজা।

যে পরের সুখে সুখী হয় না, পরের দুঃখে দুঃখিত হয় না, সর্ব্বদাই নিজের চিন্তায় ব্যস্ত, তাহাকে আমরা স্বার্থপর বলি। স্বার্থপরতা দোষ বড় দোষ। কিন্তু ভাল করিয়া পর্য্যালোচনা করিলে কজন লোকের পরদুঃখে নিদ্রা হয় না দেখা যায়? কজন লোক পরের সুখে নৃত্য করিয়া বেড়ায়? পর দূরে থাকুক, আপন বাটীর মধ্যে, আপন পরিবারের মধ্যে এক জনের কোন কষ্ট হইলে কি অপর একজন সেই কষ্টের দরুণ অনাহারে থাকে, না তন্নিমিত্ত তাহার নিদ্রা হয় না? প্রাণাধিক এক মাত্র পুত্র মরিতেছে, জননী অশ্রুময় লোচনে তাহাকে ভাল বিছানাটা হইতে একটা মন্দ বিছানায় রাখিতেছেন, ভালটার উপর প্রাণ-ত্যাগ হইলে সেটা নষ্ট হইয়া যাইবেক। এরূপ দৃষ্টান্ত অসংখ্য অসংখ্য দেওয়া যাইতে পারে। বস্তুত অস্মদের ন্যায়, উক্ত পুরুষের ন্যায় আর কেহই নাই।

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বটব্যাল ভায়া যতই কেন বাবুর দুঃখে দুঃখিত হউন না বাটী আসিয়া উভয়ে স্নান করিলেন। উভয়েই আহার করিলেন। আহারের সময় নিত্য নিত্য যেরূপ বোঝাই লইয়া থাকেন অদ্যও সেইরূপ লইলেন। রায় মহাশয়ের দুঃখে দুঃখিত হইয়াছেন বলিয়া তাহার এক গ্রাস কম হইল না। আহারান্তে উভয়েই মৌতাতি নিদ্রাটুকুর জন্য শয়ন করিলেন। শয়ন মাত্রেই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নাসিকা-ভেরী বাজিয়া উঠিল। বটব্যাল ভায়া একটু অহিফেন সেবন করিয়া থাকেন; আহারান্তে তামাক খাইতে খাইতে ক্রমে চক্ষু দুটী মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হইল, হুঁকার ডাকের শব্দ কমিতে লাগিল। বটব্যাল ভায়ার মুখে একটী মাছি বসিল। অমনি বটব্যাল ভায়া মুখ নাড়িলেন, চক্ষু খুলিলেন; সঙ্গে সঙ্গে হুকাও গড় গড় করিয়া ডাকিল। এই রূপ দেয়ালা করিতে করিতে অবশেষে বটব্যালের যথার্থ নিদ্রা হইল। রায় মহাশয় সভা ভঙ্গের পর অন্তঃপুরে আসিয়া স্নান সমাপনান্তে পূজায় বসিলেন। রায় মহাশয়ের পূজা স্বভাবত কিঞ্চিৎ দীর্ঘকাল ব্যাপী ছিল, কিন্তু অদ্য সে পূজা যেন অনন্ত হইয়া উঠিল। পূজার আর শেষ হয় না। নিয়মিত ভোগের জন্য যে অন্ন প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা শুকাইয়া গেল। পুনরায় অন্ন প্রস্তুত হইল তাহাও শীতল হইতে লাগিল—পূজার আর শেষ হয় না। রায় মহাশয় রক্ত জবা শিবের মস্তকে দান করিতেছেন, চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বম বম করিতেছেন, এবং ঢিপ ঢিপ করিয়া সানের উপর মাথা কুটিতেছেন। রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিনী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন কখন পূজা শেষ হইবে

রায় মহাশয় চক্ষু খুলিয়া সে দিকে তাকাইয়াও দেখিলেন না। রায় মহাশয় নিতান্ত নকড়ীর মুখ হইতে রক্ত উঠাইয়া না মারিয়া ছাড়িবেন না। কিন্তু নকড়ীর ইহাতে কি হইতেছে' তাহা নকড়ীই জানে আর শিবই জানেন'। কিন্তু রায় মহাশয়ের কপাল ফুলিয়া উঠিল, আর বাটীতে সকলের জঠরানল জ্বলিয়া উঠিল। কর্ত্তা না আহার করিলে কে আহার করিবে? ক্রমে বেলা শেষ হইতে লাগিল। বাটীর সকলেই যাহার যেরূপ সাধ্য কর্ত্তাকে প্রবোধ দিলেন। কিন্তু কর্ত্তা শুনিলেন না। পরিশেষে নিরুপায় হইয়া গৃহিণী এক জন চাকরকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিয়া আনিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনেক শাস্ত্রে দৃষ্টি আছে। দুর্গাদাস করের ভৈষজ্য রত্নাবলী তাহার একটী। সেই ভৈষজ্য রত্নাবলী দেখিয়া ঔষধ প্রস্তুত করিয়া বিনা মূল্যে বিতরণ করেন। রোগীরা কেবল ঔষধের ব্যয় ও ঔষধ প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমস্ত দ্রব্য প্রয়োজন হয় তাহাই মাত্র দেয়। ইহাও আবার অবস্থা বিবেচনায় লওয়া আছে। ধীবর রোগী হইলে ঔষধে রোহিত মৎস্যের পিত্ত দরকার হয়, কিন্তু এরূপ কৌশলে পিত্ত বাহির করিতে হয় যে নিজে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিম্বা তাঁহার দাসী ক্ষেমা ভিন্ন আর কেহই তাহা পারেনা সুতরাং ধীবরকে আস্ত মাছটী পাঠাইয়া দিতে হয়। গোয়ালার পীড়ার ঔষধ খাঁটি গাভি ঘৃত দিয়া পাক করিতে হয়। তেলির পীড়ায় খাঁটি সরিসার তেলে ঔষধ মর্দ্দন বিধেয় ইত্যাদি। ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে এ সমস্ত। নিজে ভোজন করেন একথা কাহারও বলিবার সাধ্য নাই কারণ

তিনি অশূদ্র-পরিগ্রাহী। ঔষধ প্রস্তুতার্থ যে অর্থ বা যে সমস্ত দ্রব্য প্রয়োজন হয় তদ্ভিন্ন তিনি আর কিছুই গ্রহণ করেন না। লোক-সমাজে বিশেষ নবশাকের দলে এই জন্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিশেষ প্রতিপত্তি।

অদ্য প্রাতঃকালে অধিক রোগী দেখিতে পারেন নাই এজন্য সকলেই বৈকালে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রাঙ্গনে সমবেত হইয়াছে। সকলেই প্রায় ভিন্ন ভিন্ন জাতি, এজন্য কেহ কাহারও বিছানায় বসিবে না। সকলেই পৃথক পৃথক উপবিষ্ট, কেহ এক আঁটী খড়ের উপর, কেহ এক টুকরা মাদুরের উপর, কেহ এক টুকরা কম্বলের উপর, কেহ বা নিজের ছাতের উপর। ভট্টাচার্য্য মহাশয় এই সভার মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া কাহারও নিকট হইতে ঔষধের মূল্য, কাহারও নিকট হইতে ঔষধ প্রস্তুত করণোপযোগী দ্রব্যাদি গ্রহণ করিতেছেন। কোন রোগীকে সত্বর আরোগ্য লাভের সংবাদে তুষ্ট করিতেছেন। কোন রোগীকে শূল-বেদনা কয় প্রকার, কাহাকে বা বিকার কয় প্রকার বুঝাইয়া দিতেছেন। একজন সদ্‌গোপ এক কেঁড়ে দুধ আনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আসনের নিকট রাখিয়া প্রণাম করিল। তাহার পীড়া আরোগ্য হইয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তো অর্থ গ্রহণ করেন না। সেই জন্য এক ভাঁড় দুধ আনিয়াছে। ঔষধের ব্যয় আট টাকা পূর্ব্বে দিয়াছে। তাহার পীড়া, দু দিন অন্তর জর আসিত। তিন দিনে বার মোড়া ঔষধ খাইয়া আরোগ্য হইয়াছে। এক জোরের

ঔষধ অত্যন্ত দামী হইবে তাহার আর সন্দেহ কি? বিশেষ ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিয়া দিয়াছেন এ ঔষধ এদেশের নয় মার্‌কিন মুল্লুক হইতে জাহাজে আইসে। সুতরাং আনিবার খরচাও অধিক। ভট্টাচার্য্য মহাশয় আরোগ্য সংবাদ শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। কিন্তু তাহার দুদ তো গ্রহণ করিতে পারেন না? দুদ গ্রহণ করিলে অর্থ গ্রহণে দোষ কি? সদ্‌গোপ দুঃখিত হইয়া দুদের পাত্রটী লইয়া গমনোন্মুখ হইল। তদ্দর্শনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহা অপেক্ষাও অধিকতর দুঃখিত হইলেন। বলিলেন "বোস, বোস বাপু, দুঃখিত হয়ে যাবে এটা ভাল নয়, আমি একটা উপায় কোরচি" এমন সময়ে রায় মহাশয়ের চাকর আসিয়া প্রণাম করিয়া কহিল "বাবুর বাড়ী যেতে হবে, গিন্নি ডেকে পাঠিয়েছেন?" ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "আচ্ছা, ভাল, যাচ্চি। রাম এসেছ বড় ভালই হয়েছে? একবার বটব্যাল ভায়াকে ডেকে আন দেখি। রায় মহাশয়ের চাকরের নাম রাম। রাম কহিল "আজ্ঞা, তাঁকেও ডাক্‌তে এসেছি।"

ভট্টাচার্য্য। তবে ভালই হয়েছে! যাও শীগ্‌গির শীগ্‌গির ডেকে আন।"

রাম চলিয়া গেলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় সদ্‌গোপকে কহিলেন "বাপু তোমার কি অদৃষ্টের জোর! তুমি কি ধার্ম্মিক! দুদ টুকু কায়মন বাক্যে আমাকেই দেবে বলে এনেছিলে। সে আশা নৈরাশ হচ্ছিল। কি ভারতীর কৃপা, অমনি রামা এসে উপস্থিত। রামা বটব্যালকে ডেকে আন্‌বে। বটব্যাল দুদ টুকু হাতে করে

নিয়ে আমাকে দিবেন। তা হলে দোষ কেটে গেল। আমার ব্রাহ্মণের দান লওয়া হল। তোমারও ব্রাহ্মণকে দেওয়া হ'ল। দেখ্‌লে শাস্ত্র কি সূক্ষ্ম! প্রতি কথায় কত কৌশলের, কত বিদ্যা বুদ্ধির পরিচয় রয়েছে। এমন সনাতন হিন্দু ধর্ম্মকে লোকে আজ কাল দু পাতা ইংরাজি পড়ে অবমাননা কোরতে আরম্ভ করেছে। ব্যাটারা না পড়ে শুনেই পণ্ডিত।"

উপস্থিত ব্যক্তিগণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে বটব্যাল অনেক দেয়ালা করিয়া পরিশেষে নিদ্রিত হইয়াছেন। সেই নিদ্রা পরিপক্ক না হইতে হইতে রামা গিয়া তাঁহাকে জাগ্রত করিল। কিন্তু বাবুর বাটী হইতে ডাক আসিয়াছে ফেলিবার যো নাই। তখন রামাকে তামাক দিতে বলিলেন। রাম তামাক আনিল। বটব্যাল অর্দ্ধ মুদ্রিত নয়নে তামাক টানিতে টানিতে পুনরায় নিদ্রিত হইবার উপক্রম দেখিয়া রামা পুনরায় ডাকিল। তখন বটব্যাল বিরক্ত হইয়া মাথা তুলিয়া রামার হাতে হুঁকাটী সমর্পণ করিলেন। মুখ হইতে লাল কাটিয়া বটব্যালের মুখ ও হুঁকার মুখ এক প্রকার যুড়িয়া গিয়াছিল। যখন হস্ত প্রসারিত করিয়া বটব্যাল রামার হাতে হুঁকা দিলেন তখন রূপার তারের মতন লালা লম্বা হইল, পরে মধ্যস্থল নামিয়া ক্রমে বটব্যালের হাতে, গায়ে সেই লাল পড়িল। বটব্যাল দক্ষিণ হস্ত দিয়া মুখ মোছায় কিয়দংশ সেই হস্তে লাগিল। পরে মুখে একটু জল দিয়া একটা পান খাইতে খাইতে পিচের ছড়ি একগাছা লইয়া রামার পশ্চাৎ দেহ পরিচালন করিলেন।

ক্ষণকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী পৌঁছিয়া তাঁহাকে দুগ্ধভার হইতে মুক্ত করিয়া তিন জনে বাবুর বাটীর রাস্তা ধরিলেন

রায় মহাশয়ের বাটীতে পৌঁছিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বটব্যাল ভায়া উভয়েই অন্তঃপুরে গমন করিলেন। দেখিলেন রায় মহাশয় মুদ্রিত নেত্রে ধ্যানে বসিয়া আছেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তদ্দর্শনে প্রবোধ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। রায় মহাশয় কথা না কহিয়া কেবল মাথা নাড়িলেন। কিন্তু অন্তরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপেক্ষা আর এক জন গুরুতর ব্যক্তি— যাহার কথা কোন ক্রমেই ফেলিবার যো নাই,—এমন এক ব্যক্তি আসিয়া রায় মহাশয়কে সান্ত্বনা করিতেছে। সে ব্যক্তির নাম জঠরানল। রায় মহাশয় হঠাৎ তাহার কথা শুনিলে লোকে হাসিবে এই ভয়ে অলঙ্ঘনীয় হইলেও এখনও তাহাতে কর্ণপাত করিতেছেন না। ক্ষণকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "আপনি আহার করুন আর নাই করুন, আপনার ইষ্ট দেবতাকে উপবাসী রাখিবার ক্ষমতা তো আপনার নাই। ইষ্ট দেবতাকে অন্নদান করুন।" ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর কথা কি হইতে পারে? রায় মহাশয় চক্ষু খুলিলেন এবং ইষ্ট দেবতার ভোগের জন্য অন্নানয়ন করিতে কহিলেন। গৃহিণী অন্ন আনিয়া সাশ্রু নয়নে সেই স্থানে উপবেশন করিলেন। সম্মুখে ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বটব্যাল ভায়া। অন্ন নিবেদন হইলে ইহারা তিন জনেই রায় মহাশয়কে ভোজন করিতে অনুরোধ করিলেন। রায় মহাশয় অনুপায় দেখিয়া তাহাদেরই কথার অনুমোদন করিলেন।

রায় মহাশয়ও আহারাদি সমাপন করিলেন, সূর্য্য দেবও অস্তাচলাবলম্বী হইলেন। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বটব্যাল ও বাবু নিজে উপস্থিত বিষয়ের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে বসিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বুদ্ধি এ বিষয়ে যেরূপ খোলে এমন আর কোন বিষয়ে নহে। বটব্যাল চক্ষু বুঁজিয়া তামাক টানেন ও সকল কথাতেই সায় দিয়া যান। অনেক তর্ক বিতর্কের পর সকাল বেলার পরামর্শই স্থির হইল অর্থাৎ নকড়ীর প্রাঙ্গনে দু চার খানি গহনা পুতিয়া রাখা হইবে। অধিকন্তু এই হইল যে বাবুর একজন ভৃত্য এই চুরির গয়েন্দা এইরূপ নিজে প্রকাশ করিবে, সুতরাং নকড়ীর আর কোন রূপ পরিত্রাণের পথ থাকিবে না।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

বিধুমুখী স্বামীগৃহে।

বিধুমুখী স্বামী গৃহে পৌঁছিলে দিন কয়েক বাটীতে আর আনন্দের সীমা রহিল না। লালবিহারী বাবুর মাতা এমন সুন্দরী, এমন লক্ষ্মী বউ আর কখনও দেখেন নাই। কি ভুরু কি নাক, কি চোক এমন আর পৃথিবীতে হয় নাই, হবে না। এতদিন তাঁহার গৃহ-পদ্ম খালি ছিল, এখন লক্ষ্মী আসিয়া সেই পদ্মে উপবেশন করিলেন। এতদিন ঘর অন্ধকার ছিল এখন সেই অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বলিল। লালবিহারী বাবুর মাতা আর কাহাকেও কোন কার্য্য করিতে বলেন না। যখন যাহা প্রয়োজন হয় বউমাকে আনিতে বলেন। আর কেহ কিছু হাতে করিয়া দিলে লন না আর কাহারও হাতের কিছু খান না। মনে করেন বউ মা তাঁহার এ কৃপা বিতরণে বড় সন্তুষ্ট থাকেন। সকল বৃদ্ধ লোকেই এই রূপ মনে করে। ভাবে অল্প বয়স লোকদিগকে আদর করিলে, সর্ব্বদা নিকটে রাখিলে, যখন যাহা প্রয়োজন হয় তাহাদিগকে আনিতে বা করিতে বলিলে তাহারা বড় সন্তুষ্ট হয়। বস্তুত যে তাহা নয় তাহা

লালবিহারী বাবুর মাতার জানা দূরে থাকুক, আমরাই অনেকে জানি না, জানিলেও সর্ব্বদা কার্য্যে পরিণত করিতে পারি না।

লালবিহারী বাবুর স্ত্রী যতই মনে মনে বিরক্ত হউন প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারেন না। দিন কয়েক এই ভাবে অতিবাহিত হইলে এক দিবস পাড়ার সকল গিন্নীরা নূতন বধূ দর্শনার্থে লালবিহারী বাবুর বাটী উপনীত হইলেন। লালবিহারী বাবুর মাতা সকলকে সমাদরে বসাইয়া নূতন বউকে ডাকিলেন। অদ্য রবিবার লালবিহারী বাবু অন্তঃপুরে নিজ গৃহে শয়ন করিয়া আছেন, বিধুমুখী স্বামীর পর্য্যঙ্কের পার্শ্বে বসিয়া স্বামীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময়ে দাসী আসিয়া ডাকিল। লালবিহারী বাবু ইহাতে বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। কিন্তু কি করেন মাতা ডাকিতেছেন সুতরাং বিধুমুখীকে যাইতে দিলেন। কিন্তু যত শীঘ্র পারেন ফিরিয়া আসিতে বলিলেন।

বিধুমুখী ঘোমটায় বদন আবৃত করিয়া রঙ্গভূমিতে পৌছিলেন। লালবিহারী বাবুর মাতা কহিলেন "এখানে ঘোমটা কেন? এ সকলি আমাদের বাড়ীর লোক বোল্লে হয়। বোস বউমা বোস। এঁকে প্রণাম কর, ইনি তোমার শাশুড়ী রসিকের মা। রসিক যে আমাদের লালবিহারীর কাছারিতে কর্ম্ম করে। উনি তোমার বড়জা ওঁকে প্রণাম কর।" এই রূপ সধবা বিধবা যে কয়েক জন ছিল সকলকেই বিধুমুখী প্রণাম করিলেন। সকলেই "ধনে পুত্রে লক্ষী লাভের" আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং সকলের মাথার চুল একত্র করিলে যত হয় বিধুমুখীর এত পরমায়ু হইবার জন্য দেবতাদের নিকট অনুরোধ করিলেন।

অনন্তর বিধুমুখীর পিতা মাতা বর্ত্তমান আছেন কিনা, তাঁহার কয় ভাই, কয় ভগ্নী, কাহার কোথায় বিবাহ হইয়াছে, কাহার কয় সন্তান ইত্যাদি সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় অবগত হইয়া পান-শুপারি গ্রহণান্তর সকলে বিদায় হইলেন। বিধুমুখীও স্বামীর নিকট প্রত্যাগমন করিলেন।

এ সমস্ত বর্ণনা শীঘ্রই হইয়া গেল কিন্তু কার্য্যে পারণত হইতে বিলম্ব হইয়াছিল। রাস্তায় দাঁড়াইয়া কিম্বা অন্য কোন স্থানে লোকের আগমন প্রতীক্ষা করা কত কষ্টকর তাহা যাহারা প্রতীক্ষা না করিয়াছে তাহারা সহজে বুঝিতে পারে না। "পলকে প্রলয়" যদি কখন জ্ঞান হয় তবে এইরূপ প্রতীক্ষা করিয়া থাকি-বার সময়েই হইয়া থাকে। বিধুমুখীকে বিদায় দিয়া লালবিহারী বাবুর তাহাই অদ্য জ্ঞান হইতেছিল। মনে মনে মাতার উপর কত রাগ করিলেন তাহা বলা যায় না। প্রতীক্ষা করিতে করিতে তাহার নিদ্রাকর্ষণ হইল। লালবিহারী বাবু নিদ্রিত হইলেন। চিত্ত চাঞ্চল্য হেতু সে নিদ্রা অল্পক্ষণের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু লালবিহারী বাবুর বোধ হইল তিনি অনেকক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন। বিধুমুখী এখনও ফিরিয়া আইসেন নাই দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্বের রাগ দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। মাতাকে কি বলিয়া তাঁহার অন্যায় বুঝাইয়া দিবেন, কাহার দ্বারা বলাইবেন এই রূপ ভাবিতেছেন, এমন সময় হাসিতে হাসিতে বিধুমুখী লালবিহারী বাবুর শয়নাগারে প্রবিষ্ট হইলেন। লালবিহারী বাবু কহিলেন "এলে ?"

বিধুমুখী লালবিহারী বাবুর বিরক্তির প্রতি লক্ষ্য না করিয়া

কহিলেন “বাঁচলাম এমন দেশেও লোক থাকে? প্রণাম করে করে আমার ঘাড় ভেঙ্গে গেছে। আর এমনও দেশের কথা? এর এক বিন্দুও কি বোঝবার যো নেই? তুমি ভাই আমাকে বাড়ী পাঠিয়ে দাও যে দুটো কথা কয়ে বাঁচি।”

লালবিহারী বাবু কহিলেন “কি, ব্যাপারটা কি শুনি।”

বিধুমুখী সে কথায় জবাব না দিয়া কহিলেন “আচ্ছা তোমার কথা তো বেশ বুঝতে পারি, আর কারুর কথা বুঝতে পারি না কেন? তখন যদি জানতাম এমন দেশে আসতে হবে তা হলে কি—

বিধুমুখীর কথা শেষ না হইতে লালবিহারী বাবু কহিলেন “আবার সেই পুরাণো কথা তুলছো? এত সাদ্ধি সাধনা কোরলাম এত খোষামোদ কোরলাম তবু সেটা ভুলবে না? এখন আজ কি হলো তাই বলো।”

“আজ কি হলো তার কিছু বুঝতেও পারি নি, বোলতেও পারি না এক কথা এই যে তোমার হেড কেরানীর মা, সেরেস্তা-দারের পীসী, তোমার মুহুরীর খুড়ী এদের পায় প্রণাম করে করে আমার ঘাড় এখনও টাটাচ্ছে।

লালবিহারী বাবু এই কথা শুনিয়া কহিলেন “আচ্ছা তুমি একবার পাশের ঘরটায় যাও দেখি, আমি মাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি।”

বিধুমুখী পার্শ্বের কক্ষে প্রবেশ করিলে লালবিহারী বাবু মাতাকে ডাকিলেন। মাতা উপস্থিত হইলে কহিলেন “তোমার কি বুদ্ধি সুদ্ধি একবারে লোপ পেয়েছে!”

লালবিহারী বাবুর মাতা জড়সড় হইয়া কহিলেন "কেন বাবা আজ আবার কি হলো ?"

লালবিহারী জিজ্ঞাসিলেন "কে কে এসেছিল ?"

লালের মাতা। অন্য কেউ তো আসে নি। তোমার কাছারির হেড কেরাণীর মা, সেরেস্তাদারের পীশী,, পেস্কারের খুড়ী—

লাল। আর বউকে দিয়ে সকলের পায়েই প্রণাম করালে ?

লালের মা। হাঁ সকলকেই তো বউ মা প্রণাম করেছেন। কারুকে তো বাকী রাখেন নি ? আমি বুড় মানুষ বটে কিন্তু কেউ যে অকল্যাণ করে যাবেন কি শাঁপ দিয়ে যাবেন এমন কাজ আমি করিনে। লালবিহারীর মাতা ভাবিলেন যে সকলকে প্রণাম করা হয় নাই মনে করিয়া লালবিহারী বাবু রাগ করিয়াছেন। বিধুমুখী পাশের গৃহ হইতে শুনিয়া আর হাসি রাখিতে পারেন না।

লালবিহারী বাবু মাতার কথা শুনিয়া রাগত হইয়া কহিলেন "সকলকেই প্রণাম করিয়েছ খুব করেছো। আমার মাথা মুণ্ড তুমি কি লোকের কথাও এখন বুঝতে পার না ? আমি বোলছি যারা আমার চাকর, যারা আমার কাছে সমস্ত দিন দাঁড়িয়ে থাকে তাদের বাড়ীর লোককে আমার স্ত্রী প্রণাম কোরবে এটা অপমানের কথা না ?"

লালবিহারী বাবুর মাতা একটু থামিয়া কহিলেন "আমরা যা দেখেছি তার কি আর এখন কিছু নেই। তুমি কলিকাতায় যে বাবুদের বাড়ী রাঁদ্ধে আর পড়া শোনা কত্তে তারা তো

আমরা যখন গঙ্গাস্নান কোরতে গিয়ে তোমাকে দেখতে যেতাম তখনি প্রণাম কোরতো? তুমিও তো তাদের বাড়ী চাকরি কোরতে?

বারুদে আগুণ লাগিলে যেরূপ জ্বলিয়া উঠে মাতার কথা শুনিয়া লালবিহারী বাবু সেইরূপ রাগত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "যাও যাও তুমি এক্ষণই বেরোও, আমার বাড়ীতে তোমার যায়গা হবে না।" এই বলিতে বলিতে বিছানা হইতে উঠিয়া নক্ষত্র বেগে বাটীর বাহিরে চলিয়া গেলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

তদারকে।

পূর্ব্ব দিবসের স্থিরীকৃত পরামর্শ অনুসারে প্রত্যূষে রায় মহাশয়ের বাটীর একজন কার্য্যকারক থানায় খবর দিল বাবুর বাড়ীতে চুরি হইয়াছে। থানায় যাইবার পূর্ব্বে বৈঠক খানার একটী জানালার গরাদে ভাঙ্গিয়া রাখিয়া গেল। থানার দারগা রহিমুল্লা খাঁ কয়েক দিবস কোন মোকর্দ্দমা উপস্থিত না হওয়ায় অত্যন্ত অর্থ কষ্টে পড়িয়াছেন। ত্রিশ টাকা বেতন পান তাহাতে দশ বার জন পরিবার প্রতিপালন করিতে হয়। তিনটী ঘোড়া রাখিতে হয়। একখানা পালকী ও আট জন বেহারা রাখিতে হয়। এতদ্ভিন্ন সাত আট জন দাস দাসীর খোরাক পোশাক ও বেতন দিতে হয়। এমন অবস্থায় মাঝে মাঝে মফঃস্বল

তদারকে না যাইতে পারিলে যে কষ্ট হয় তাহা যাঁহারা পুলিসে কার্য্য করেন তাহারা ভিন্ন কাহারও বুঝিবার সম্ভাবনা নাই। বিশেষ সম্মুখে মহরম তাহাতেও খাঁ বাহাদুরের বাটীতে বিস্তর খরচ হইবে ও চিরকাল হইয়া আসিতেছে সুতরাং সে খরচ খর্ব্ব করিবার যো নাই। খাঁ সাহেব বিষম ফাঁপরে পড়িয়া অদ্য প্রাতে উঠিয়া নমাজ পড়িয়া তাহার বাটীর সম্মুখে পুষ্করিণীর বাঁধা ঘাটে চিন্তাকুল চিত্তে বলিতেছেন "আল্লা ভেজ, আল্লা ভেজ।" এমন সময় রায় মহাশয়ের বাটীর লোক গিয়া চুরির সংবাদ প্রদান করিল। ভাই সাহেব আহ্লাদে আটখানা। তখনি লোকটীকে তামাক দিতে বলিয়া আপনি বস্ত্রাদি পরিয়া সুসজ্জিত হইবার জন্যে গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন।

দারগা সাহেব বাহির হইয়া আসিলে কনেষ্টবল দিগের মধ্যে মহা হুলুস্থূলু পড়িয়া গেল, কে কে তাঁহার সহিত মফঃস্বলে যাইবে। সকলেই বেকার বসিয়া আছে, সকলেরই অর্থাভাব। অনেক তর্ক বিতর্কের পর বাছিয়া বাছিয়া পাঁচজন লইয়া দারগা সাহেব রায় মহাশয়ের বাটীতে যাত্রা করিলেন।

রায় মহাশয়দিগের বাটীতে পৌছিয়া দারগা সাহেব গ্রামের সমস্ত চৌকিদারদিগকে তলপ করিলেন। চৌকিদারেরা কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া পৌছিলে দারগা সাহেব সকলকে বাঁধিয়া ফেলিয়া জুতা মারিবার আদেশ করিলেন কেননা তাহারা রাত্রিতে চৌকি দেয় না। রাত্রে রীতিমত চৌকি দিলে চুরি হইবে কেন? চৌকিদারেরা অপমান ও নিগ্রহ নিবারণের জন্য নিজ নিজ সাধ্যমত কেহ চারি টাকা কেহ বা পাঁচ টাকা দিয়া

নিষ্কৃতি পাইল। অনন্তর তাহারা কেহ ঘৃত, কেহ পাঁঠা, কেহ চাউল ইত্যাদি দ্রব্য আহরণার্থ চতুর্দ্দিকে নিষ্ক্রান্ত হইল।

কনষ্টেবলেরা ইত্যবসরে গ্রামের মধ্যে যে যে লোকের প্রতি কখনও কোন সন্দেহ হইয়াছে তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া পৃথক পৃথক স্থানে বন্ধন করিয়া রাখিল। একে অন্যের কাছে যাইতে পারে না, কিন্তু সকলেই নিজ নিজ পরিবারাদির সহিত দেখা করিতে পায়। কেন পায় তাহা কে বলিবে?

এদিকে রায় মহাশয়, বটব্যাল ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় কিঞ্চিৎ দূরে সমবেত হইয়া আছেন এবং আগ্রহ সহকারে আর এক ব্যক্তির আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। দারগা সাহেব প্রয়োজনীয় সংখ্যক লোককে দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া রায় মহাশয়কে কহিলেন "কৈ মহাশয় যার প্রতি আপনার সন্দেহ হয়েছে তার বাড়ী নিয়ে চলুন।" রায় মহাশয় যে ব্যক্তির প্রতীক্ষা করিতেছিলেন সে এখন পর্য্যন্ত না আসায় রায় মহাশয় কহিলেন "দারগা সাহেব অনেকক্ষণ বকাবকি কোরেছেন, একটু তামাক খান, এই যাচ্ছি," এই বলিয়া ভৃত্যকে তামাক দিতে বলিলেন।

দারগা সাহেবের তামাক খাওয়া শেষ না হইতে হইতে লক্ষ্মণচন্দ্র গুপ্ত আসিয়া উপস্থিত হইল। লক্ষ্মণের বয়স ৩০।৩২, শ্যামবর্ণ, অপেক্ষাকৃত স্থূল, একটু বেঁটে, অত্যন্ত মিষ্টভাষী, কাহাকেও চটায় না, নিজেও কাহারও উপর চটে না। গালি দিলেও লক্ষ্মণকে রাগান যায় না। গ্রামে বিবাদ বিসম্বাদ যেখানে যাহা হইবেক লক্ষ্মণ তাহাতে মিশ্রিত থাকিবেই থাকিবে। লক্ষ্মণের বিষয় আশয় নাই, কোন ব্যবসায়ও নাই। ঝগড়া কলহে

থাকাই তাহার ব্যবসায় এবং তাহাতেই অক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করে। লক্ষ্মণকে সকলে জানিয়া শুনিয়াও লক্ষ্মণের সাহায্য লইতে হয় ও লক্ষ্মণকে প্রসন্ন রাখিবার জন্য অর্থ দান করিতে হয়। কোন মোকর্দ্দমা মামলায় যদি এক পক্ষে লক্ষ্মণকে না ডাকে লক্ষ্মণ অনাহূত অপর পক্ষে গিয়া উপস্থিত হইয়া তাহার সাহায্য করে। এই জন্যই রায় মহাশয় লক্ষ্মণকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন, এবং সে যতক্ষণ না আইসে ততক্ষণ কোন কার্য্য করিতে ইচ্ছা করেন নাই।

লক্ষ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় দারগা সাহেবকে ডাকিয়া প্রথমতঃ বৈঠকখানার জানলার গরাদে ভাঙ্গা দেখাইলেন। দারগা সাহেব দেখিয়াই লক্ষ্মণকে জনান্তিকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। দারগা সাহেবের সহিত যে লক্ষ্মণের আলাপ আছে তাহা বলা বাহুল্য। গ্রামস্থ সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদেই লক্ষ্মণ লিপ্ত থাকায় দারগা, বক্‌সি উকীল, মোক্তার ইত্যাদি অনেক লোকের সহিত তাহার আলাপ ছিল।

দারগা লক্ষ্মণকে ডাকিয়া বলিলেন "একটী গরাদে ভেঙ্গে একজন লোক প্রবেশ কোরতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রীলোকের অলঙ্কারাদি বৈঠকখানায় থাকা অসম্ভব। এরূপ মোকদ্দমা চালাইতে হইলে অধিক ব্যয়ের আবশ্যক। আমি যা বোল্‌ছি তা বুঝেছ? তুমি এসমস্ত কথা বাবুকে ভাল কোরে বুঝিয়ে বল!"

আপনি যা বলেছেন সে উচিত কথা। এ বিষয় বাবু অবশ্যই

বিবেচনা কোরবেন। এই বলিয়া লক্ষ্মণ, বাবু ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট গমন করিল।

মিথ্যা কথা সাজান কত কঠিন তাহা সকলে জানেনা। যাহারা সহজ মনে করে তাহারা কখন মিথ্যা মোকদ্দমা করে নাই। কোন না কোন দিক হইতে এমন ফাঁক বাহির হইয়া পড়ে যে অনেক দিনের পরিশ্রম, অনেক অর্থ ব্যয়, অনেক ভাবনা চিন্তা এক মুহূর্ত্ত মধ্যে সমস্তই মিথ্যা হইয়া যায়। একটী গারাদে ভাঙ্গিয়া যে একজন লোক প্রবেশ করিতে পারে না তাহা না রায় মহাশয়, না ভট্টাচার্য্য মহাশয় কাহারও হৃদয়ঙ্গম হয় নাই। এবং স্ত্রীলোকের ব্যবহারোপযোগী অলঙ্কারাদি যে বৈঠকখানায় থাকিবার কথা নহে তাহাও কেহ বিবেচনা করিয়া দেখেন নাই। যখন লক্ষ্মণ আসিয়া এই কথা বাবুকে ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিল তখন তাঁহারা যেন নিদ্রা ভঙ্গের পর গাত্রোত্থান করিলেন। রায় মহাশয়ের কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিল। খেলাপ এজাহারে পড়িলে কি ফল তাহা তিনি জানিতেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও চিন্তিত হইলেন। বটব্যালের হস্তে হুঁকা ছিল। তিনি তাড়াতাড়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে কহিলেন "হুঁকা নিন মহাশয়, আমার হঠাৎ অসুখ হয়েছে।" এই বলিয়া হুঁকা ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাতে দিয়া গাড়ুটী লইয়া বাহিরে গেলেন পরে গাড়ুটী হাতে করিয়া বাটী চলিয়া গিয়া একজন ভৃত্য দিয়া গাড়ু পাঠাইয়া দিলেন, নিজে আর সে দিবস রায় মহাশয়ের বাটীতে আসিলেন না।

অতঃপর ভট্টাচার্য্য ও বাবু উভয়ে পরামর্শ করিতে লাগিলেন।

স্থির হইল যত টাকা ব্যয় হয় করিবেন, কিন্তু দারগা সাহেবের দ্বারা এই দুইটী কথা উল্‌টাইয়া লইবেন। জানালার একটী গরাদে ভাঙ্গিয়া চুরি হইয়াছে একথা এখনও অধিক প্রকাশ হয় নাই, অনায়াসে বদলিয়া অন্য একরূপ করা যাইতে পারে। লক্ষ্মণকে এইরূপ ভাবের কথা বলিয়া দারগা সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

পুত্র শোক পাইলে যে কষ্ট না হয় লক্ষ্মনের প্রস্তাব শুনিয়া দারগা সাহেবের ততোধিক কষ্ট হইল। যত টাকা ইচ্ছা লইতে পারিতেন কিন্তু নিজের পায়ে নিজে কুঠার মারিয়া রাখিয়াছেন। যখন রায় মহাশয়ের বাটীর লোকে প্রথমে গিয়া পুলিসে খবর দেয় তখন ডায়রিতে জানলার একটা গরাদে ভাঙ্গিয়া অলঙ্কার চুরি হইয়াছে এই কথা লিখিয়া আসিয়াছেন। সে ডায়ারির নকল পুলিস সাহেবের নিকট গিয়াছে, এখন সে কথা বদল করিয়া আর কোন কথা লিখিবার যো নাই। ইহা অপেক্ষা আর অধিক আক্ষেপের বিষয় কি? ইহা অপেক্ষা অধিক মনস্তাপ আর কিসে হইতে পারে? যাহা হউক দারগা সাহেব এক্ষণে ঝোপ বুঝিতে পারিলেন, উপযুক্ত কোপ মারিতে পারিলেই হয়। বলা বাহুল্য যে পুলিসের লোক সে বিষয়ে কখন অজ্ঞতা প্রকাশ করে না। দারগা সাহেবও উপস্থিত ক্ষেত্রে সেরূপ করেন নাই। যতদূর পারিলেন কষিয়া লইয়া সকলে একত্র হইয়া নকড়ীর বাটী গমন করিলেন। লক্ষ্মণ টাকা কড়ির বিষয় স্থির করিয়াই সকলের পূর্ব্বে নকড়ীর বাটীতে গমন করি-

য়াছে। বাবুর বাটীতে যাহা পাইয়াছে তাহার উপর আর কি পাইবার সম্ভাবনা এই তাহার চিন্তা। কিন্তু নকড়ী নগদ কিছু দিলও না এবং ভবিষ্যতে যে কিছু দিবে তাহাও বলিল না। মোকদ্দমা চলিলে যে সমস্ত বিপদ হইবার সম্ভাবনা, জেল, জরিমানা ইত্যাদি এ সমস্তই লক্ষ্মণ প্রকাশ করিয়া নকড়ীকে সবিস্তারে জানাইল, এবং লক্ষ্মণকে কিঞ্চিৎ অর্থ দান করিলে এ সমস্ত বিপদ কখনই হইবার সম্ভাবনা নাই তাহাও বুঝাইয়া দিল, কিন্তু তথাপি নকড়ী ভুলিল না। সে চুরি করে নাই, তাহার কিছুই হইবেনা এই তাহার দৃঢ় বিশ্বাস। কাহাকেও এক পয়সা ঘুস দিবে না এই তাহার পণ। সুতরাং লক্ষ্মণ সেখানে কিছু পাইল না। দারগা সাহেব যথেষ্ট পাইয়াছেন, সুতরাং নকড়ীর নিকট কিছু পাইবার জন্য বিশেষ যত্ন করিলেন না। যথা বিধানে নকড়ীর প্রাঙ্গন খুঁড়িয়া অলঙ্কারাদি বাহির করিয়া গ্রামের পাঁচজন ভদ্র লোকের সমক্ষে লেখাপড়া করিয়া অলঙ্কার সহ নকড়ীকে চালান দিলেন।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আসামী চালান।

নকড়ী কোন বিপদ আপদে পড়িলে অথবা কোন মোকর্দ্দমা করিতে হইলে সর্ব্বদাই নলিনের নিকট পরামর্শ লইত। নলিন যে নিজে পরামর্শ দিত তাহা নয়। উকীল মোক্তার আমলা ইত্যাদি অনেকে নলিনকে স্নেহ করিত। নকড়ীর যখন যে রকম পরামর্শ দরকার নলিন তথন সেইরূপ লোকের নিকট হইতে আনিয়া দিত। নকড়ীর এটী একটী মহৎ জোর। এই জোর আছে বলিয়া নকড়ী এই উপস্থিত বিষয়ে কাহাকে ভয় করে নাই এবং লক্ষ্মণ ও দারগা উভয়ের কাহাকেও ঘুস দেয় নাই।

নলিনের নিকট হইতে এইরূপ সর্ব্বদা উপদেশ ও পরামর্শ পাওয়ায় নকড়ীর মোটা মুটী আইনের দু এক কথা শেখা ছিল। কিন্তু আইন এক রূপ, পুলিস আর এক রূপ। নকড়ীর শেখা ছিল সাক্ষীরা যাহা বলিবে, যাহারা সাক্ষ লইবে তাহাদের তাহাই লিখিতে হইবে, এবং স্পষ্ট দোষের প্রমাণ না হইলে কেহই তাহাকে হাজত দিতে

পারে না। যে রাত্রিতে চুরির কথা এজেহার হইয়াছিল সে রাত্রে নকড়ী বাহির হয় নাই একথা মঙ্গলা দ্বারা প্রমাণ হইল কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না। নকড়ীকে যথা বিধানে বন্ধন করিয়া দারগা সাহেব থানায় চালান দিলেন। লক্ষ্মণ চালান দিবার সময়ও নকড়ীকে কিছু খরচ করিতে কহিল। নকড়ী তখনও স্বীকার হইল না। লক্ষ্মণ কহিল "নকড়ী তুমি নিজ দোষে মোলে, বড় বন্ধু হয় গালে তুলে দেয়, কিন্তু না গিলিলে কার দোষ?"

যতক্ষণ নকড়ী বাড়িতে ছিল ততক্ষণ নকড়ীর মাতা কিছুই ভয় পায় নাই। কেবল সকলকেই গালি দিতেছিল। গরিব লোক আইন কানুন বোঝে না। আসামী, ফরিয়াদি, দারগা, বকসী ইহাদের নাম শুনিয়া ভয় পাইত, কিন্তু স্বচক্ষে জীবন্ত দারগা দেখে নাই। যখন দেখিল দারগাও সাধারণ মানুষের মতন তখন তাহার ভয় ঘুচিয়া গিয়া সাহস হইল। বিশেষ নকড়ী যে চুরি করে নাই ইহা সত্যই, তবে কেন দারগা তাহাকে ধরিবে? এই সাহসে ভর করিয়া সকলকে গালি দিতেছিল। কিন্তু যখন দেখিল নকড়ীকে দড়ী দিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল তখন উচ্চৈস্বরে কাঁদিয়া উঠিয়া মঙ্গলার দুই হস্ত ধরিয়া কহিল "মঙ্গল, এর উপায় কি বল। যদি এক শ টাকা লাগে তাও দেব, আমার নকড়ীকে এনে দে।"

মঙ্গল যদিও মামার দুঃখে দুঃখিত, তথাপি এই অবকাশে নিজের দুঃখ একটু প্রকাশ করিয়া লইল। মঙ্গলের

বিবাহের সম্বন্ধ অনেক দিন অবধি হইতেছিল। নকড়ী ৬০ টী টাকা খরচ করিলে বিবাহ হইয়া যাইত, কিন্তু নকড়ীর মাতা মঙ্গলের বিবাহের কথা উত্থাপন হইলেই নকড়ী কথা কহিবার পূর্ব্বেই কহিত "এত টাকা কোথায় পাব?" যেন তাহার হাতে কিছুই নাই। অদ্য যখন নকড়ীর মাতা এক শত টাকা দিতে স্বীকার করিল তখন মঙ্গল আর পূর্ব্বের কথা বিস্মৃত হইতে পারিল না। তাহার মনে বড় দুঃখ হইল। রাগ হইল না। একটা চাকর রাখিলে বাৎসরিক যে খরচ হয় মঙ্গলের বিবাহে সে খরচও হইবে না। মঙ্গল চাকরের অপেক্ষা অধিক কার্য্য করে। কিন্তু মঙ্গলের বিবাহের জন্য নকড়ীর মাতা সে খরচ করে নাই। মঙ্গল সেইজন্য মনোদুঃখে কহিল "আই এখন এক শ টাকা খরচ কোরতে পার, কিন্তু আমার বিয়ের জন্য তো ৬০ টী টাকা কখন দিতে পার নি।"

নকড়ীর মাতা বিপদে পড়িয়া জ্ঞানশূন্যপ্রায় হইয়াছে নহিলে যেরূপ কথা কহিল সেরূপ কহিত না। বলিল "আমার নকড়ীকে আমাকে এনে দে আমি তোর বিয়ে এক মাসের মধ্যে দিব।"

মঙ্গল এ কথা না হইলেও নকড়ীর উদ্দেশে যাইত। বস্তুতঃ সে নিতান্ত মনোদুঃখেই নিজের বিবাহের কথা বলিয়াছিল। অধিক বেলা হওয়া সত্বেও মঙ্গলা আর তিলার্দ্ধ গৌণ না করিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। খানিক দূর গমন করিয়া হঠাৎ থামিল। ভাবিল কোথায় যাইবে, কি করিবে, কাহার নিকট

পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মনে করিল নলিনের কাছে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। কিন্তু খরচ পত্র না লইয়া গেলে কি হইবে? অতএব পুনরায় বাটীতে আসিল। নকড়ীর মাতা মঙ্গলকে দেখিয়া হর্ষোৎফুল্ল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল "নকড়ী এসেছে?"

মঙ্গল যেজন্য ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা বলিল। তখন নকড়ীর মাতা কাঁদিতে কাঁদিতে মঙ্গলকে দশটী টাকা বাহির করিয়া দিল। মঙ্গল টাকা লইয়া প্রস্থান করিল।

মনোরমা নকড়ীর বিপদের কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি চিন্তিত হইয়াছিলেন। কিন্তু এতক্ষণ লোক জনের ভিড় থাকায় নকড়ীর বাটী যাইতে পারেন নাই। নকড়ীকে লইয়া সকলে চলিয়া গেলেই মনোরমা নকড়ীর মাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মনোরমাকে দেখিয়া তাহার কান্না দ্বিগুণ বাড়িল। মনোরমা বিস্তর প্রবোধ দেওয়ায় নকড়ীর মাতা কিঞ্চিত ঠাণ্ডা হইল। নকড়ীর মাতাকে প্রবোধ দিবার জন্য মনোরমা একটী গল্প করিলেন, সেই গল্পটী বর্ণনা করিয়াই এ অধ্যায় শেষ করা যাইবে। গল্পটীর মর্ম্ম এই যে পাপ না করিলে কখন ক্লেশ হয় না। যাহার পাপ নাই তাহার দুঃখ নাই, আর শত পাপীর মধ্যে একজন পুণ্যবান থাকিলে, সেই এক পুণ্যবানের জোরে শত পাপী বাঁচিয়া যায়। গল্পটী এই;—এক দিবস কোন স্থানের এক হাট হইতে অনেক লোক ফিরিয়া আসিতেছিল। কাল ধর্ম্মের সায়ংকালে দিঙ্মণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইয়া ভয়ানক ঝড়, বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত হইতে লাগিল। এই বিপদের সময় ১২জন লোক

রাস্তার নিকটবর্ত্তী এক দেবালয়ে আশ্রয় লইল। অনেকক্ষণ হইল কিন্তু বৃষ্টি ও বজ্রাঘাত থামে না। পরন্তু বোধ হইতে লাগিল যেন সেই দেবালয়ের চতুঃপার্শ্বেই প্রবল বজ্রাঘাত হইতেছে। তদ্দর্শনে দেবালয়ের অভ্যন্তরস্থ লোকে বিবেচনা করিল যে তাহাদিগের মধ্যে কাহারও না কাহারও পরমায়ু ফুরাইয়াছে। অতএব এই প্রস্তাব করিল যে এক জন করিয়া দেবালয়ের নিকটবর্ত্তী এক অশ্বথ বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া আসিবে। যাহার পরমায়ু শেষ হইয়াছে সেই বজ্রাঘাতে মরিবে। এই বার জনের মধ্যে এক ব্যক্তিকে লোকে হাবা বলিয়া ডাকিত। সে কাহারও সঙ্গে বিবাদ করিত না, কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না, কাহারও নিকট হইতে কিছু ফাঁকি দিয়া লইতে পারিত না। সকলেই তাহার সহিত প্রবঞ্চনা করিত, তাহাকে বোকা বলিত ও তাহার নিকট হইতে দ্রব্যাদি ঠকাইয়া লইত। সে এই প্রস্তাবে অসম্মত হইল। সে বলিল ঝড় বৃষ্টি চিরকাল থাকিবে না। ক্ষণকাল পরে থামিবে তখন সকলেই বাটী যাইতে পারিবে। কিন্তু তাহার কথায় সকলেই উপহাস করিল এবং কেহ হাবা কেহ বোকা বলিয়া তাহাকে বিদ্রূপ করিতে লাগিল। অনন্তর আর এগার জনের যে প্রস্তাব হইয়াছিল তদনুসারে এক এক জন করিয়া অশ্বথ বৃক্ষতলে গিয়া বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া ফিরিয়া আসিতে লাগিল। এই রূপ এগার জন বাহিরে গিয়া বৃক্ষ স্পর্শ করিয়া আসিল। এবার হাবার যাইবার কথা। ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত পূর্ব্ববৎ প্রবলবেগে হইতেছে। হাবা মনে করিল তাহারই পরমায়ু শেষ হইয়াছে। সে কোন মতেই বাহিরে

হইতে চাহে না। অপর এগার জন তাহাকে জোর পূর্ব্বক দেবালয় হইতে বাহির করিয়া দিল। হাবা তথন বৃষ্টিতে ভেজা অপেক্ষা বৃক্ষতলে যাওয়া ভাল মনে করিয়া অশ্বথ তলে গেল, অমনি দেবালয়ে অশনি পতন হইল ও তাহার অভ্যন্তরস্থ এগার ব্যক্তি এককালে প্রাণত্যাগ করিল। ঝড় বৃষ্টি থামিয়া গেল। একমাত্র হাবা প্রাণ লইয়া বাটী ফিরিয়া গেল।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

মোকর্দ্দমা পেশ।

মঙ্গল বাটী হইতে দ্বিতীয়বার নিষ্ক্রান্ত হইয়া রাস্তায় আর কোন স্থানে দেরি না করিয়া একেবারে লালবিহারী বাবুর বাটীতে উপস্থিত হইল। নলিন সকলের আহারাদি হইলে নিজে আহার করিয়া শুইয়াছে মাত্র এমন সময় মঙ্গলের স্বর শুনিয়া ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বাহিরে আসিল। দেখিল যথার্থই মঙ্গল উপস্থিত। বাটীর কুশল জিজ্ঞাসা করায় মঙ্গল সংক্ষেপে তাহার মাতুলের অবস্থার পরিচয় দিল। নকড়ীকে চোর বলিয়া বন্ধন করিয়া লইয়া গিয়াছে শুনিয়া নলিনের কি পর্য্যন্ত কষ্ট হইল তাহা বর্ণনাতীত। কিন্তু তথন কোন কথা না কহিয়া অথবা কোন আশ্বাস না দিয়া রন্ধনশালায় গিয়া মঙ্গলকে আহার্য্য দ্রব্য যাহা কিছু ছিল তাহা দান করিয়া অন্তঃপুরে চলিয়া গেল।

পাঠকবর্গ অবগত আছেন যে বিধুমুখী নলিনকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন। কলিকাতা হইতে আসিবার অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে নলিনের যাহাতে রন্ধন না করিতে হয় তাহা করিবেন কিন্তু এতক অন্য আর একজন ব্রাহ্মণ না পাওয়ায় সে প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে পারেন নাই। তথাপি নলিনের কষ্ট যত পারেন লাঘব করিয়া দিয়াছেন। নলিন সুখের দুঃখের কথা যখন যাহা উপস্থিত হইত বিধুমুখীর নিকট বলিত। অদ্য নলিন নকড়ীর কথা আদ্যোপান্ত বিধুমুখীকে কহিল। বিধুমুখী সমস্ত শুনিয়া যাহাতে নকড়ী খালাস হইয়া যায় তাহা করিবেন প্রতিজ্ঞা করিলেন। নলিন আশ্বস্ত হইয়া বাহিরে আসিয়া মঙ্গলকে সমস্ত কথা ভাঙ্গিয়া বলিল।

পরদিবস প্রত্যুষে বিধুমুখী নলিনকে ডাকাইয়া তথাকার ভাল ভাল উকীল যে দুই তিন জন ছিল তাহাদিগকে ওকালতনামা দিতে বলিলেন। নলিন এই পরামর্শ অনুসারে মঙ্গলকে সমভিব্যাহারে লইয়া গিয়া যথাবিধি ওকালতনামা দিল। অনন্তর মঙ্গল বাটী চলিয়া গেল। নলিন লালবিহারী বাবুর বাসায় অবস্থিতি করিতে লাগিল।

নিয়মিত দিনে লালবিহারী বাবুর কাছারীতে নকড়ীর মোকর্দ্দমা পেশ হইল। লালবিহারী বাবু ইতি পূর্ব্বেই মোকর্দ্দমার সমস্ত হাল অবগত ছিলেন। বাদির পক্ষের সাক্ষ্য লইয়া, প্রতিবাদির কোন কথা না শুনিয়াই মোকর্দ্দমা ডিসমিস করিয়া রায় মহাশয়কে এবং তাহার ভৃত্য দিননাথ ঘোষের নামে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার জন্য এক মোকর্দ্দমা উপস্থিত করিলেন!

কোথায় রাম রাজা হইবেন, না হইয়া বনে চলিলেন! রায় মহাশয় কোথায় নকড়ীকে জেলে দিয়া নিজে হাসিতে হাসিতে বাটী যাইবেন, তা না হইয়া নকড়ী হাসিতে হাসিতে বাটী গেল, তাঁহাকে হাজতে লইয়া চলিল। জামিন না দিলে খালাস হইবেন না। লালবিহারী বাবু অবিলম্বে সর্ব্বোৎকৃষ্ট উকীল যাহারা ছিল তাহাদিগকে ডাকিয়া পাঠাইলেন কিন্তু তাহারা সকলেই "নলিনের পক্ষে" ওকালতনামা লইয়াছে, বলিল। রায় মহাশয় শুনিয়া অবাক হইলেন। তখন তাঁহার প্রথম জ্ঞান হইল নকড়ী কি রূপে, ও কাহার দ্বারা মোকর্দ্দমার যোগাড় করিয়াছে। তখন নকড়ীর উপর যে রাগ ছিল তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণে নলিনের উপর রাগ হইল। রাবণ যেমন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যুদ্ধে জয়ী হইলে সর্ব্বাগ্রে বিভীষণকে শাস্তি দিবে রায় মহাশয়ও প্রতিজ্ঞা করিলেন উপস্থিত মোকর্দ্দমা হইতে উদ্ধার পাইলে নলিনকে শেখাইবেন।

রায় মহাশয় অপর একজন উকীলকে জামীন দিয়া নিজে ও ভৃত্য উভয়ে সেই দিবস বাটী চলিয়া আসিলেন।

এদিকে ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বটব্যাল, লক্ষ্মণ চন্দ্র গুপ্ত ইত্যাদি অনেকে রায় মহাশয়ের আগমন প্রতীক্ষা করিয়া রায় মহাশয়ের বৈঠকখানায় বসিয়া আছেন। সকলেই উৎকণ্ঠিত, সকলেই কি হইল শুনিবার জন্য ব্যাকুল। কিন্তু রাত্রি অধিক হইল অথচ কোন লোকও আইসে না, বাবু নিজেও আইসেন না। তামাক টানিতে টানিতে বটব্যালের নিদ্রাকর্ষণ হওয়ায় বটব্যাল হাই ছাড়িতেছে, ভট্টাচার্য্য মহাশয় অমনি তালে তালে তুড়ি দিতেছেন।

তুড়ি দিয়া দিয়া বিরক্ত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "বটব্যাল ভায়া একটু বেড়িয়ে এস।" বটব্যাল আঃ উঃ ইত্যাদি ব্যাকরণে যত উপসর্গ আছে তাহার প্রায় সকল গুলি উচ্চারণ করিয়া দেহরূপ গাধাবোটের নোঙর তুলিলেন। কিঞ্চিৎ অগ্রসর হই-য়াই জন কতক লোক আসিতেছে দেখিতে পাইলেন। অতঃপর কে আসিতেছে জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলেন যে এতক্ষণ পরে রায় মহাশয় ও তাঁহার সমভিব্যাহারিগণের "প্রবেশ" হইতেছে। অমনি তথা হইতে উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "ভট্চাজ্জি দা এঁরা এলেন।" বটব্যালের কথা শুনিয়া বৈঠকখানায় যে সমস্ত অমাত্যবর্গ সমবেত ছিলেন তাঁহারা সকলেই দরজার নিকট আসিলেন। পরে রায় মহাশয়ের দল নিকটবর্ত্তী হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন "সমাচার মঙ্গল তো?" কেহই উত্তর দিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় দ্বিতীয় বার জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি, সব ভাল তো?" এবার উত্তর ছলে রায় মহাশয় কহিলেন "হু, বোলছি।"

একটু পরে আগন্তুক ও বৈঠকখানার দল উভয়ে সম্মিলিত হইয়া, নিঃশব্দে বৈঠকখানায় প্রবেশ করিলেন। বৈঠকখানার নিকটবর্ত্তী গৃহে রায় মহাশয়ের বাটীর স্ত্রীলোক পরম্পরা আসিয়া জানলার দ্বারে দাঁড়াইয়াছে। সকলেই ব্যগ্র, কেহ কিছু বলি-তেছে না, কেহ যেন জোরে নিঃশ্বাস ছাড়িতেছে না।

সকলে বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় দীপা-লোকে দেখিলেন রায় মহাশয়ের মুখ ম্লান, চক্ষু দীপ্তিহীন, ওষ্ঠাধর শুষ্ক। দেখিয়া আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের

সাহস হইল না। বটব্যাল চক্ষু মুদ্রিত করিয়াই থাকেন সুতরাং এ সমস্ত দেখিতে পান নাই। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "খবর কি?"

রায় মহাশয়ের চক্ষু হইতে বাস্পবারি বিগলিত হইতে লাগিল। কথা কহিতে চেষ্টা করিলেন বাক্য নিঃসরণ হইল না। তদ্দর্শনে তাঁহার সমভিব্যাহারী একজন সমস্ত বৃত্তান্ত খুলিয়া বলিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শুনিয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া "হরি, হরি" বলিয়া চুপ করিলেন, লক্ষ্মণ চুপে চুপে তথা হইতে নিজ বাটী প্রস্থান করিল। বটব্যাল কহিলেন "এখন উপায়?"

ক্ষণকাল কেহ কিছু বলিল না। পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "আর ভদ্র লোকের জাত মান বাঁচান ভার হ'ল ইতর লোকে এরূপ প্রশ্রয় পেলে সর্ব্বনাশ হবে। সকলি কালের ধর্ম্ম! কলির শেষ উপস্থিত! আরও যে কি হবে বলা যায় না! ধর্ম্ম কর্ম্ম তো একেবারে লোপ হয়েছে। একোদ্দীষ্ট শ্রাদ্ধ আর কেহই করে না। আদ্যশ্রাদ্ধ না কোরলে নয় বোলেই অদ্যাপি লোকে কোরছে। দিনকতক পরে তাও উঠে যাবে। কলির প্রভাবে কিছুই থাকবে না।"

সকলেই বিষাদে পরিপূর্ণ, শোকে মগ্ন, অপমানে দুঃখে মৃতপ্রায়। সুতরাং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শেষ হইলে, আর কেহ কিছু বলিল না

বটব্যাল ভায়ার দু একবার নাসিকা ধ্বনি হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তচ্ছ্রবণে কহিলেন "বটব্যাল ভায়া রাত্রি অধিক হ'ল, চল বাড়ী যাই।" পরে সকলের প্রতি দৃষ্টি করিয়া

কহিলেন "আমার ছোট কন্যাটী অদ্য অত্যন্ত পীড়িত, এখানে না এলে নয়, তাই এসেছিলাম, এক্ষণে অদ্যকার মতন বিদায় হই, কল্য এসে এ বিষয়ের যা সৎপরামর্শ হয় তা করা যাবে।"

সভা ভঙ্গ হইল, যে যাহার আবাসে চলিয়া গেল। ম্লান মুখে চিন্তাকুল চিত্তে রায় মহাশয় বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

শনিবার, নলিনের ছুটি লইবার দিন।

লালবিহারী বাবুর আদালতে মোকর্দ্দমা শেষ হইলে নকড়ী, মঙ্গল ও নলিনের আর আনন্দের সীমা রহিল না। হুকুম হইবার পরেই নকড়ী পাঁটা কিনিয়া নিকটবর্ত্তী কালীর মন্দিরে বলিদান করিল। নলিন সেই সমভিব্যাহারে ছিল। তিন জনে হাসিতে হাসিতে সিন্দুর চন্দন বিভূষিত ও পুষ্প মাল্যে বিমণ্ডিত হইয়া দেবালয়ে হইতে বাহিরে আসিল।

অদ্য শনিবার। নিয়মানুসারে অদ্য নলিনের বাটী যাইবার দিন। কিন্তু মোকর্দ্দমার কি হয় না হয় পূর্ব্বে না জানায় নলিন লালবিহারী বাবুর নিকট ছুটী লয় নাই। যখন মোকর্দ্দমা জীত হইল এবং নকড়ী ও মঙ্গল উভয়ে বাটী যাইতে

উদ্যত হইল তখন নলিন বিধুমুখীর নিকটে গিয়া কহিল "দিদি আজ আমি ছুটী লই নাই, কিন্তু ছুটী চাইলে আজ পেতাম। আজ আমার বাড়ী যাবার দিন। কেবল নকড়ীর কি হয় এই ভয়ে বাবুকে কিছু বলি নাই। এখন নকড়ী বাড়ী যাচ্চে, যদি আপনি অনুগ্রহ করে আমাকে বিদায় দেন তবে আমিও নকড়ীর সঙ্গে যাই। নকড়ীর মাতা আমাদের একত্র দেখলে বড় খুসি হবে। আমরা সকলেই গরিব মানুষ। পরস্পর যার যে রূপ সাধ্য সাহায্য কোরে থাকি। নকড়ী আমাকে যে কত ভাল বলেছে তা বল্‌তে পারিনে। আপনাকে যে কত আশীর্ব্বাদ করেছে তাহা এক মুখে বলা যায় না।"

বিধুমুখী কহিলেন "তা যাবে, সচ্ছন্দে বাড়ী যাও। কিন্তু দাদা, আমাদের ছেড়ে যেতে কি তোমার মনে কোন দুঃখ হয় না? তোমার দিদি তোমাকে ভাল বাসে সত্য, কিন্তু আমি যে ভাল বাসি তা কি তুমি টের পাওনা? তুমি যে পরিশ্রম কোরছ তা কি আমি জানি না? আমার প্রতিজ্ঞাও আমি ভুলি নাই, কিন্তু দাদা, আর একজন লোক না পেলে আমি কি করি? তুমি মনে কর আমি তোমাকে চাকরের মতন দেখি। কিন্তু যদি আমার অন্তরে প্রবেশ হতে পারতে, যদি আমার মনের কথা টের পেতে, যদি অন্তঃকরণ কেটে দেখাবার হ'ত তা হলে টের পেতে তোমার আপন দিদি আমা অপেক্ষা তোমাকে বেশী স্নেহ করেন না।

নলিন বিধুমুখীর কথা শুনিয়া আর নিজে কথা কহিতে পারিল না। অমনি ভূমিসাৎ হইয়া বিধুমুখীর চরণযুগল ধারণ

করিয়া কাতরস্বরে কহিল "আপনি যা কোরেছেন, তা আমি জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিতে পারব না। আপনি যে আমাকে স্নেহ করেন তা কি আমি জানি না। কিন্তু আপনি অনুগ্রহ করে আমায় দিদি বলতে দেন। যদি আপনি কিছু না বোলতেন তা হলে আমি আপনাকে মা বলে ডাক্‌তাম। জন্মাবধি আমি মাতার ধার ধারি না। আমাকে শৈশবাবস্থায় রেখেই তিনি মরেন। আমার বাপ মা সকলেই আমার ভগ্নী। ভগ্নী বোলে ডাকলে আমার যত সুখ হয় অত আর কিছুতেই হয় না। পরমেশ্বর বুঝি গরিবের দুঃখে দুঃখিত হয়ে আপনাকে বোলে দিয়েছিলেন এই অনাথকে ভাই বোলো। তা নৈলে আমার এত সুখ হবে কেন? আমি রাজ্য পদ পেলে যে সুখী না হ'তাম আপনাকে দিদি বোলে আমার সে সুখ হয়। তবে বাড়ী যেতে চাই কেন যদি জিজ্ঞাসা করেন তবে এই মাত্র নিবেদন করি, আমি আপনাকে ভক্তি করি বটে, কিন্তু আরও অনেকে আছে যারা আপনাকে ভক্তি করে। আমা অপেক্ষা যে বেশী ভক্তি করে তা নয়। আমি কায়মনোবাক্যে যতদূর পারি আপনার পূজা করি ও করিব, পরমেশ্বর জানেন আমার কথা সত্য কি না, কিন্তু এক কথা এই আপনাকে এত লোকে ভক্তি করে কিন্তু আমার দিদিকে আমি ছাড়া আর কেহই ভক্তি করে না। আমি যদি না মাঝে মাঝে যাই তাহা হ'লে দিদির যে কি কষ্ট হয় তা যদি আপনি জানতে পারতেন—" এতদূর বলিয়া নলিন কাঁদিয়া ফেলিল, আর কথা কহিতে পারিল না।

বিধুমুখী নিজের হস্তে নলিনের হস্তধারণ করিয়া কহিলেন "দাদা, আমি যা বোলেছি তা কিছু মনে কোরো না। দেবতাদের কাছে প্রার্থনা করি জন্মান্তরে যেন তোমার মতন ভাই পাই তা হলে আর কিছুই চাই না।"

নলিন কহিল "আমি গরিব মানুষ, বিশেষ আপনার চাকর আমার কাজ কর্ম্মে আপনি যদি খুসি হ'য়ে থাকেন তা হ'লেই যথেষ্ট। তদ্ভিন্ন আর যা বোলেছেন সে কেবল আপনার নিজগুণে।"

বিধুমুখী। ছি নলিন, ঐ কথা আবার বোলছো? তুমি আমার চাকর? আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হয় নাই বোলেই বুঝি তিরস্কার কোরছ? নলিন কাতরস্বরে কহিল "আমি কি বোলব? আপনি কৃপা কোরে আমাকে ভাই বলেন, তা বলে কি আমি চাকর মনিব সম্পর্ক বিস্মৃত হ'তে পারি?"

বিধুমুখী। তা তোমায় বিস্মৃত হইতেই হবে। যদি তুমি আমাকে যথার্থ তোমার দিদির মতন মনে কর তবে আর অমন কথা মুখের আগায় এন না। আর যাতে না আনতে হয় তা আমি কোরবো। আজ শনিবার, তুমি সোমবারে ফিরে আসবে। যদি সোমবারের মধ্যে অন্য ব্রাহ্মণ না পাই তবে আমি নিজেই রাঁধবো, তোমার কষ্ট কোরতে হবে না?

নলিন। তা হলে আমার সর্ব্বনাশ হবে। মাসে মাসে যে চারটী টাকা দেন তাতেই আমার ও আমার দিদির ভরণ পোষণ সমস্ত হয়। যদি আপনি রন্ধনাদি করেন তবে বাবু আমাকে রাখবেন না।

বিধুমুখী। সে জন্য ভয় নাই। যাতে তোমার কোন কষ্ট না হয়ে তোমার ভরণ পোষণ হয় তাতে তো তোমার কোন আপত্যী নেই ?

নলিন। আমি সামান্য লোক আমার কথা ধোরবেন না। আপনার অনুগ্রহ কথা শুনে আমি যেন আর আমাতে নেই। দূর হইতে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিয়া কহিল "আপনি আমার মা, আপনি আমার দিদি, আমাকে আর অধিক বোলবেন না। আপনার কৃপা আমি জন্ম জন্মান্তরেও ভুলতে পারবো না। আমি আপনার ভৃত্য। আমি আর কিছুই চাই না। আপনার যা ইচ্ছা তাই করুন। আমি আপনার ক্রীত দাস। আমার বাড়ী ঘর দুয়ার সকলেই আপনার পদে। আমি বাড়ী যেতে চাই না, কাহারও সহিত দেখা কোরতে চাই না। আপনি আজ থেকে যা বোলবেন তাই কোরব, যা নিষেধ কোরবেন তা কোরব না।

নলিনের কথা শুনিয়া বিধুমুখী ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ক্ষণকাল পরে ক্রন্দন সম্বরণ করিয়া বলিলেন "নলিন, যা বলেছ ঠিক বটে, আমার অনেক লোক আছে, অনেকে আমাকে আদর করে, অনেকে আমার কথা শোনে কিন্তু তোমার সেই একমাত্র ভগ্নী ছাড়া আর কেউ নাই। যাও তুমি স্বচ্ছন্দে বাড়ী যাও। তোমার ভগ্নীকে আমার শত শত আশীর্ব্বাদ জানাইও। আর একটী কথা আমার কাছে প্রতিজ্ঞা কোরে যাও যে সুবিধা হ'লে একবার মনোরমাকে আমাকে দেখাবে।

নলিন। সে কি ? প্রতিজ্ঞা কোরতে হবে কেন ? তবে দিদিকে যদি এখানে নিয়ে আসি তবে কত লোক কত কথা

বোল্‌বে—নলিন আর কথা কহিতে পারিল না। তখন বিধুমুখী কহিলেন "আমি ত তা বলি নি, তা বলি নি। যদি আমি কখন তোমাদের বাড়ীতে যাই তবে নিয়ে যাবে কি?"

একবিংশ পরিচ্ছেদ।

নলিন বিধুমুখীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া বিমর্ষ চিত্তে লালবিহারী বাবুর বাসা হইতে বাহির হইল। তাহার আপন ভগ্নী ভিন্ন নলিনকে এত মিষ্ট কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলে নাই, নলিন তাহাই ভাবিতে ভাবিতে চলিতেছে। তাহার যে দুই চক্ষু হইতে অশ্রু ধারা পড়িতেছে তাহা টের পায় নাই। এমন সময় লালবিহারী বাবু কাছারী হইতে বাটী আসিতেছেন। নলিনের সাশ্রুনয়ন ও ব্যাগ হাতে দেখিয়া লালবিহারী বাবু হঠাৎ চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নলিন কাঁদ্দে কাঁদ্দে কোথায় যাচ্ছ?" তাঁহার বোধ হইল যেন নলিনকে কেহ গালি দিয়াছে, নলিন সেই জন্য রাগ করিয়া যাইতেছে, অথবা বাটীতে গৃহিণী তাহাকে কার্য্যচ্যুত করিয়া দিয়াছেন।

লালবিহারী বাবুর কথা শুনিয়া—নলিন চমকিয়া দাঁড়াইল। কহিল "আমি আজ বাড়ী যাচ্ছি। নকড়ী আমাদের প্রতিবাসী, সে যাচ্ছে সেই সঙ্গে আমিও যাব। আপনার নিকট ছুটী নি নাই, কিন্তু বাড়ীর মধ্যে বলে এসেছি। তিনি অনুমতি করেছেন তাই যাচ্ছি।"

লালবিহারী। কাঁদ্‌ছো কেন?

নলিন লজ্জিত হইয়া কহিল "কাঁদি নাই, চোকে কি পড়েছিল বোধ হয় তারই জন্য জল পড়েছে।" এই বলিয়া নলিন উত্তরীয় বস্ত্র দিয়া চক্ষুর জল মুছিয়া ফেলিল।

লালবিহারী বাবু আর কিছু না বলিয়া প্রত্যহ যেরূপ একেবারে আপনার শয়নাগারে যান অদ্যও সেইরূপ গমন করিলেন। তাঁহার শয়নাগারের একটী জানালা দিয়া সম্মুখের রাস্তা দেখা যায়। বিধুমুখী সেই জানালায় বসিয়া সাশ্রুলোচনে চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন। লালবিহারী বাবুর পদধ্বনি তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হয় নাই। সুতরাং বিধুমুখী পূর্ব্বাবস্থাতেই রহিলেন।

লালবিহারী বাবু অগ্রসর হইয়া কহিলেন "কি হয়েছে? একেবারে বাহ্যজ্ঞান শূন্য যে? এই বলিতে বলিতে নিজেও সেই জানালার নিকট গমন করিলেন। বিধুমুখী হঠাৎ মুখ ফিরাইলেন। লালবিহারী বাবু দেখিলেন বিধুমুখীর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিতেছে। অমনি তাঁহার নলিনের ক্রন্দনের কথা স্মরণ হইল। মুখ তুলিয়া দেখিলেন সম্মুখে নলিন রাস্তা দিয়া যাইতেছে। এখনও তাঁহার বাটীর সম্মুখের রাস্তা অতিবাহিত করিয়া দৃষ্টির বহির্ভূত হইতে পারে নাই।

লালবিহারী বাবু গৃহে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বক্ষণেই নলিনকে কাঁদিতে দেখিয়া আসিয়াছেন। নলিন যে রাস্তায় যাইতেছে সেই রাস্তার প্রতি একাগ্র দৃষ্টি করিয়া বিধুমুখী কাঁদিতেছেন। নলিনকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কাঁদিতেছে এ কথা

স্বীকার করে নাই। বিধুমুখীকে ক্রন্দনের কারণ জিজ্ঞাসায় বিধুমুখী কহিলেন "সে আবার কি কথা, কাঁদবো কেন? বস্তুতঃ নলিন ও বিধুমুখী উভয়েরি চক্ষু হইতে জল পড়িতেছিল কিন্তু চিন্তায় নিমগ্ন থাকায় উভয়ের কেহই তাহা জানিতে পারে নাই। কেহই স্বীকার করে নাই যে কাঁদিতেছে।

দেখিয়া শুনিয়া লালবিহারী বাবুর মনে যে কি ভাব হইল তাহা অনুভূত হইতে পারে কিন্তু বর্ণনা করা যায় না। তাঁহার সর্ব্ব শরীর ঘুরিতে লাগিল, মুখ ম্লান হইল চক্ষু, মুখ, কান হইতে অগ্নি বাহির হইতে লাগিল, হস্ত পদ কাঁপিতে লাগিল, কপালে ঘর্ম্ম ছুটিল, লালবিহারী বাবু হঠাৎ পর্য্যঙ্কের এক পার্শ্বে বসিয়া পড়িলেন। বিধুমুখী তদ্দর্শনে ভীতা হইয়া জিজ্ঞাসিলেন "তোমার মুখ অমন হয়ে গেল কেন?"

লালবিহারী বাবু অতি কষ্টে উত্তর করিলেন "হঠাৎ মাথা ঘুরে উঠ্‌লো।"

বিধুমুখী নিকটবর্ত্তী আলমারি হইতে ল্যাবেণ্ডারের শিশি খুলিয়া একটু ল্যাবেণ্ডার লালবিহারী বাবুর মাথায় দিতে গেলেন। লালবিহারী বাবু জোর পূর্ব্বক বিধুমুখীর হস্ত সরাইয়া কহিলেন "আর কাজ নাই, একটু পরেই ভাল হবে এখন।" তখন তিনি একখানি পাখা আনিয়া লালবিহারী বাবুর গায়ে বাতাস দিতে গেলেন। লালবিহারী বাবু তাহাও দিতে দিলেন না। তখন বিধুমুখী নিজ হস্তে লালবিহারী বাবুর চাপকান খুলিতে গেলেন। লালবিহারী বাবু বিধুমুখীর হস্ত সজোরে নিজের চাপকান হইতে সরাইয়া দিলেন।

বিধুমুখী বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার আজ হ'য়েছে কি ?"

লালবিহারী। যা অদৃষ্টে ছিল ?

বিধু। বলি সে কি ? ভেঙ্গেই বলনা ?

লালবিহারী বাবু কোন উত্তর না দিয়া তাড়াতাড়ি বস্ত্রাদি ত্যাগ করিয়া বাহির বাটী গমন করিলেন।

যে দ্রব্যের অনুসন্ধান করা যায় তাহা পাইলেই লোকের আনন্দ হয়। কিন্তু এরূপ জিনিসও আছে যাহার জন্য কেহ কেহ যৎপরোনাস্তি অনুসন্ধান করে। অনুসন্ধান করিয়া যদি না পায় তাহা হইলে আহ্লাদের সীমা থাকে না, পাইলেই অপার দুঃখ উপস্থিত হয়। লালবিহারী বাবু কাছারি হইতে আসিবার সময় বাটীর বাহিরে নলিনকে ও বাটীর অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিধুমুখীকে দর্শনাবধি এই দ্রব্যের অনুসন্ধানে নিয়োজিত হইলেন। দ্রব্যটী কি তাহা পাঠকবর্গ জানিতে পারেন।

"আপনার মান আপনার ঠাঁই" এই প্রবাদ। প্রবাদ যে সত্য তদ্বিষয়ে কাহারও সন্দেহ হইবার কথা নহে।

নিজের জিনিস লোকে যেরূপ যত্ন করে তত আর কেহই করে না। লোকের মান লোকের বিবেচনায় সর্ব্ব প্রধান জিনিস। সুতরাং সকলেই নিজের মান রক্ষার্থে যতদূর যত্ন সম্ভব তাহা করিয়া থাকে। অনেকে এরূপ যত্ন করিয়াও নিজের মান রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না।

নিজের মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার অপরের হস্তে ন্যস্ত হইলে তাহা কিরূপে সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা তাহা সকলেই অনুভব করিতে পারেন।

পুরুষের মান সম্ভ্রম রক্ষার ভার অপর পুরুষের হস্তে পড়া নিতান্ত মন্দ নহে। পুরুষ বুদ্ধিমান, বলবান, বিবেচক। কিন্তু স্ত্রীলোকের হাতে পড়িলে? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি কম, বল কম, বিবেচনা কম, বাটীর বাহিরে যায় না, লোকে কোন বিষয়ে কি বলে শুনে না, জানে না। এরূপ অবস্থায় স্ত্রীলোকের করে মান সম্ভ্রম কিরূপ সংরক্ষিত হইবার সম্ভাবনা। লালবিহারী বাবুর হঠাৎ এই কথা মনে হইয়া তাঁহার মান সম্ভ্রম সংরক্ষিত হইতেছে কি না তাহার অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। যেরূপ দেখিলেন (অর্থাৎ বাটীর বাহিরে এবং অভ্যন্তরে) তাহাতে যে রক্ষিত হয় নাই ইহাই ভাবিয়া লইলেন। এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইতে হইলে প্রমাণ আবশ্যক। সেই প্রমাণ অনুসন্ধান করা লাল-বিহারী বাবুর প্রধান উদ্দেশ্য হইল।

লালবিহারী বাবুর মনের সুখ চিরকালের জন্য অন্তর্হিত হইল। আহারে, বিহারে, শয়নে, উপবেশনে এক্ষণে তাঁহার একই ভাবনা। লোকে কথা কহিতেছে, লালবিহারী বাবু শুনিতেছেন। ক্ষণকাল শুনিয়া অন্যমনস্ক হন আর কিছুই বুঝিতে পারেন না। গল্পের খেই হারাইয়া ফেলেন, আবার সমস্ত আদ্যোপান্ত না শুনিলে কোন উত্তর দিতে পারেন না। অন্যান্য স্থান অপেক্ষা কাছারিতে ইহার দরুণ অত্যন্ত অসুবিধা হইত। কোন লেখা পড়িতে পড়িতে অন্যমনস্ক হওয়ায় পুনরায় আবার তাহা আদ্যোপান্ত পড়িতে হয়। উকীলদিগের বক্তৃতা শুনিতে শুনিতে অন্যমনস্ক হওয়ায়, আবার আদ্যোপান্ত শুনিতে হয়। এই হেতু তাঁহার নিজের আমলাদিগের ও উকীল মোক্তারগণের

সকলেরি বিরক্ত জন্মিয়া উঠিল। এ দিকে যে দিবসের কার্য্য সে দিবস না হওয়াতে কর্ম্ম বাকি পড়িতে লাগিল, আসামী ফরিয়াদি, সাক্ষী অকারণে নিত্য নিত্য আসিতে যাইতে হয় বলিয়া এবং তন্নিবন্ধন খরচের বাহুল্য জন্মায় এই সকল কারণে অসন্তুষ্ট হইতে আরম্ভ করিল। মুলতবী কাজের জন্য কালেক্টর সাহেব কড়া কড়া চিঠী লিখিতে লাগিলেন। মোকর্দ্দমা করিতে দেরী হওয়ার কারণ তাঁহার বিপক্ষে বেনামি দরখাস্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। সংক্ষেপত লালবিহারী বাবুর আর মানসিক কষ্টের সীমা রহিল না।

যতক্ষণ বাটীতে থাকেন লালবিহারী বাবু নিয়ত নলিন কখন কোথায় থাকে তাহারই অনুসন্ধানে ব্যস্ত থাকেন। যাই দেখিতে পান নলিন বাটীর মধ্যে গমন করিয়াছে অমনি নিজেও বাটীর মধ্যে গমন করেন। তাঁহার হৃৎপিণ্ড ধক ধক করিয়া কাঁপিতে থাকে, হস্ত পদও কম্পিত হয়, মুখ চক্ষু প্রায় রক্ত শূন্য দেখায়। ভাবেন, কি না জানি দেখিব। কিন্তু কিছুই মন্দ না দেখিয়া অপেক্ষাকৃত হর্ষোৎফুল্ল হইয়া ফিরিয়া আইসেন। কাছারি থাকিতে থাকিতেও এইরূপ কখন কখন করিতে আরম্ভ করিলেন। বিধুমুখীকে বলিয়া যান যে নিয়মিত যে সময় বাটী প্রত্যাগমন করেন অদ্য সে সময় আসিতে পারিবেন না। বৈকালিক আহার্য্য দ্রব্য কাছারি পাঠাইয়া দিতে বলেন। কিন্তু সে দিবস নিয়মিত সময় পর্য্যন্ত থাকা দূরে থাকুক তাহার দু তিন ঘণ্টা পূর্ব্বেই ফিরিয়া আইসেন। রাস্তায় আসিবার সময় মন যে কিরূপ হয়, তাহা বলা দুঃসাধ্য, কিন্তু বাটী আগমন করিয়া যাহা

দেখিতে আসিয়াছেন তাহা না দেখিতে পাইয়া অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হন।

পূর্ব্বে সন্ধ্যার পর লালবিহারী বাবু কোন দিন মুনসেফ বাবুর বাসায়, কোন দিন ডাক্তার বাবুর বাসায়, কখন কখন বা ছোট আদালতের জজ বাবুর বাসায় যাইতেন কিন্তু এক্ষণে আর কাছারি হইতে বাটী আসিয়া কাহারো বাসায় যান না। সকলে তামাসা বিদ্রূপ করে, লালবিহারী বাবু অসুখ হইয়াছে বলিয়া কাটাইয়া দেন। বস্তুতঃ ভাবিয়া ভাবিয়া লালবিহারী বাবুর শরীর শীর্ণ হইয়াছে, অন্নে রুচি কমিয়াছে, দেহের শক্তির হ্রাস হইয়াছে। ডাক্তার বাবুর ঔষধ সেবন করেন কিন্তু কিছুই ফল দর্শে না।

বিধুমুখী লালবিহারী বাবুর মনের ভাব কিছুই জানেন না। তিনি সরল ও নির্ম্মল-হৃদয়া, তাঁহার মনে কোনও গোল নাই। নিত্য নিত্য নলিনের যাহাতে আর রন্ধন কার্য্য না করিতে হয় তাহারি জন্য লালবিহারী বাবুর নিকট অনুরোধ করেন। লালবিহারী বাবুর মনাগুণ তাহাতে শতগুণ বৃদ্ধি হয় তাহার কিছুই জানেন না। লালবিহারী বাবুর রাত্রে নিদ্রা হয় না। বিধুমুখীর যখন চৈতন্য হয় তখনি লালবিহারী বাবু শয্যায় এপাশ ওপাশ করিতেছেন দেখিতে পান। লোকে বলে মনের আনন্দ অপরকে বলিলে সে আনন্দ বৃদ্ধি হয়, মনের কষ্ট অপরকে জানাইলে সে কষ্টের লাঘব হয়। কিন্তু লালবিহারী বাবুর কষ্ট কাহাকে জানাইবার যো নাই, কাহারও কর্ণে তাহার বাষ্পমাত্রও প্রবিষ্ট করাইবার কথা সে নহে। নিজের মনাগুণে

দিবা রাত্রি জ্বলিতে লাগিলেন। এতদিনে মনে হইল দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ কি ভয়ানক ? যদিও দ্বিতীয় পক্ষে বিবাহ করিলেন তবে কলিকাতায় করিলেন কেন ? বিধুমুখী তাঁহাকে স্পষ্ট বাঙ্গাল বলিয়া ঠাট্টা করিয়াছে। তাঁহার দেশের কথা বুঝিতে পারে না বলিয়াছে। ইহা অপেক্ষা তাঁহাকে বিধুমুখী আর কিরূপে ঘৃণা করিবে ? দেশে বিবাহ করিলে কি বিধুমুখীর ন্যায় পাত্রী পাইতেন না ? অভাব কি ? অনায়াসে পাইতে পারিতেন। অনেক স্থান হইতে প্রস্তাবও আসিয়াছিল। কিন্তু সে সব প্রস্তাব তখন গ্রাহ্য করেন নাই। এই কি তাহার প্রতিফল ?

লালবিহারী বাবু নিয়ত এইরূপ চিন্তায় নিমগ্ন থাকেন। কখন কখন মনে করেন নলিনকে তাড়াইয়া দিবেন। আবার ভাবেন পাঁচজনে জিজ্ঞাসা করিলে তাহায় কোন দোষে তাড়াইয়াছেন বলিবেন। নলিন দেখিতে অতি সুপাত্র, সকলেই নলিনকে ভাল বাসে, হঠাৎ তাহাকে জবাব দিলে লোকের মনে সন্দেহ জন্মিবে। আরও এক কথা মনে হইল। নলিনকে তাড়াইয়া দিলে দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু বিধুমুখীকে কি করিবেন ? ভ্রষ্টা রমণীর সহিত কি সহবাস করিবেন ? আর যে একবার ভ্রষ্টা হইয়াছে সে কি আর ভাল হইতে পারে ? পরক্ষণেই আবার ভাবেন ভ্রষ্টাই বা বলি কেন ? কোনও তো প্রমাণ পাই নাই ? অতএব আর দিন, কতক থাকিয়া প্রমাণ অনুসন্ধান করা যাউক। লালবিহারী বাবুর এইরূপেই কতক দিন গেল, কোনও প্রমাণ পাইলেন না। কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্ত সুস্থির হয় না। অতঃপর কি করিলেন পরে জানিতে পারা যাইবে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মামা ভাগিনেয়।

নলিনের সহিত লালবিহারী বাবুর দেখা হইবার পর তিনি অন্তঃপুরে যাহা গিয়া দেখিলেন ও তাহাতে তাঁহার চিত্তে কিরূপ ভাবের আবির্ভাব হইল তাহা পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছেন। নির্ব্বিকার-চিত্ত নলিন তদনন্তর নকড়ীর বাসায় গিয়া তাহাকে ও মঙ্গলকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটী চলিয়া গেল।

নকড়ীর মাতার এ কয়েক দিবস যে অবস্থা হইয়াছিল তাহা কল্পনা করা যাইতে পারে কিন্তু বর্ণনা করা সহজ নহে। এক মাত্র পুত্রকে চোর অপবাদে থানায় লইয়া গিয়াছে, তাহার কোন সম্বাদ নাই, দ্বিতীয়ত মঙ্গল টাকা লইয়া গিয়াছে। সে যথার্থ নকড়ীর উদ্ধারের জন্য চেষ্টা করিবে কি না তাহার স্থিরতা নাই। নকড়ীর মাতা কখনই মঙ্গলকে বিশ্বাস করে নাই, তাহার উপর মঙ্গলের হাতে টাকা পড়িয়াছে। মঙ্গল টাকা লইয়া দেশ-ত্যাগী হইবে কি না এই আর এক ভাবনা। ইহার উপর মঙ্গল বাটী না থাকায় নকড়ীর মাতা ঝগড়া করিতে পারে নাই ইহাও কম অসুখের কারণ নহে। নিয়মিত অভ্যাস বন্ধ হইলে যে

কত কষ্ট হয় তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। প্রথম দিন রোদনে অতিবাহিত হইল। কিন্তু শোক চিরকাল সমান তীক্ষ্ণ থাকে না। পর দিবস স্বভাব শোককে অতিক্রম করিল। কিন্তু মঙ্গল বাটী না থাকা হেতু এই স্বভাবের প্রতাপ পুত্রবধূর উপর পরিচালিত হইতে লাগিল। তাহারই কুলক্ষণে সোণার নকড়ীর চোর অপবাদ হইল। সে ঘরে আসা অবধিই পদে পদে বিপদ ঘটিতেছে। এমন অপয়া বউ নকড়ীর মাতা আর কখন দেখে নাই। নকড়ীর মাতার এত বয়স হইয়াছে কিন্তু এমন বিপদে কখন পড়ে নাই। এমন বউ থাকার চাইতে না থাকা ভাল। মরে গেলেই উৎপাত যায়। তাহা হইলে অশৌচ অন্তেই নকড়ীর মাতা পুনরায় নকড়ীর বিবাহ দিবে।

সন্ধ্যার পর প্রাঙ্গনে নকড়ীর মাতা আসীনা, কিঞ্চিৎ দূরে বধূ দণ্ডায়মানা। এক জন বক্তা, একজন শ্রোতা। নকড়ীর মাতার প্রতি কথায় বধূর কর্ণকুহরে অমৃত সিঞ্চিত হইতেছে। এবং সেই অমৃত চক্ষু হইতে লবণাক্ত জলধারা রূপে নির্গত হইতেছে, এমন সময়ে নকড়ী, মঙ্গল ও নলিন আসিয়া উপস্থিত হইল। নকড়ীর মাতা নিজ তীব্রতম স্বরে সম্ভাষিল "রাত্রি বেলা কারা ও?"

নকড়ী প্রফুল্লস্বরে উত্তর করিল "মা আমরা।"

নকড়ীর কণ্ঠস্বর কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইবামাত্রেই তাহার মাতা উচ্চৈস্বরে রোদন করিয়া দ্রুতপদে নকড়ীর নিকট গিয়া তাহার হস্ত ধরিয়া কহিল "তুই কি আমার নকড়ী ফিরে এলি?"

নকড়ী কহিল "মা স্থির হও, কাঁদ কেন?" এই বলিয়া মাতার

হস্ত ধরিয়া লইয়া গিয়া নিজে প্রাঙ্গনে বসিল ও নলিনকে বসিতে বলিল। মঙ্গলও বসিল।

নকড়ীর মাতা মোকর্দ্দমার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া যার পর নাই সন্তুষ্ট হইল। রায় মহাশয় যে খেলাপ এজাহারের দায়ে পড়িয়াছেন তাহাতে নকড়ীর মাতার হিংসাবৃত্তি সম্পূর্ণপরিতৃপ্ত হইল। কহিল "যেমন কর্ম্ম তেমনি ফল, আজু এক পো ধর্ম্ম আছে, চন্দ্র সূর্য্য উঠ্‌ছে, গঙ্গায় জল আছে। ছারে খারে যাবেন, নির্ব্বংশ হবেন। এখনও হয়েছে কি?"

নকড়ী মাতাকে থামাইয়া কহিল "মা গাল দিও না, কার কপালে কি হয় বলা যায় না। রায় মহাশয়েরা বড় মানুষ, আমাকে যখন ইচ্ছা নষ্ট কোর্‌তে পারেন। একেতো রাগ কোরে আছেন, তার উপর তোমার ওসব কথা শুন্‌লে একেবারে জলে যাবেন। এখন ওসব কথা ছাড়, আমাদের একটু জল টল দাও।"

নকড়ীর মাতা মঙ্গলের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তীব্রভাবে কহিল "তোর মামা কি বোল্‌ছে শুন্‌লি? চুপ করে বোসে আছিস যে? জল তামাক দেনা? এই ক দিন বসে বসে খেয়ে বুঝি আর কাজ কোর্‌তে ইচ্ছা করে না?"

নলিন শুনিয়া অবাক। মঙ্গলের চক্ষু লাল হইয়াছে কিন্তু রাত্রি বলিয়া কেহ দেখিতে পাইল না। উত্তর করিবে এমন সময় নকড়ী কহিল "মা আমরা একত্রই এসেছি। বিশেষ উকিল মোক্তারের বাসায় হেঁটে হেঁটে মঙ্গলার পায়ে ফোস্কা পড়েছে, ওর আর চলবার শক্তি নেই। ও আমার যা করেছে আমার

বাপও তা অপেক্ষা বেশী কোর্‌তে পারতেন না। জন্ম জন্ম যদি আমি এমন ভাগনে পাই তবে আর কিছুই চাই নে।” মঙ্গলের দিকে চাহিয়া “মঙ্গল, বাবা, চিরজীবী হয়ে থাক।” এতদূর বলিয়া নকড়ীর স্বর গাঢ় হইয়া আসিল। নকড়ী আর কথা কহিতে পারিল না।

মঙ্গল রাগে কম্পিত-কলেবর হইয়াছিল, কিন্তু নকড়ীর কথা শুনিয়া তাহার রাগ দূরে গেল, চক্ষুদ্বয় হইতে অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল। কথা না কহিয়া গাড়ুটী হাতে লইয়া নিকটস্থ পুষ্করিণী হইতে জল আনিবার জন্য উদ্যত হইল। নকড়ী তদ্দর্শনে গাত্রোত্থান করিয়া মঙ্গলের হস্ত হইতে গাড়ুটী লইয়া কহিল “বাবা তুমি বসো, আমি নিজেই জল আনছি।” মঙ্গল গাড়ু ছাড়িবে না। অতঃপর উভয়েই একত্র হইয়া পুষ্করিণীতে গেল। নলিন তথায় আর থাকা অনাবশ্যক মনে করিয়া নিজের বাটী গমন করিল।

নকড়ীর মাতা দেখিয়া শুনিয়া অবাক হইল। তাহার পাষাণ হৃদয়ে পরের দুঃখ কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। মঙ্গলের যে কষ্ট হইতে পারে, পরিশ্রম হইতে পারে একথা কখনও তাহার মন মধ্যে প্রবেশ করে নাই। মঙ্গল একটা কাঠের মানুষ এই রূপই তাহার সংস্কার ছিল। নকড়ীও এতকাল মঙ্গলকে কোন বিশেষ মিষ্ট কথা কহে নাই। হঠাৎ তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিয়া নকড়ীর মাতা বিস্মিত হইল এবং কিঞ্চিৎ রাগও করিল। যতক্ষণ নলিন প্রাঙ্গনে বসিয়াছিল ততক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। নলিন চলিয়া গেলে পুত্রবধুর উপর আপাততঃ সেই রাগের

অমৃতময় ফল বর্ষণ হইল। নকড়ীর মাতা কহিল "ওরে পোড়ার মুখী সর্ব্বনাসী, তুই কি মনে করেছিলি আমার ছেলেটা চিরকালের জন্যই গেল, তাই এক কলসী জলও আনিস নি? মনে ভেবেছিলে বুঝি এই টাকা কড়ী নিয়ে বাপের বাড়ী গিয়ে সুখে বসে খাবে? আমি থাকতে তা হচ্ছে না। ওরে আমার কি হবে? এমন দুরাশা তো কখন শুনি নি দেখিও নি।" নকড়ীর মাতার এতদূর বক্তৃতা হইলে নকড়ী ও মঙ্গল আসিয়া উপস্থিত হইল। সুতরাং বক্তৃতাও শেষ হইল। কোন প্রতিবন্ধক না হইলে নকড়ীর মাতা এরূপ বক্তৃতা যতক্ষণ ইচ্ছা ততক্ষণ করিতে পারে। অপরাপর বক্তাদের মত চসমা চক্ষে দিতে হয় না জলও খাইতে হয় না। একাদশীর দিবস নিরম্বু উপবাস করিয়াও দু তিন ঘণ্টা এরূপ বক্তৃতা করিয়াছে তাহা আমি বিশ্বস্ত সূত্রে অবগত আছি।

ক্ষণকাল পরে রন্ধনাদি হইল, নকড়ী ও মঙ্গল উভয়ে আহারাদি করিয়া তাঁত ঘরের বারাণ্ডায় বসিয়া তামাক খাইতেছে। মঙ্গল তামাক খাইতে খাইতে কহিল "মামা ভাতের কাছে কিছুই না; আজ কদিনের পর ভাত খেয়ে যেন শরীরটা জুড়াল। বাড়ী থেকে যাবার আগের রাত্রে ভাত খেয়েছিলাম আর আজ খেলাম।"

নকড়ী বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল "কেন এ চার দিন কি তুই ভাত খাস নি?"

মঙ্গল। কোথায় পাব। সকাল বেলা উঠে উকীলের বাসায় যাই আর ১১ টার সময় ফিরে আসি, এসেই কাছারি যেতে হয়।

আবার সন্ধ্যার সময় কাছারি থেকে এসেই উকীলের বাড়ী যাই, আর রাত ৯ টার সময় ফিরে আসি। এসে আর রাঁদ্দে ইচ্ছা করে না, চারটী জলপান খেয়ে অমনি অমনি ঘুমিয়ে পড়ি।

নকড়ী। বলিস কি মঙ্গলা? তুই আমার জন্যে এত কষ্ট পেয়েছিস্? এর তো আমি কিছুই জানিনে। এ ধার আমার এ জন্মেও শোধ দিতে পারবো না। জলপান পেট ভরে খেতিস্ তো?

মঙ্গল। মামা তবে একটা মনের কথা কব? রাগ কোরবে না তো?

নকড়ী। বল বাবা সচ্ছন্দে বলো। তোমার কথায় আমি আর এজন্মেও রাগ কোরব না।

মঙ্গল গাঢ়স্বরে বলিল "মামা পেট ভরে খাব কি? সে সব সহর জায়গা। এখানে এক পয়সায় যে জলপান পাওয়া যায় সেখানে চার পয়সারও তা পাওয়া যায় না। যদি বেশী খরচ করি আই মা হয় তো মনে কোরবেন আমি চুরি করেছি, তোমাকে বলে দেবেন আর তুমি আমাকে মারবে। এই ভয়ে আমি এ চারদিন পেট ভরেও খাইনি।"

নকড়ী। আর ওসব কথায় কাজ নাই। ও সব কথা শুন্‌লে যেন আমার বুক ফেটে যায়। আমি তোমার উপর বিস্তর অত্যাচার করেছি, তা মনে হলে আমার কষ্ট আরও দশ গুণ বাড়ে, কিন্তু মা কালী জানেন আমি নিজে ইচ্ছা পূর্ব্বক কখন তোমার গায়ে হাত তুলি নি। এতদূর বলিয়া নকড়ীর স্বর গাঢ় হইল, নকড়ী আর কথা কহিতে পারিল না। মঙ্গলও

চুপ করিয়া রহিল। ক্ষণকাল পরে নকড়ী কহিল "মঙ্গল রাত বেশী হলো শোও গিয়ে। কাল সকালে উঠে নলিনদের বাড়ী যেতে হবে। নলিন আমার বিস্তর উপকার করেছে। আজই যাওয়া উচিত ছিল কিন্তু নানান গোলযোগে হ'ল না।" এই কথার পর উভয়ে গিয়া শয়ন করিল।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

"চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।"

"কারু সর্ব্বনাস, কারু পৌষ মাস" সচরাচরই ঘটিয়া থাকে। একের দুঃখে অপরের সুখ একের অনিষ্টে অপরের ইষ্ট এরূপ দেখিয়া যাহারা হঠাৎ বিস্ময়াপন্ন হয় তাহারা পৃথিবীর কাণ্ডা কাণ্ড অতি অল্পই দেখিয়াছে। আমরা অর্থাৎ গ্রন্থকর্ত্তারা বহুদর্শী, দূরদর্শী, সূক্ষ্মদর্শী। সুতরাং আমরা এরূপ ঘটনাবলী দর্শন করিলে বিশেষ কিছু মনে করি না। পৃথিবীর গতিই এই, ভাবিয়া লই। অতএব আজ নকড়ীর বাটী আনন্দময়, রায় মহাশয়ের বাটী নিরানন্দে পরিপূর্ণ ইহাতে আর নূতন কি ভাবনা উপস্থিত হইবে? রাত্রি অধিক হইয়াছে, নকড়ী শয়ন করিয়াছে, তথাপি তাহার আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া প্রতিবাসীবর্গ একে একে আসিতে লাগিল। নকড়ী শয্যাত্যাগ করিয়া বাহিরে আসিয়া যে যেমন লোক তাহার সহিত সেইরূপ আলাপ করিল। নকড়ী জেলে গেলে যে আগন্তুকদিগের সকলেরি কষ্ট হইত এরূপ

নহে। তবে যেখানে নকড়ী ফিরিয়া আসিয়াছে সেখানে দু একটা মিষ্ট আলাপ করিয়া আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতে আপত্তি কি?

অনেক রাত্রি কাটিয়া গেল। পরিশেষে নকড়ী শয়ন করিল। কিন্তু সমস্ত দিবসের ভাবনায় ও আহ্লাদে তাহার ঘুম হইল না। প্রাতঃকালের শীতল বাতাস লাগিয়া নকড়ীর একটু নিদ্রাকর্ষণ হইয়াছে এমন সময়ে লক্ষ্মণ চন্দ্র গুপ্ত আসিয়া নকড়ীকে ডাকিল। নকড়ী উঠিয়া বাহিরে আসিলে লক্ষ্মণ কহিল "নকড়ী তোমার যে এ মোকর্দ্দমায় কিছু হবে না তা আমি পূর্ব্বেই জান্‌তেম। সুতরাং তুমি যে ফিরে এসেছ এতে আমার কোন আশ্চর্য্য বোধ হয় নাই। তুমি পাপ কর নি তোমার ভয় কি? গ্রামের সকল লোকই তো তোমাকে জানে? যদি প্রয়োজন হতো আমি নিজে গিয়ে তোমার পক্ষে সাক্ষি দিতাম। কিন্তু ততদূর প্রয়োজন হয় নাই সেও এক মঙ্গলের বিষয়। আমরা সকলেই রায় মহাশয়ের রেয়ৎ সুতরাং প্রকৃত মনের ভাব যে যতদূর গোপন কোরে রাখ্‌তে পারে ততই ভাল।" পরে একটু হাসিয়া কহিল "কিন্তু নকড়ী সেই খরচ পত্র কোর্‌তে হলো, আমি যখন বলেছিলাম যদি তখন এর অর্দ্ধেক খরচ কোরতে তা হলে এক দিনের কষ্ট হতো না। তা তো তুমি শুনলেও না বুঝলেও না।"

এই কথা শুনিয়া নকড়ীর ইচ্ছা হইল রায় মহাশয়ের পৃষ্ঠের সহিত যে দৃঢ় মুষ্টির পরিচয় হইয়াছিল লক্ষ্মণের পৃষ্ঠের সহিতও তাহার পরিচয় করিয়া দেয়, কিন্তু আবার কিসে কি হয় এই ভয়ে মনের ভাব গোপন করিয়া রাখিয়া কহিল "আমি তখন রাগে বুঝ্‌তে পারি নি, নৈলে কি তোমার কথা লঙ্ঘন করি।"

লক্ষ্মণ। তবু ভাল; আমি যে পরামর্শ দিয়েছিলাম সেটা যে ভাল তা টের পেয়েছ এই আমার সৌভাগ্য। ফল নকড়ী তোমাকে বড় ভাল বাসি নৈলে তোমার জন্যে তখনি বা এত চেষ্টা কোর্ব কেন? আর আমিই বা কেন রাত থাকৃতে উঠে এসে তোমার সঙ্গে দেখা কোরব? বলি, আমি যে ভাল বাসি সেটা তো টের পেয়েছ?"

নকড়ী হাই ছাড়িয়া কহিল "তা কি আর আমার জান্তে বাকী আছে?"

লক্ষ্মণ। তাই হলেই হলো। আমি সেই কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে বোল্‌তে এসেছিলাম। যাই এখন বেলা হলো। রায় মহাশয়ের বাড়ী যেতে হবে। কি করি তাঁর প্রজা। তিনি যাতে মনে না করেন যে আমি তাঁর বিপক্ষ সর্ব্বদা সেইরূপ করা উচিত। কি জানি, তোমার আজ যা ঘটেছে, আমার কাল্ তাই ঘট্‌তে পারে। বড়র পিরীত বালির বাঁধ। আজ এত যত্ন কোরছেন, হয়তো কাল সুবিধা পেলে আমাকেই বিপদে ফেল্‌বেন। সে যা হোক আমি এখানে এসেছিলাম একথা খবরদার যেন প্রকাশ না হয়।

নকড়ী। না, তা হবে না।

লক্ষ্মণ। দেখো ভাই আমার মাথা খাও, খবরদার।

নকড়ীর নিকট হইতে বিদায় হইয়া আসিবার সময় লক্ষ্মণ ভাবিতে লাগিল "বাচ্‌লাম ব্যাটাকে একলা পেয়েছিলাম, অপর কেউ থাকলে দেখা করা হতো না। এসব কথা প্রকাশ হওয়া কিছু নয়। ব্যাটা তাঁতি কিনা তাই দুকথায়ই ভূলে গেল।

ভদ্রলোক হলে কি সহজে আমার কথা বিশ্বাস কোরতো? কিন্তু ব্যাটার কাছ থেকে যে কিছু আদায় কোরতে পারলাম না এই দুঃখ। কিন্তু এখন সবে কলির সন্ধ্যা বৈত নয়। এই মোকর্দ্দমায় কত ডাল পালা বেরোবে কত হ্যাঙ্গাম হুজ্জত হবে। যাবেন কোথা বাছাধন। আজ না দিলেন কাল দেবেন।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে লক্ষ্মণ ও রায় মহাশয়েরা বাটী উপস্থিত হইল। বৈঠকখানায় প্রবিষ্ট হইবার পূর্ব্বেই যথোচিত বিষণ্ণ বদন হইয়া প্রবেশ করিল।

বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়, বটব্যাল ভায়া ও অন্যান্য অমাত্যবর্গ আসীন। দ্বারে প্রতিহারী দণ্ডায়মান। বিশেষ আত্মীয় না হইলে অন্য কাহাকে আজ প্রবেশ করিতে দিতেছে না। লক্ষ্মণ প্রবেশ করিয়া দেখিল সকলেই বিষণ্ণ, কেহই কথা কহিতেছে না। লক্ষ্মণও চুপ করিয়া বৈঠকখানার এক প্রান্তে উপবেশন করিল। বটব্যাল চর্ম্মচক্ষু মুদ্রিত করিয়া জ্ঞান চক্ষে তাম্রকুটের সহিত অহিফেনের সম্ভাব পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন। হুঁকার অগ্রভাগ ক্রমে ক্রমে অবনত হইয়া কলিকাটি স্খলিত হইয়া পড়িয়া গেল। চতুর্দ্দিকে আগুন ছড়াইয়া পড়িল। সকলে ত্রস্ত হইয়া উঠিয়া বিছানা হইতে আগুন বাহিরে ফেলিয়া দিল। বটব্যাল অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন "ভাব্‌তে ভাব্‌তে মনটা এমনি খারাপ হয়ে গেল যে হুকটা হাতে আছে এ আমার মনে নাই। বটব্যাল যে পৃথিবীর ভাবনা চিন্তা বিস্মৃত হইয়া নিদ্রা যাইতেছিলেন তাহা বলিলেন না, কথন বলেনও না। যাই হউক এই কাণ্ডটা হওয়ায় সকলের মুখ ফুটিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়

কহিলেন "লক্ষ্মণ এ উপস্থিত বিষয়ের কর্ত্তব্য।কর্ত্তব্য কি তাহা স্থির কর।"

লক্ষ্মণ। আপনি কি বিবেচনা কোরেছেন?

ভট্টাচার্য্য। আমার বিবেচনায় সর্ব্বাগ্রে কোন দৈব কর্ম্ম করা উচিত। নচ দৈবাৎ পরং বলং। কি বল বটব্যাল ভায়া?

বটব্যাল। অতি উত্তম কথাই আপনি প্রস্তাব করেছেন এ সকলের আগে করা কর্ত্তব্য করে।

বটব্যাল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের মতে অনুমোদন করিলেন ইহাতে ভট্টাচার্য্য আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু নিজের পাণ্ডিত্য সর্ব্বদা প্রদর্শন করান ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের এক উৎকট পীড়া ছিল। অনেকে ঠাট্টা বিদ্রূপ ইত্যাদি ঔষধ প্রয়োগ করিয়া দেখিয়াছে কিন্তু কিছুতেই ভট্টাচার্য্য এ রোগ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন নাই। আপাততঃ বটব্যালের কথা শুনিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া কহিলেন "কর্ত্তব্য করে" বল্লে কেন বটব্যাল ভায়া? কর্ত্তব্যই যে তব্য প্রত্যয় সেটা কি জানা আছে?"

বটব্যাল। প্রত্যয় বিশ্বাস মিশ্বাস আমি কিছু বুঝি নে। শাস্ত্র কখনও পড়িও নি পড়বোও না। আপনারা যা বলেন তাই শুনি এই আমার শাস্ত্র।

ভট্টাচার্য্য। সে কথা যথার্থ। ভক্তি না থাক্‌লে মুক্তি হয় না। বটব্যাল ভায়া ভক্তিটা কতি প্রত্যয় জানা আছে তো?

বটব্যাল। আমি তো বল্লাম মহাশয় প্রত্যয় ম্রত্যয় আমি কিছুই বুঝি না।

লক্ষ্মণ। ওসব ন্যায় শাস্ত্রের কথা এখন রেখে দিন। কাজের

কথা বলুন। দৈব কার্য্য কোর্‌বেন ভালই, কিন্তু দৈব কার্য্যে তো আর মোকর্দ্দমা হয় না? মোকর্দ্দমার কি হবে তাই এখন বিবেচনা করুন।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়, ঈষৎ রাগত হইয়া কহিলেন "লক্ষ্মণ, তোমাকে আমি একজন বিজ্ঞলোক বোলে জানতাম। কিন্তু আজ তোমার মুখে এরূপ বাক্য শুনে দুঃখিত হোলাম। দৈব কার্য্যে নিন্দা করা উচিত নয়। শাস্ত্রের কথা উল্লেখ করেছি। শাস্ত্রে স্পষ্ট বোলছে নচ দৈবাৎ পরং বলং। এতো আমার রচা কথা নয়।"

লক্ষ্মণ কাতর ভাবে নিবেদন করিল সে ঠাট্টা করে নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারেন নাই। এই কথায় ভট্টাচার্য্য সন্তুষ্ট হইলেন। পরে স্থির হইল মোকর্দ্দমার বিষয় যখন যেমন আয়োজনের প্রয়োজন হয় তখন সেইরূপ করা হইবে, সকলেই ইহাতে সাহার্য্য করিবে। আপাততঃ শিব সস্ত্যয়ন বিধি। এবং কল্য হইতেই সস্ত্যয়ন আরম্ভ করা কর্ত্তব্য। এইরূপ স্থির হইলে সকলে উঠিয়া যে যাহার বাটী গমন করিল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রায় মহাশয়কে অঙ্গমের দ্রব্যাদি সত্বর নিজ-বাটী পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। গাভি ঘৃত প্রায়ই খাঁটি মিলে না এজন্য মাখম আনাইয়া সত্বর ঘৃত প্রস্তুত করিয়া পাঠাইয়া দিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় পুনঃ পুনঃ দেখিয়াছেন ঘৃত খাঁটি না হওয়ায় অনেক সস্ত্যয়ন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কোন ফল দর্শায় নাই। একথা ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজের স্বার্থের জন্য বলেন নাই। কেবল রায় মহাশয়ের মঙ্গলের জন্য বলিয়াছেন।

তিনি রায় মহাশয়ের নিয়ত আশীর্ব্বাদক। রায় মহাশয়ের মঙ্গলেই তাঁহার মঙ্গল। কেবল মাত্র রায় মহাশয়ের হিতের জন্যই তিনি একথা বিশেষ করিয়া বলিলেন। গ্রন্থকর্ত্তার ইহাতে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই। পাঠক, আপনার আছে কি ?

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ।

শিবপূজা।

রায় মহাশয়ের বাটীতে মহা সমারোহ। ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্যূষে আসিয়া একটী বৃহৎ ও দ্বাদশটী ক্ষুদ্র শিব প্রস্তুত করিয়াছেন। দেশের শ্রীফল বৃক্ষ পত্র শূন্য হইয়া গেল। যে বৃক্ষে যত পত্র ছিল সকলই রায় মহাশয়ের বাটীতে আনীত হইল। গ্রামে যেখানে যত ফুল গাছ ছিল রায় মহাশয়ের লোক সমস্তই মুড়াইয়া ফুল আনিল। স্ত্রীলোকেরা হুলুধ্বনি ও শঙ্খধ্বনি করিতে লাগিল, ভট্টাচার্য্য বরম বম গাল বাজাইতেছেন, ঘণ্টা নাড়িতেছেন, এবং মুটা মুটা ফুল শিবের মস্তকে দিতেছেন। গ্রামস্থ সকলের মধ্যাহ্ন ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। ব্রাহ্মণেরা এক এক করিয়া আসিতেছেন। নলিনের নিমন্ত্রণ হয় নাই। নলিন প্রজা, ব্রাহ্মণ, এবং এক গ্রামবাসী হইয়াও রায় মহাশয়ের বিপক্ষাচরণ করিয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর গুরুতর পাপ কি হইতে পারে ? প্রাতঃকালে নিমন্ত্রণ করিবার সময় রায় মহাশয়ের যদিও অমত

ছিল না কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় কোন মতে নলিনের সহিত একত্রে আহার করিবেন না। যে একরূপ ধর্ম্ম ভ্রষ্ট ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার সহিত কিরূপে আহার করিবেন? সুতরাং নলিনের নিমন্ত্রণ বন্ধ হইল, অর্থাৎ নলিন একঘরে হইল। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোন জাতির নিমন্ত্রণ হয় নাই সেওয়ায় লক্ষ্মণ চন্দ্র গুপ্ত। স্বস্ত্য-য়নের প্রতি উপহাস করায় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ইচ্ছা ছিল যে তাহারও নিমন্ত্রণ বন্ধ করেন, কিন্তু রায় মহাশয়ের তাহাতে সম্মতি হইল না। সুতরাং লক্ষ্মণের নিমন্ত্রণ হইল।

অনেক গান বাদ্য ইত্যাদির পর ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পূজা সমাপ্ত হইল তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অপরাপর ব্রাহ্মণেরা যেখানে উপবিষ্ট ছিলেন তথায় আসিয়া আসন গ্রহণ করিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র পূর্ব্বে যে সমস্ত কথা বার্ত্তা হইতেছিল তাহা বন্ধ হইল। সকলেই ক্ষণকালের জন্য নিঃশব্দ হইয়া রহিল। একজন বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ, বয়স ৮০ বৎসরের কম নহে, মস্তকের কেশ সমুদয় শুক্ল এবং নূতন খড়ো ঘরের চালের অগ্রভাগ ছাঁটার ন্যায় গোল করিয়া কামান, হঠাৎ দেখিলে বোধ হয় একটী নাইট ক্যাপ পরিয়া আছেন, তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, সমস্ত মঙ্গল তো?" ভট্টাচার্য্য উত্তর করিলেন "সমস্তই মঙ্গল, এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সস্ত্যয়ন আমি কখন করি নাই।" এই কথা শুনিয়া অনেকেই একেবারে বলিয়া উঠিলেন "তা হবেই তো, না হওয়াই আশ্চর্য্য।" এমন সময় রায় মহাশয় আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন "রায় মহাশয়, আমরা সস্ত্যয়নের কথা জিজ্ঞাসা

কোরছিলাম ভট্টাচার্য্য মহাশয় বোল্লেন এরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর সস্ত্যয়ন উনি কথন করেন নাই।”

রায়। সে মহাশয়দিগের আশীর্ব্বাদের বলেই, তার আর ভুল নাই।

বৃদ্ধ। আপনি যে সজ্জন, যে পুণ্যাত্মা তাহাতে আর আমাদিগের আশীর্ব্বাদের প্রয়োজন করে না। আপনার বারো মাসে তের পার্ব্বণ, দান ধ্যান, দেবতা ব্রাহ্মণের উপর ভক্তি এরূপ আর এ অঞ্চলে কার আছে। এতেও যদি দেবতারা সন্তুষ্ট না হন তা হলে পৃথিবী একেবারে রসাতলে যাবে, চন্দ্র সূর্য্য আর উদয় হবে না, কি বলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়?

ভট্ট। আপনি উচিৎ কথা বোলচেন তার আর সন্দেহ কি? এ তো আপনার যোগ্য কথাই বটে। আপনার মতন বহুদর্শী বিজ্ঞ কজন আছে। রায় মহাশয় যে সাধুব্যক্তি তার আর ভুল কি? দান, সৌজন্য রায় মহাশয়ের কৌলিক ধর্ম্ম, পুরুষানুক্রমে চলে আসছে। এ বিষয়ে স্বর্গীয় কর্ত্তা যেমন ছিলেন, রায় মহাশয়ও তেমনি, কোন ক্রমেই ন্যূন নহেন। লোকে খুন কোরে এসে স্বর্গীয় কর্ত্তার নিকট আশ্রয় পেত। কোথায় পুলিস্ কোথায় মেজেষ্টর কেউ কিছু কোরতে পারত না।

বটব্যাল। সে বিষয়ে ইনিই বা কম কি? আজ মাস দুইও হবে না হানিফ ফকির একটা ঘড়ী চুরী করে মারা যায় আর কি। পুলিসে এসে বাড়ী ঘেরে এমন সময় ফকির ব্যাটা এসে ঘড়ীটা বাবুর পায়ে রেখে প্রণাম করে বল্লে “আমি ঘড়ী চাই না, এঘড়ী আপনি নিন। এ আপনারি হলো, এখন

আমার প্রাণ রক্ষা করুন। বাবু যৎপরোনাস্তি যত্ন করে ব্যাটাকে বাঁচিয়ে দিলেন।

ভট্টাচার্য্য। বটব্যাল ভায়া সে কথা কি আমি জানি না? ওর চাইতেও অনেক গুরুতর কথা জানি। মুখের উপর বলা নয়, বস্তুত রায় মহাশয়ের মতন লোক দেখা যায় না। সুভক্ষণে জন্ম কি না?

ষোড়শী যুবতী যেমন লজ্জার ভাণ করিয়া আপনার সৌন্দর্য্যের কথা আগ্রহ সহকারে শোনে রায় মহাশয় সেইরূপ অবনত মস্তকে এই সমস্ত প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অপরাপর সকলে রায় মহাশয়ের মুখপানে চাহিয়া রহিল। কেবল মাত্র লক্ষ্মণ একটু হাসিল। কিন্তু সে হাসি কেহ টের পাইল না।

ক্ষণকাল পরে আহারের স্থান হইল। সকলে গিয়া আহারে বসিলেন। রায় মহাশয়ের বিপদে সকলেই দুঃখিত কিন্তু তন্নিবন্ধন কাহারো আহারে অরুচি হইল না।

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ।

অপবাদ খণ্ডন।

আজ কাল হাকিম লোকেরা উৎকোচ গ্রহণ করেন না একথা সকলেই বলে। কিন্তু পাঠক যেন তাহা গ্রাহ্য না করেন। উৎকোচ আবহমান কাল হইতে প্রচলিত আছে ও যত দিন চন্দ্র সূর্য্য উদয় হইবে ততদিন থাকিবে। তবে উৎকোচের রূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহার মূল্যও কমিয়া গিয়াছে। এত কমিয়াছে যে এখন যে সে উৎকোচ দিতে পারে; রূপ পরিবর্ত্তন হওয়াতে যাহার তাহার সমক্ষে দেওয়া যাইতে পারে ও যাহার তাহার সমক্ষে লওয়াও যাইতে পারে। কোন হাকিমের নিকট কর্ম্ম খালি আছে। তোমার কোন আত্মীয়ের জন্য কর্ম্মটী প্রয়োজন। হাকিম নগদ টাকা উৎকোচ গ্রহণ করেন না। এস্থলে তোমার কর্ত্তব্য এক টাকা কিম্বা দেড় টাকার একটী ডালি হাকিমের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহার পায়ের নিকট রাখা। ইহাতে তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে। করিয়া দেখ সত্য কি না। এরূপ উৎকোচ প্রচলিত হওয়ায় উৎকোচ দাতা ও গ্রহীতা উভয়েরই পক্ষে সুবিধা হইয়াছে।

বিনা দোষে দেওয়া যাইতে পারে, বিনা দোষে লওয়া যাইতে পারে। যাঁহারা নগদ টাকার কথা শুনিলে সিহরিয়া উঠেন তাঁহারাও তরকারী রূপ ধারণ করিলে সে টাকা লইতে কুণ্ঠিত হন না। অতএব উৎকোচ প্রচলিত আছে কিন্তু তাহার রূপের পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এরূপ দান ও গ্রহণকে পাঠক উৎকোচ না বলিলেও পারেন কিন্তু উৎকোচে যে ফল হয় ইহাতেও সেই ফল হয় এ কথার আর সন্দেহ নাই।

লালবিহারী বাবু যে সকল বিষয়ে সর্ব্বদা চিন্তিত থাকেন তাহা পাঠক জানিতে পারিয়াছেন। গ্রহ বৈগুণ্য বশতঃ এই সময়ে আবার রামসিংহ ছুটী হইতে প্রত্যাগত হইল। লাল-বিহারী বাবুর চিন্তানলে ঘৃতাহুতি পড়িল। সমস্ত দিবস চিন্তা চিন্তা চিন্তা। লালবিহারী বাবু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন। লোকে সম্মুখে বসিয়া কি বলিতেছে তাহা মনে থাকে না। যত টুকু মনঃসংযোগ করিয়া শুনেন ততটুকু স্মরণ থাকে ও বুঝিতে পারেন ক্ষণকাল পরে অন্যমনস্ক হন, উপস্থিত কথায় মন নিবিষ্ট থাকে না। সুতরাং কিছুই বুঝিতে পারেন না, স্মরণ থাকে না। এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বেলায় আফিসে যান ও অনেক অগ্রে বাটী চলিয়া আইসেন। যে দিবসের যে কার্য্য সে দিবস না হওয়াতে হাতে কার্য্য জমিয়া গেল। সুচারু মনোযোগ না থাকায় মোকর্দ্দমার অবিচার হইতে লাগিল। যে দিবস যে মোকর্দ্দমার দিন স্থির থাকে সে দিবস সে মোকর্দ্দমা না হওয়ায় লোকের ব্যয় ও কষ্ট বৃদ্ধি হইল সংক্ষেপতঃ লালবিহারী বাবুর অল্প দিনের মধ্যে অত্যন্ত অপযশ হইয়া উঠিল। ক্রমে এই কথা কালেক্টর সাহে-

বের কানে গেল। কালেক্টর সাহেব কমিসনর সাহেবকে জানাইলেন। কমিসনার সাহেব তদন্ত করিতে আসিবেন স্থির করিলেন।

যথাকালে কমিসনার সাহেব আসিলেন। লালবিহারী বাবুর কাছারির সম্মুখের মাঠ তাঁবুতে পরিপূর্ণ হইয়া গেল। দূর হইতে দেখিতে একটী ক্ষুদ্র সহরের ন্যায় হইল। নূতন নূতন চাপরাসি, নূতন নূতন কনেষ্টেবল, নূতন নূতন সাহেবি চাকর বাকর (সাহেবি চাকর অর্থাৎ চাপকান গায়ে পাগড়ী মাথায় ছোট আদালতের ও মুনসেফি কাছারির উকিলের ন্যায়) রাস্তায় রাস্তায় দেখা দিল। স্ত্রীলোক ও ছেলে পিলের গতায়াত বন্ধ হইল। গৃহস্থেরা আপনাপন ছাগল, মুরগী, হাঁস, লুকাইয়া রাখিতে লাগিল, ভীরু-স্বভাব দোকানিরা দোকান বন্ধ করিল। (কমিসনারের লোকে যেখানে যাহা লয় তাহার মূল্য দান শাস্ত্র বিরুদ্ধ) সংক্ষেপতঃ একটা হুলুস্থুল ঘটিয়া উঠিল।

কমিসনার সাহেব যে যে আমলা সমভিব্যাহারে লইয়া পরি-ভ্রমণে নিষ্ক্রান্ত হন তাহাদিগের দুগ্ধে চিনি হয়। যতদিন পরি-ভ্রমণে কাল যাপন করেন বেতনের একটী পয়সা খরচ করিতে হয় না অথচ পূর্ব্বাপেক্ষা সুচারু আহারাদি হইয়া থাকে। ঘি, দুদ, পাঁটা যেন ভূতে আনিয়া যোগায়। কেহই তাহার মূল্য চায় না, কাহাকেও কিছু দিতে হয় না। যখন তাঁহারা ফিরিয়া কার্য্য-স্থানে আইসেন তখন শরীরে এত মেদ সঞ্চিত হয় যে অনেকে তাঁহাদিগকে চিনিতে পারে না। এবং সকলেই বিলক্ষণ ধন সঞ্চয় করিয়া আইসেন।

পূর্ব্বে এক পরিচ্ছেদে বলা হইয়াছে ডেপুটী বাবুরা কমিস্তনরের আমলাদিগকে গুরুঠাকুরের মতন দেখেন। বস্তুত সে কথা অলীক নহে। অদ্য লালবিহারী বাবুর বাটীতে মহা ধুম। কমি-সনরের আমলাদিগকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছে। ছাগল মুরগীর রক্তে প্রাঙ্গন লাল হইয়া গিয়াছে। কমিসনরের বাবুরচি সাহে-বের পাক শাক সমাপন করিয়া স্বয়ং আসিয়া রন্ধনাদি করিবে। ইহা অপেক্ষা লালবিহারী বাবুর পক্ষে আর কি অধিক সৌভাগ্য হইতে পারে ? জগন্নাথ তর্ক পঞ্চানন আসিয়া দ্বারে ডাকিয়া গলা ভাঙ্গিলেও এক পয়সা আদায় করিতে পারেন না, গুরুঠাকুর আসিয়া সপরিবারে রন্ধনাদি করিয়াও এক টাকার অধিক পান না। কমিসনারের বাবুরচির সহিত অদ্য ৫৲ টাকার বন্দবস্ত হইয়াছে।

কমিসনারের আমলাদিগের উপলক্ষে মহাকুমার মুনসেফ ও ছোট আদালতের জজ বাবুর নিমন্ত্রণ হইল। কিন্তু জজ বাবু প্রকাশ্য যে বাটীতে কুক্কুট বালিদান (বা জবাই) হইয়াছে সে বাটীতে খাইবেন না ও মুনসেফ বাবু যে বাটীতে কখন নিমন্ত্রণ হয় নাই সে বাটীতে যাইবেন না এই কারণে উভয়েই পীড়িত আছেন বলিয়া যাইতে পারিবে না বলিয়া দিলেন। উভয়েই সাক্ষিরা কিঞ্চিন্মাত্রও মিথ্যা কথা কহিলে অমনি ফৌজদারি সোপর্দ্দ করেন।

যথা সময়ে আমলা বাবুরা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। লাল-বিহারী বাবু ব্রহ্মজ্ঞানী সুতরাং কোনরূপ পক্ষ মাংস বা মৃগমাংসে আপত্তি নাই, কিন্তু মদ্য পান করেন না। কমিসনারের আম-

লারা তাহা শুনিবে না জানিয়া পূর্ব্বেই সুরার যোগাড় করা ছিল। বাবুরা আসিবামাত্র দু বোতল ব্রাণ্ডি বৈঠকে অবতীর্ণ হইলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিঞ্চিৎ উষ্ণ সুদ্ধি ও চনকবটুকা আগমন করিলেন। এক কুঁজা জল ও একটা কাচের গেলাস (বোতলের প্রিয় সখিদ্বয়) অবতীর্ণ হইলেন। বাবুরা বোধন আরম্ভ করিলেন অর্থাৎ নিদ্রিত ক্ষুধাকে জাগ্রত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

গেলাস দু তিন বার পরিভ্রমণ করিলে লালবিহারী বাবুর প্রশংসায় সকলেরই রসনা সঞ্চালিত হইল। সমস্ত ডিভিজানের মধ্যে লালবিহারী বাবুর ন্যায় যোগ্য ডেপুটী আর নাই, কমিসনার সাহেব একথা সর্ব্বদাই বাবুদিগের নিকট বলিয়া থাকেন। লালবিহারী বাবু আহ্লাদে গদ্গদ। কিঞ্চিৎ পরে সকলের সঙ্গীত লালসা হইল। গীত প্রথমতঃ ভবানী বিষয় হইতে ক্রমে ক্রমে বিদ্যাসুন্দর বিষয়ে গিয়া পরিশেষে বারনারী বিষয়ে পরিণত বা অবনত হইল। লালবিহারী বাবুর বাটী বিস্তৃত ছিল না। সুতরাং বাহির বাটীর কথা অন্তঃপুর পর্য্যন্ত শুনা যাইত। এজন্য লালবিহারী বাবু কিঞ্চিৎ রাগত হইলেন। কিন্তু কিছু বলিবার যো নাই। মনে করিলেন বিষয়ান্তরে গীতের স্রোত লইয়া যাইবেন সেই জন্য নিজে একটী ভাবানী বিষয় পুনরায় ধরিলেন। ভাবিলেন সকলেই তাঁহার সহিত ধরিবে ও সেইরূপ গাইবে। কিন্তু তাহা না হইয়া সকলেই তাঁহাকে ঠাট্টা করিয়া যাহার যাহা ইচ্ছা সে সেইরূপ আরম্ভ করিল। সকলেই গায়ক, শ্রোতা কেহই নাই। আর দু এক বার গেলাস প্রদক্ষিণ করিলে দু এক জন গলায় না গীত করিয়া নাসিকা দিয়া আরম্ভ করিলেন।

দু এক জন বমন করিতে লাগিলেন, বোধ হয় ইহারা পাছে ভাল আহার করিতে না পারেন এই জন্য উদর খালি করিয়া লইলেন। পরিশেষে যখন আহারের স্থান হইল তখন তিন চারি জন মাত্র আহার করিতে বসিলেন। অপরাপর সকলে নাসিকা ধ্বনি করত নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। লালবিহারী বাবু যৎপরোনাস্তি চেষ্টা করিলেন, কোন মতে ইহাঁদিগকে জাগাইতে পারিলেন না।

পরদিবস প্রাতঃকালে লালবিহারী বাবু কমিসনার সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। সাহেবকে সেলাম করিয়া দাঁড়াইলেন, সাহেব সেলাম করিলেন কিন্তু কোন কথা বার্ত্তা কহিলেন না। সাহেবের কুড়ি টা ঘোড়া। সইসেরা ঘোড়াদিগকে দানা দিতেছে। সাহেব যেন তাহাই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন। লালবিহারী বাবু নানাবিধ কথা উপস্থিত করিলেন। সাহেব কেবল "হাঁ" "না" ইত্যাদি জবাব দেন এমন সময় মুনসেফ বাবু আসিলেন। সাহেব যখন জজ ছিলেন তখন মুনসেফ বাবু তাঁহার অধীনে কার্য্য করিতেন। মুনসেফ বাবুর দেখা করিতে আসা সেই সম্পর্কে। মুমসেফ বাবুকে দূর হইতে দেখিয়া জজ সাহেব অগ্রসর হইয়া হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক মুনসেফ বাবুর হস্ত ধরিলেন। লালবিহারী বাবু তদ্দর্শনে একেবারে মৃতপ্রায় হইলেন। জজ সাহেব মুনসফেরি সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। লালবিহারী বাবু নিরুপায় হইয়া নিকটস্থ এক জন সইসকে জিজ্ঞাসা করিলেন সাহেবের ছোলা (ঘোঁড়ার দানা) কি দর খরিদ করা হয়। সে কহিল ৪৲ টাকা মণ। লালবিহারী বাবু বিস্ময় ভাণ করিয়া কহিলেন

"সে কি ? এখানে বাজারে ৩।৹ টাকা করিয়া পাওয়া যায়।" এই কথা কমিসনার সাহেবের কর্ণে গেল। সাহেব অমনি লালবিহারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "যথার্থই কি ৩।৹ টাকা করিয়া ছোলা পাওয়া যায়।" লালবিহারী বাবু উত্তর দিলেন যথার্থ ই পাওয়া যায়। তখন কমিসনার সাহেব কহিলেন "তবে আমাকে ৪০ মণ খরিদ করিয়া দাও।" লালবিহারী বাবু এক্ষণেই পাঠাইয়া দিবেন বলিলেন। তখন কমিসনর সাহেব লালবিহারী বাবুর সহিত হাসিতে হাসিতে নানাবিধ কথা বার্ত্তা আরম্ভ করিলেন। ক্ষণকাল পরে মুনসেফ ও লালবিহারী বাবু উভয়েই সাহেবের নিকট হইতে বিদায় লইয়া আসিলেন।

পথে আসিতে আসিতে মুনসেফ বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "৩।৹ টাকা মণ ছোলা কোথায় পাইবে ? কাল আমি ৪৲ টাকা মণ আনিয়াছি ?"

লাল। সে জন্য ভাবনা কি ? ঘরে থেকে ক টাকাই বা লাগবে ?

মুনসেফ। য টাকা লাগে তাই তো লোকসান ?

লাল। দেখবে।

জজ সাহেব সেই দিবস লালবিহারী বাবুর কার্য্যালয় তদন্ত করিলেন। বিশৃঙ্খল কিছুই দেখিলেন না। বরঞ্চ স্পষ্ট টের পাইলেন যে লালবিহারী বাবুর যে অপযশ হইয়াছিল তাহা কেবল দুইচারি জন হিংসুক লোকের রটনা।

ইহার পর অতি অল্পদিনের মধ্যেই লালবিহারী বাবুর পদোন্নতি ও এক শত টাকা বেতন বৃদ্ধি হইল।

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

ভালবাসার রূপান্তর।

যথা সময়ে লালবিহারী বাবুর আদালতে রায় মহাশয়ের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল। লালবিহারী বাবু নতি লইয়া দুই চারি কথা কহিলে প্রকাশ হইয়া পড়িল যে মোকর্দ্দমার শেষ ফল রায় মহাশয়ের পক্ষে সুবিধা হইবে না। তখন লক্ষ্মণ চন্দ্র পরামর্শ দিলে মোকর্দ্দমা এখান হইতে উঠাইয়া সদরে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এজলাসে লইয়া যাওয়া উচিত। রায় মহাশয়ের উকিল পরামর্শ দিল যে মোকর্দ্দমার হাল যে স্থলে ভাল বোঝা যাইতেছে না সে স্থলে মোকর্দ্দমা এই খানেই চালান উচিত। এখানে হাকিম আপনাকে ভদ্রলোক বলিয়া জানেন, আর ইনি কোন মোক-র্দ্দমায় অধিক সাজা দেন না। আপনি দোষী প্রমাণ হইলেও অধিক শাস্তি পাইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বর করেন হয় তো কিছু অর্থদণ্ড হইয়াও নিষ্কৃতি পাইতে পারেন। রায় মহাশয়কে সম্মত হইবার উপক্রম দেখিয়া লক্ষ্মণ কহিল "আপনার কি

একেবারে বুদ্ধি সুদ্ধি লোপ পেয়েছে? নকড়ী খালাস পাইবার মোক্ষ কারণ নলিন। সে নলিন এখনও বিদ্যমান। উকিল মহাশয়েরা যা বলেন বলুন, আমি অমন ঢের উকিল মোক্তার দেখেছি। আমার কথা শুনুন, মোকর্দ্দমা তুলে নিন। জানিয়া শুনিয়া অনলে হাত দেবেন না।” ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বটব্যালও এই পরামর্শের অনুমোদন করিলেন। তখনই মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইয়া যাইবার জন্য দরখাস্ত দেওয়া হইল। লালবিহারী বাবু আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন “মোকর্দ্দমা উঠাইয়া লইয়া তোমাদিগের পক্ষে যত মঙ্গল হউক না হউক, আমি এক দায় হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম। ইহাতে যত সাজা দেওয়া উচিত নানান কারণ বশত আমি তাহা দিতে পারিতাম না। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সে সব প্রতিবন্ধক নাই।”

একথা শুনিয়া রায় মহাশয় অত্যন্ত ভীত হইলেন কিন্তু লক্ষ্মণ কহিল “মহাশয়, ও সব কথা শোনেন কেন? আমি ওঁকে বিলক্ষণ জানি উঁনি আপন সহোদর ভাইকে ফাঁসি দিতে পারলে ছাড়েন না।”

ভাবিয়া আর ফল কি? যা হবার হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয় নিজের পক্ষের লোক জন সমভিব্যাহারে বাটী প্রত্যাগমন করিলেন।

এই মোকর্দ্দমায় সাক্ষ দিবার জন্য মহারাণীর পক্ষ হইতে নকড়ীর তলপ হইয়াছিল। সুতরাং সেও মহকুমায় গিয়াছিল এবং তাহাকেও সাক্ষ না দিয়া বাটী ফিরিয়া আসিতে হইয়াছিল। এই সময় নূতন কাচের চুড়ি উঠিয়াছিল। নকড়ী ফিরিয়া

আসিবার সময় একজোড়া চুড়ি নিজের স্ত্রীর জন্য খরিদ করিয়া আনিল। নকড়ী বাটী আসিয়া মঙ্গলের হাতে চুড়ি জোড়া দিয়া কহিল "মঙ্গল এই চুড়ি জোড়া মার কাছে দে, তিনি বাড়ীর মধ্যে দেবেন এখন।" মঙ্গল চুড়ি লইয়া হাসিতে হাসিতে আসি-তেছে সম্মুখে তাহার মাতুলানীর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কহিল "আজ তোমার বাপ তোমার জন্যে এক জিনিস এনেছে।"

নকড়ীর স্ত্রী কহিল "মঙ্গল, তুমিই আমার বাপ দেখি তুমি মেয়ের জন্য কি এনেচ?"

"আমি তোমার বাপ হ'তে গেলাম কেন। তোমার আসত বাপ যে এখুনি মহাকুম থেকে ফিরে এল সেই এনেছে এই বলিয়া মঙ্গল আর একটু হাসিয়া চুড়ি গুলি কাপড়ের মধ্যে লুকাইল। নকড়ীর স্ত্রী আসিয়া মঙ্গলের হস্ত ধরিয়া কহিল "দেখি, দেখি।" মঙ্গল কহিল "না তোমাকে দেখান হবে না। আগে আইকে দি, তার পর তিনি তোমাকে দেবেন।"

নকড়ীর স্ত্রী কহিল "আচ্ছা আমি একবার দেখিই না, তার পর তুই যার ইচ্ছা তার কাছে দিস।"

মঙ্গল চুড়ি দেখাইলে নকড়ীর স্ত্রী তাঁহার হস্ত হইতে চুড়ি-গুলি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া আপন গৃহে প্রবেশ করিল। মঙ্গল আর কিছু না বলিয়া বহির্বাটী ফিরিয়া আসিল।

নকড়ীর স্ত্রী ইতিপূর্ব্বে কখন কাচের চুড়ি দেখা দূরে থাকুক কাচের চুড়ির নামও শুনে নাই। নকড়ী তাহার জন্য কি মণি মুক্তা জহর আনিয়াছে তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া এক দৌড়ে মনোরমার নিকটে গেল। মনোরমা নকড়ীর

স্ত্রীর হাস্য বদন দেখিয়া জিজ্ঞাসিলেন “কি বউ আজ যে বড় হাসি হাসি মুখ দেখছি?”

নকড়ীর স্ত্রী অঞ্চল হইতে চুড়িগুলি দিয়া জিজ্ঞাসিল “ঠাকরুণ, এ কি বোল্‌তে পারেন?”

মনোরমা চুড়িগুলি হস্তে লইয়া কহিলেন “এ গুলি কাচের চুড়ি। নীলবর্ণ, তোমার ফরসা হাতে বেস মানাবে এখন। আয় আমি তোকে পরিয়ে দি।” এই বলিয়া নকড়ীর স্ত্রীর হস্তধারণ করিয়া বসাইলেন। নকড়ীর স্ত্রী কহিল “না এখন পোরব না। আমার কি না তা তো জানিনে। আর পোরলে যদি ঠাকরুণ বকেন।”

মনোরমা। পাগল আর কি? তোর জন্যে আনে নি তো কার জন্যে এনেছে? আর একজোড়া কাচের চুড়ি পোরলে তোর শাশুড়ী আর কি বোলবে? এই বলিয়া বলপূর্ব্বক নকড়ীর স্ত্রীর হস্তে চুড়িগুলি পরাইয়া দিয়া কহিলেন “বা বেস দেখাচ্ছে যা তোর শাশুড়ীকে দেখা গিয়ে।” নকড়ীর স্ত্রী অঞ্চল গলায় দিয়া মনোরমাকে প্রণাম করিয়া বাটী ফিরিয়া আসিল। ফিরিয়া আসিয়া দেখিল তাহার শাশুড়ী ও স্বামী উভয়ে পরস্পর গল্প করিতেছে। দেখিয়া পুনরায় নিজের গৃহে গমন করিল। ক্ষণকাল পরে সন্ধ্যা হইল ও নকড়ীর স্ত্রী গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করিল, শাশুড়ীকে প্রণাম করিবার কথা ভুলিয়া গেল। পরে রন্ধন করিতে করিতে উনলের আলোক চুড়ির উপর পড়ায় প্রণামের কথা পুনরায় স্মরণ হইল। অমনি শাশুড়ীর নিকট গমন করিল, কিন্তু লজ্জাবোধ হওয়ায় ফিরিয়া রন্ধনশালায় আসিল, প্রণাম করা হইল না।

পরদিবস প্রাতে বধূর হস্তে চুড়ি দেখিয়া নকড়ীর মাতা জিজ্ঞাসা করিল "তোর হাতে ও কিরে বউ ?" বধূ নিকটে গিয়া দেখাইয়া কহিল "এ কাচের চুড়ি।"

নকড়ীর মাতা। তুই এ কোথায় পেলি ?

বধূ। কাল মঙ্গল দিয়েছে।

নকড়ীর মাতা। মঙ্গল কোথায় পেলে ?

বধূ। তা জানিনে।

নকড়ীর মাতা। এর দাম কত ?

বধূ। তা বোল্‌তে পারিনে।

এই বলিয়া বধূ পুষ্করিণীতে বাসন ধুইতে গেল। নকড়ীর মাতা মনে মনে তর্ক করিতে বসিল। ভাবিল এ চুড়িতে কত টাকাই খরচ হয়েছে ; নকড়ী এতকাল যা সঞ্চয় করেছিল সমস্তই এই চুড়ির পাছেই গিয়েছে। তা যাবেই তো। এখন বউ ডাগর হয়েছে। বউই সর্ব্বস্ব। আমি গর্ভে ধরে খাইয়ে দাইয়ে মানুষ কোরলাম আমি কেউ নই। আমার জন্যে এক পয়সা খরচ কর্ত্তে হলেই কষ্ট হয়। আমি একটা কথার ভাজনও হ'লাম না। আমার সঙ্গে পরামর্শটাও ক'রে গেল না। আমার বাড়ী আর আমার বাড়ীই নয়। এতও এ পোড়া অদেষ্টে ছিল ? এ জীবনে আর কাজ কি ? এবাড়ীতে থেকেই বা আর আমার দরকার কি ? এই রূপ চিন্তা করিয়া নকড়ীর মাতা নিজ পিত্রালয়ে যাইবার বন্দবস্ত করিতে লাগিল।

ভালবাসার নিয়মই এই। ভালবাসা ত্যাগ স্বীকারের কাজ নহে। নিঃস্বার্থ কেহ কাহাকে ভালবাসে না। পিতা,

মাতা, ভার্য্যা তিনিই হউন, নিজ নিজ ভালবাসার ভালবাসা রূপ প্রতিশোধ চান। যদি মনে সন্দেহ হয় তুমি ভাল বাসিলে না, অমনি আর অভিমান রাখিবার স্থান থাকে না। যত দিন পর্য্যন্ত বউ ছোট থাকে তত দিন পুত্র ও বধূ উভয়েই মাতার নেত্র পুতলীর ন্যায় হইয়া থাকে। এমন ছেলে, এমন বউ কাহারও কখন হয় নাই, হবে না। কিন্তু বউ বয়স্থা হইলে পুত্র যদি তাহাকে মাতার আজ্ঞা ব্যতিরেকে এক পয়সার মিসিও দেয় অমনি বধূ ও পুত্র উভয়েই মায়ের নিকট পর হইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় পুত্রের উপর মাতার রাগ নয়, ভালবাসার রূপান্তর মাত্র।

নকড়ীর মাতা মুখ ভার করিয়া পিত্রালয়ে যাইবার বন্দবস্ত করিতেছে এমন সময় মঙ্গল গাত্রোত্থান করিয়া হুঁকা কলিকায় সসজ্জিত হইয়া অগ্নি লইতে গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসিল "আই, ও কি হচ্চে ?" নকড়ীর মাতা ভার মুখ আরও দশ গুণ ভার করিল। মঙ্গল আর দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিয়া কোন উত্তর না পাওয়ায় নকড়ীকে গিয়া জাগাইয়া দিল। নকড়ী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল "মা ওসব কাপড় চোপড় অমন করে বাঁদছো কেন ?" দুই চারিবার জিজ্ঞাসা করিতে করিতে নকড়ীর মাতা কহিল "তোমার ঘর সংসার নিয়ে তুমিই থাক, আমার যা অদেষ্টে আছে তাই হবে। যত দিন এ বাড়ী আমার ছিল তত দিন আমিও এ বাড়ীর ছিলাম। এখন এ বাড়ীও আমার নয়, আমি এ বাড়ীরও না আমার এখন যাওয়াই ভাল।" মাতার উত্তর শুনিয়া নকড়ী অবাক হইয়া রহিল। ক্ষণকাল এইরূপ

থাকিয়া জিজ্ঞাসিল "কি হয়েছে ?" নকড়ীর মাতা কহিল "হবে আর কি ? আমার কপালে যা ছিল তাই হয়েছে। তুমি সুখে সচ্ছন্দে থাক। আমি এখন আপদ বালাই হয়েছি, আমি চলে যাই। আপদ বালাই দূর হওয়াই ভাল।" এই বলিয়া নকড়ীর মাতা পূর্ব্বাপেক্ষা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বোচ্‌কা বুচ্‌কী বাঁধিতে লাগিল।

ক্ষণকাল মধ্যে পাড়ায় খবর হইয়া গেল নকড়ীর মাতা বাপের বাড়ী যাইতেছে। নকড়ীর মাতাকে সকলেই জানিত কিন্তু নকড়ীর মাতার বাপের বাড়ী আছে কি না কেহ জানিত না। এজন্য অনেকে কৌতুহলাবিষ্ট হইয়া দেখিতে আইল। কিন্তু দেখিতে আসা মাত্র, নকড়ীর মাতা কাহারও সঙ্গে কথা কহিল না। সকলে যেমন আসিয়াছিল অমনি ক্ষণকাল পরে ফিরিয়া গেল।

নকড়ী নিজে কোন কারণ না জানিতে পারিয়া স্ত্রীর নিকট জিজ্ঞাসা করিল। নকড়ীর স্ত্রী প্রাতঃকালে শাশুড়ীর সহিত যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা বলিল। অত অল্প কারণে যে এত দূর ঘটিবেক ইহা মনে ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া নকড়ী ভাবিল তাহার স্ত্রী অবশ্যই কোন না কোন কর্কশ কথা বলিয়া থাকিবে। এই ভাবিয়া স্ত্রীকে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করায় সে কাঁদিতে কাঁদিতে নকড়ীর পায়ে হাত দিয়া কহিল সে এতভিন্ন আর কিছুই জানে না।

এদিকে নকড়ীর মাতা সুসজ্জিত হইয়া পদব্রজে পিত্রালয়ে যাইতে উদ্যত। নকড়ী কহিল "যদি নিতান্তই যাবে তবে

খেয়ে দেয়ে যেও। আর হেঁটে যাবে কেন? আমি নৌকা করে দিচ্ছি, নৌকায় চড়ে যেও।" এই বলিয়া নকড়ী তাহার মাতার হস্ত ধরিয়া টানিল। নকড়ী যতই গৃহের দিকে টানে নকড়ীর মাতা ততই বাহিরের দিকে যাইতে চায়। কিন্তু নকড়ীর সহিত কতক্ষণ জোরে পারিবে? ক্ষণকাল পরে আসিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া শয্যায় শয়ন করিল।

ক্রমে রন্ধনাদি হইল কিন্তু নকড়ীর মাতা জীবন থাকিতে নকড়ীর বাসে জল গ্রহণ করিবে না। নকড়ী মঙ্গল, বধূ পর্য্যায় ক্রমে সকলেই খোসামোদ করিল নকড়ীর মাতা কোন মতেই শুনিবে না। এদিকে ভাত শুষ্ক হইতে লাগিল। মাতা আহার না করিলে মঙ্গল বা বধূই বা কিরূপে আহার করে? উপায়ান্তর না দেখিয়া নকড়ী মনোরমার নিকটে গিয়া কহিল "মাসি মা একবার আমাদের বাড়ীর দিকে আসুন। মা যে কার উপর কেন রাগ করেছেন কিছু বোল্‌বেনও না ভাত ও খাবেন না।"

মনোরমা ঈষৎ হাস্য করিয়া বলিলেন "আমি সব শুনেছি। তোমার কোন চিন্তা নাই তুমি যাও, আমি যাচ্চি। আমি বল্লেই সব সেরে যাবে এখন।"

মনোরমা সান্ত্বনা করিতে অসিতেছেন, কিন্তু ইতিমধ্যে মনোরমা অপেক্ষা আর একজন গুরুতর 'ব্যক্তি নকড়ীর মাতাকে সান্ত্বনা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অন্নের উপর রাগ করিলে ক্ষুধা যেরূপ সান্ত্বনা করে অমন আর কেহই পারে না। মনোরমা যখন আসিয়া উপস্থিত হইলেন তখন ক্ষুধা প্রায় নিজ

কার্য্য সাধন করিয়া বসিয়া আছে। মনোরমাকে আসিয়া আর অধিক কষ্ট পাইতে হইল না।

মনোরমা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "নকড়ীর মা কি হয়েছে?"

নকড়ীর মা। আর বোন কি হবে? এ বাড়ীর সকলেই ভাল আমিই মন্দ। আমি গেলেই লোকের উৎপাত যায়। তা আমার থেকে কাজ কি? ছোঁড়ার যাতে দু এক পয়সা থাকে আমার তাই চেষ্টা। তা আমি বুড় মানুষ, আমার কথা এখন কে শোনে, কেই বা আমাকে জিজ্ঞাসা করে? বউ এখন সোমত্ত, বউই বাড়ীর গিন্নী। যে যা বলে তাই হয়। দেখেচ কত টাকা খরচ করে কি গয়না এনেচে? আমাকে যদি একবার জিজ্ঞাসা করে থাকে?

মনোরমা। এই কথা? আ আমার কপাল? ও যে এক জোড়া কাচের চুড়ি, বড় বেশী হয় তো চার আনা দাম। এরি জন্যে এত কাণ্ড কারখানা। যাও ওঠো, ভাত খাও গিয়ে। এই বলিয়া মনোরমা নকড়ীর মাতার হাত ধরিয়া টানিলে নকড়ীর মাতা আগে আগে চলিয়া গিয়া আহার করিতে বসিল।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

বিফল মনোরথ।

লোকের মন্দ করিতে গেলে কখন কখন ভাল হইয়া পড়ে। নলিনকে কিরূপে বাটী হইতে বহিস্কৃত করিয়া দিবেন এই ভাবিয়া ভাবিয়া লালবিহারী বাবু কাহিল হইয়া যাইতে লাগিলেন। বিনা অপরাধে বিদায় করিলে বিস্তর কথা জন্মিবে অথচ নলিনের অপরাধ অনুসন্ধান করিয়া পাইবার যো নাই। অনেক চিন্তা করিয়া স্থির করিলেন নিজের একখানি বস্ত্র নলিনের ব্যাগে রাখিয়া হারাইয়া গিয়াছে বলিয়া সকলের ব্যাগ অনুসন্ধান করিবেন। নলিনের ব্যাগে অবশ্য পাওয়া যাইবে। তখন নলিনকে খালি বিদায় করা কেন, ফৌজদারি সুপর্দ্দ করিয়া মেয়াদ দিতে পারিবেন। এই কৌশল উদ্ভাবন করিয়া লালবিহারী বাবুর চিত্ত প্রফুল্ল হইল, কিন্তু কে তাঁহার বস্ত্র নলিনের ব্যাগে রাখিবে? কাহার হস্তে একার্য্যের ভার অর্পণ করিবেন? ভৃত্যদিগের মধ্যে একমাত্র গগন বহুকাল আছে, গগন বিশ্বাসীও বটে। কিন্তু রামসিং এক কথা জানিয়াছে বলিয়া রামসিং আর তাঁহার ভৃত্য নহে, তিনি নিজেই রামসিংহের ভৃত্য হইয়াছেন। আবার গগনের

হস্তে এই ভার অর্পণ করিয়া কি গগনকেও প্রভুপদে অভিষিক্ত করিবেন? বিশেষ একার্য্য অতি গুরুতর, প্রকাশ হইয়া পড়িলে জাত, মান ও চাকুরি পর্য্যন্ত যাইবার সম্ভাবনা। অনেক বাদানুবাদ করিয়া পরিশেষে স্থির করিলেন এক দিবস রাত্রে নিজেই এই কার্য্য সমাধা করিবেন। কিন্তু নলিনের হাতে তাঁহার বস্ত্রাদি থাকে না। ধোপার বাড়ী দিবার সময়ও নলিন দেয় না, ধোপার বাটী হইতে ফিরিয়া আসিলেও নলিন হিসাব করিয়া লয় না। আলমারির চাবি বিধুমুখীর হস্তে থাকে। নলিনের সে চাবি পাইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া নিজের বস্ত্রাদি উপরে আপন শয়নাগারে রাখেন নলিন সেখানে কখন যায় না। এরূপ অবস্থায় নলিনকে কাপড় চুরির অপবাদ দিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া গগনকে ডাকিলেন। গগন আসিলে মনের কথা কহিতে না পারিয়া তামাক দিতে বলিলেন। তামাক খাইতে খাইতে বলিবার চেষ্টা করিলেন কিন্তু বলিতে পারিলেন না।

লালবিহারী বাবুর হৃদয় যে এই রূপ বিলোড়িত হইতেছে বিধুমুখী তাহার বিন্দু বিসর্গও জানেন না। লালবিহারী বাবুর চিন্তাকুল মুখ দর্শন করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "তুমি আজ কাল সর্ব্বদাই মুখ ভারি করে থাক কেন? তোমার কাছারির গোলমাল তো চুকে গিয়েছে। এখন আর কি ভাবনা?"

লালবিহারী বাবু উত্তর করিলেন "শরীরটা সর্ব্বদাই অসুখে থাকে, কি অসুখ তা বোল্‌তে পারি না, অথচ সাবেক মতন সুখও নাই।

বিধু। তাইতো তোমার শরীর যেন শুখিয়ে যাচ্চে, তুমি আগের মতন খেতে পার না। নলিন বোল্‌ছিল তুমি আগে যেকটী ভাত খেতে এখন তার আদ্দেকও খেতে পার না।

আবার নলিনের কথা—বিধুমুখীর মুখে নলিনের কথা। শুনিয়া লালবিহারী বাবুর বুকে যেন শেল বিদ্ধ হইল। কি করেন কিছুই প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। ক্ষণকাল পরে কহিলেন "তুমি এখান থেকে যাও দেখি, আমি একটু ঘুমাতে চেষ্টা করি। একটু ঘুমাতে পারলে বোধ হয় শরীরটা সারবে এখন।"

বিধুমুখী গৃহত্যাগ করিয়া অন্য গৃহে গেলেন। লালবিহারী বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন আর ওসব কথা ভাবিবেন না। কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। রোগী যেরূপ বিশ্রাম লাভার্থ যত পার্শ্ব পরিবর্ত্তন করিয়া শয়ন করে ততই নিদ্রা দূরে যায় সেইরূপ লালবিহারী বাবু যতই ভাবিতে লাগিলেন ও ভাবনা আর ভাবিবেন না, ততই সেই ভাবনা পুনঃ পুনঃ তাহার মনে আসিতে লাগিল। শয্যায় শয়ন করিয়া মুদ্রিত নেত্রে এইরূপ অনেকক্ষণ ভাবিয়া ভাবিয়া এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। উপায়টী এই—এখন অবধি কাছারির কাপড় গৃহে না আনিয়া বাহির্বাটীতে রাখিয়া আসিবেন। এইরূপ দু চারি দিবস রাখিয়া এক দিবস রজনী যোগে তাঁহার একখানি ভাল গরদের রুমাল নলিনের ব্যাগে রাখিয়া দিবেন। পরদিবস রুমালের অনুসন্ধানে সকল ভৃত্যের ব্যাগ বোচ্‌কার তদারক করিবেন। নলিনের ব্যাগের ভিতর অবশ্যই রুমাল পাওয়া যাইবে। তখন তাহাকে ফৌজদারিতে দিয়া

নিজে বিচার করিয়া জেলে দিবেন। এই উপায় উদ্ভাবন করিয়া লালবিহারী বাবু অপেক্ষাকৃত প্রফুল্লিত হইলেন। তখন বিধুমুখীকে ডাকিয়া কহিলেন "যদি কিছু খাবার থাকে দাও দেখি ?"

বিধুমুখী কহিলেন "কৈ, খাবার কি আছে তাতো জানিনে। তুমি আজ কাল কাছারি থেকে এসে জল খাওনা বলে আর কিছু তোএর হয় না। দেখি নলিনকে ডেকে জিজ্ঞাসা করি।"

"আবার ঐ কথা। এক শ বার ঐ কথা। পদে পদে ঐ কথা! এ ব্যাধির কি আর কোন ঔষধ নেই ?" এইরূপ ভাবিয়া লালবিহারী বাবুর মনে হইল যে যে ঔষধ তিনি ঠিক করিয়াছেন তাহা অপেক্ষা আর উত্তম ঔষধ ঠিক হইতে পারে না।

বিধুমুখী নলিনকে ডাকিলেন। নলিন কহিল "জলখাবার ঘরে কিছু নাই।" বিধুমুখী অবিলম্বে পুরী ও মোহনভোগ প্রস্তুত করিতে বলিলেন। বিশ পঁচিশ মিনিটের মধ্যে পুরী ও মোহনভোগ প্রস্তুত হইল। লালবিহারী বাবু জলযোগ করিয়া বর্হিবাটী আগমন করিলেন।

পরদিবস কাছারি হইতে আসিয়া লালবিহারী বাবু উপরের ঘরে না গিয়া নিচে বৈঠকখানায় বস্ত্রাদি পরিত্যাগ করিলেন। কহিলেন আমার কাছারির কাপড় এই খানেই থাকিবে। রোজ রোজ কাছারি যাইবার সময় এই খান হইতেই কাপড় পরিয়া যাইব।

দুই দিবস এইরূপ থাকিলে লালবিহারী বাবু সুযোগ মনে করিয়া ভাবিলেন আজি রাত্রেই কর্ম্ম সমাধা করিবেন অর্থাৎ

নিজের ভাল রুমালখানি নলিনের ব্যাগে লিপিযোগে রাখিয়া দিবেন। এই ভাবিয়া সকালে সকালে আহার করিয়া নিজ গৃহে শয়ন করিলেন। ভাবিলেন সকলে নিদ্রিত হইলে একাকী উঠিয়া গিয়া কার্য্য সম্পন্ন করিবেন।

গ্রন্থকার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিতে চান না। কিন্তু আহারের পর কেন নিদ্রা আইসে একথা সকলে জানেন না। বলিয়া দিতে গেলে অনেক লিখিতে হয়। যাহা হউক আহারের পর যে নিদ্রা আইসে তাহা সকলে জানে। লালবিহারী বাবু মনে করিলেন সকলে আহার করিয়া নিদ্রিত হইলে নিজকার্য্য সাধন করিবেন।

নিজের আহার হইল। স্ত্রীলোকদিগের আহার হইল। তখনও লালবিহারী বাবু জাগিয়া আছেন। পরে ভৃত্যদিগের আহার হইবে, লালবিহারী বাবুর দু এক বার চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিতে লাগিল। চক্ষু রগড়াইয়া ঘুম বন্ধ করিলেন। কিন্তু কতক্ষণ এরূপ করিবেন? অবিলম্বে নাসিকাধ্বনি করত সকল দুঃখ ক্লেশ ভুলিয়া নিদ্রা দেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। লাল-বিহারী বাবু নিদ্রিত হইলেন। ক্ষণকালের জন্য সংসার ভুলিলেন, দুঃখ সুখ ভুলিলেন, আত্ম পর ভুলিলেন। নিদ্রে! তোমার মতন আর কে আছে? অর্জ্জুনের সম্মোহন বান তোমার কাছে কোথায়?

পর দিবস প্রত্যুষে লালবিহারী বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। অমনি মনে হইল যে সকল কাজ করিবার কথা ছিল কিছুই করা হয় নাই। কি মনস্তাপ! চব্বিশ ঘণ্টা বৃথা গেল।

পর দিবস কাছারি হইতে আসিয়া লালবিহারী বাবু প্রতিজ্ঞা করিলেন সে রাত্রি যেরূপে হয় কার্য্য সমাধা করিবেন এবং পাছে নিদ্রা আইসে এই জন্য প্রচুর পরিমাণে চা খাইলেন।

যথা সময়ে সকলের আহারাদি হইয়া গেল। কর্ত্তা গৃহিণী ভৃত্যবর্গ ক্রমে ক্রমে সকলেই শয়ন করিল এবং ক্রমে ক্রমে সকলেই সুষুপ্ত হইল। তখন লালবিহারী বাবু আস্তে আস্তে উঠিয়া নিঃশব্দ পদ সঞ্চালন করতঃ ভৃত্যদিগের গৃহে গমন করিলেন। এবং আপনার পকেট হইতে ভাল রেশমের রুমালখানি লইয়া নলিনের ব্যাগে রাখিয়া দিলেন। ভয়ে কম্পিত কলেবর হওয়ায় ব্যাগের মধ্যে যখন রুমালখানি রাখেন তখন ব্যাগ খুলিতে ও বন্ধ করিতে শব্দ হইল। নিদ্রা এখনও কাহারু গাঢ় হয় নাই। সুতরাং দুই এক জনে হুঁহুঁ উঁ হুঁ করিয়া শব্দ করিল। পাছে ধরা পড়েন এই ভয়ে লালবিহারী বাবু আর সেখানে অধিকক্ষণ থাকিতে পারিলেন না। সুতরাং ব্যাগটী যেখানে থাকিত সেখানে রাখিতে পারিলেন না। ঘরের মেজেয় পড়িয়া রহিল। লালবিহারী বাবু গৃহ হইতে চলিয়া গেলেন, ভৃত্যেরাও পুনরায় নাসিকা ধ্বনি করত নিদ্রা যাইতে লাগিল।

পরদিবস প্রাতে নলিন গাত্রোত্থান করিয়া সবিস্ময়ে দেখিল তাহার ব্যাগ আংটার উপর না থাকিয়া ঘরের মেজেয় পড়িয়া আছে। ব্যাগটী খুলিয়া দেখিল। প্রথমেই বাবুর ভাল রুমাল তাহার দৃষ্টিপথে পতিত হইল। কি সর্ব্বনাশ! এ কর্ম্ম কে করিয়াছে? নলিনের অঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ভাবিল কেহ না কেহ তাহার সর্ব্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে। নতুবা

তাহার ব্যাগে এ রুমাল আসিবার সম্ভাবনা কি? তখন রুমাল খানি লইয়া বিধুমুখীর নিকটে গেল এবং সমস্ত পরিচয় দিল। কহিল রাত্রে একজন লোক ঘরে গিয়াছিল। লোকটী কে তাহা সে জানে না। কিছু যে চুরি করিয়াছে তাহাও নহে। তবে বাবুর রুমাল তাহার নিজের ব্যাগে রাখিয়া গিয়াছে। ব্যাগ যেখানে থাকিত সেখানে ছিল না। ঘরের মেজেয় পড়িয়া ছিল। নলিন কহিল "আর আমার এখানে থাকা মুস্কীল হয়ে উঠ্‌ল। আমার শত্রু হয়েছে। আপনারা স্নেহ করেন বোলে চাকর বাকরেরা আমাকে হিংসা কোরতে আরম্ভ করেছে। আকার ইঙ্গিতে আমি একথা শুনতে পেয়েছি। কিন্তু এতাবৎ আমাকে নষ্ট কোরতে কেহ চেষ্টা করে নাই। আজ আমার ব্যাগে বাবুর রুমাল দেখে সে ভ্রম দূর হয়েছে। আমি শীঘ্র এখান হতে না গেলে হয় তো আমার ঘোরতর বিপদ হবে।" এই বলিয়া বিমর্ষ চিত্তে রুমাল খানি বিধুমুখীর নিকট রাখিয়া নলিন বহির্ব্বাটী আসিল।

লালবিহারী বাবু অন্যান্য দিবসাপেক্ষা প্রফুল্ল চিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। এবং সকালে সকালে কাছারি যাইতে হইবেক বলিয়া ৯টা না বাজিতে বাজিতে স্নানাহার করিয়া আপিসের কাপড় পরিধান করিলেন। অতঃপর মুখ মুছিবার জন্য পকেটে রুমাল খুজিতে গিয়া রুমাল পাইলেন না। অমনি ভৃত্যবর্গকে নিকটে ডাকিয়া তিরস্কার করিতে লাগিলেন। কহিলেন যে রুমাল লইয়াছে তাহাকে ফৌজদারী সুপর্দ্দ করিয়া মেয়াদ দিবেন। এইরূপ তম্বি করিতেছেন এমন সময় বিধুমুখী আসিয়া রুমাল খানি লালবিহারী বাবুর হস্তে দিয়া কিরূপে

কোথায় পাওয়া গিয়াছিল তাহার পরিচয় দিলেন। লালবিহারী বাবুর বড় আহ্লাদে বড় বিষাদ উপস্থিত হইল। তখন অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন কে রুমাল খান নলিনের ব্যাগে রাখিল। কিন্তু কোন রূপ সিদ্ধান্ত করিতে না পারিয়া কাছারি চলিয়া গেলেন।

বৈকালে কাছারি হইতে ফিরিয়া আসিয়া লালবিহারী বাবু বারাণ্ডায় বসিয়া আছেন এমন সময় বিধুমুখী নিকটে আসিয়া কহিলেন " তোমার নলিন যে আর থাক্‌তে চায় না ?"

লাল। আমার নলিন কি সে ? তোমারি নলিন।

বিধু। হলো, আমারি হলো, কিন্তু সে থাক্‌তে চায় না যে ? লালবিহারী বাবু মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, না থাকিলেই বাঁচেন। প্রকাশ্যে কহিলেন "কেন থাক্‌বে না ?"

বিধু। সে বোল্‌ছে তার উপর লোকে শত্রুতা কোরতে আরম্ভ কোরেছে নয়তো অন্য লোকে তার ব্যাগে তোমার রুমাল রেখে দেবে কেন ?

লালবিহারী বাবু নলিন, থাকিল বা গেল হইাতে যেন তাঁহার কোন ইষ্ট নাই এই ভান করিয়া কহিলেন "যায় যাক্।"

বিধু। যায় যাক্ তা তো বুঝ্‌লাম। আমি যে একটা অঙ্গীকার কোরে ছিলাম তার কি ? আমি তাকে বোলেছিলাম যে তুমি ওকে খরচ দিয়ে লেখা পড়া শিখাবে।

লাল। এখন তাকে কোথায় কি লেখা পড়া শিখাব ?

বিধু। নলিন বোলছে যদি তাকে মাসে মাসে ৫টা করে টাকা দেও তা হলে সে মেডীকেলকলেজে বাঙ্গলায় ডাক্তারি শেখে।

পাছে স্বীকার না করিলে নলিন না যায় এই ভয়ে লালবিহারী বাবু স্বীকৃত হইলেন। বিধুমুখী আহ্লাদিত হইয়া নলিনকে ডাকিয়া কহিলেন "বাবু তোমাকে ৫৲ টাকা করে দেবেন। বাবুকে প্রণাম কর। কৃতজ্ঞতায় নলিনের চিত্ত আর্দ্র হইল, ও চক্ষু হইতে টস্ টস্ করিয়া দুই বিন্দু জল পড়িল। নলিন নিঃশব্দে প্রণাম করিয়া বাটীর বাহিরে গিয়া আনন্দে কাঁদিতে লাগিল।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

অতি ভক্তি চোরের লক্ষণ।

যথা সময়ে জেলার জএণ্ট মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে রায় মহাশয়ের মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইল।

মোকর্দ্দমা উপস্থিত হইবার তিন চারি দিবস পূর্ব্বে সাক্ষিগণ সমভিব্যাহারে রায় মহাশয় আসিয়া সহরে পৌছিয়াছেন। বাটী হইতে যাত্রা করিবার সময় রায় মহাশয় যার পর নাই বিরক্ত হইয়াছিলেন। তদবধি মন খারাপ হইয়া রহিয়াছে। ভাবিয়া ঠিক করিয়াছেন মোকর্দ্দমা করা অপেক্ষা জেলে যাওয়া ভাল।

যে দিবস বাটী হইতে যাত্রা করিবেন তাহার পূর্ব্বদিবস রাত্রে লক্ষ্মণ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী গিয়া উপস্থিত। সস্ত্যয়ণ অবধি লক্ষ্মণ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথোপকথন হয় নাই। লক্ষ্মণ বলিয়াছিল সস্ত্যয়ণে কিছু হইবে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পক্ষে

ইহা অপেক্ষা আর অধিক অপমানের কথা কি হইতে পারে? সুতরাং তদবধি আর তিনি লক্ষ্মণের সহিত কথা কহেন না। অদ্য যখন লক্ষ্মণ আসিল তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রথমতঃ কিছু বলিলেন না। লক্ষ্মণ বলিল "ভট্টাচার্য্য মহাশয় আপনাকে একটা কথা বোল্‌তে এলাম।"

ভট্টাচার্য্য। কি কথা?

লক্ষ্মণ। বলি, কাল তো যেতে হবে?

ভট্টাচার্য্য। যে স্থলে আমাদিগকে সাক্ষ্য মেনেছেন সে স্থলে না গিয়ে আর কি করি?

লক্ষ্মণ। কি রূপে যাবেন? চলে?

ভট্টাচার্য্য। না, গরুর গাড়িতে যাওয়া যাবে।

লক্ষ্মণ। আর রায় মহাশয়? তিনি কিসে যাবেন।

ভট্টাচার্য্য। তিনি পাল্‌কীতে যাবেন?

লক্ষ্মণ। এ বন্দবস্তে আপনি সম্মত আছেন?

ভট্টাচার্য্য। কেন, দোষ কি?

লক্ষ্মণ। অবশ্য, আপনি যদি কিছু দোষ না মনে করেন তবে দোষ নাই, কিন্তু আমার একটা বক্তব্য আছে শুন্‌বেন কি?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রাগ ক্রমে কমিয়া আসিতেছে। তিনি কহিলেন "তোমার যা বক্তব্য আছে বল।"

লক্ষ্মণ বলিল "এ আপনারও নিজের কর্ম্ম নয়, আমারও নিজের কর্ম্ম নয়। রায় মহাশয়ের উপকারার্থেই আমরা সাক্ষী দিতে যাব, কিন্তু কষ্ট পেয়ে যাবার দরকার কি? যে কথাটা

বোলেছি আপনি ভাল কোরে প্রণিধান করুণ। আমরা সাফাই সাক্ষী। আমরা বোলব রায় মহাশয়ের চরিত্র ভাল, তিনি কখন পরের নামে মিথ্যা অভিযোগ করেন না। কিন্তু যারা এত ছোট লোক যে পাঁও দলে চলে যায় তাহাদের সাক্ষে রায় মহাশয়ের কি ফল হবে? মহাকুমার পরস্পর সকলকে চিনে সুতরাং চলেই যাই বা গরুর গাড়িতে যাই তাতে কোন ইতর বিশেষ হয় না। এ জেলা, জেলায় চলে গিয়ে সাক্ষ্য দিলে রায় মহাশয়েরও কোন উপকার হবে না, আর আমরাই বা কেন চলে যাব বা গরুর গাড়ির কষ্ট ভোগ কোরব?"

ভট্টাচার্য্য। ঠিক ঠিক, বেশ বলেছ। ওরে শ্যামা লক্ষ্মণকে একটা বোস্‌তে বিছানা দে? ভট্টাচার্য্য মহাশয় এতক্ষণ লক্ষ্মণকে বসিতে বলেন নাই। কিন্তু লক্ষ্মণের কথাবার্ত্তা শুনিয়া নিজ চাকরাণীকে লক্ষ্মণের বসিবার জন্য আসন আনয়ন করিতে বলিলেন।

শ্যামা আসন আনিয়া দিলে লক্ষ্মণ বসিল। তখন ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন "যদি গরুর গাড়িতে না যাওয়া হয় তবে কিসে যাওয়া যাবে?"

লক্ষ্মণ। পালকীতে?

ভট্টাচার্য্য। যদি পাল্‌কী না দেয়?

লক্ষ্মণ। অবশ্য দেবে। আমাদের মুখে জল, আমাদের মুখে খালাস। পাল্‌কী না দিলে যাব না?

ভট্টাচার্য্য। এ কথা কে বোল্‌বে?

লক্ষ্মণ। আপনি।

ভট্টাচার্য্য। আমি কিরূপে বোলবো?

লক্ষ্মণ। বোলবেন, যদি সামান্য মানুষের মতন যাই তাহলে আমাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য হবে না। যদি বড় মানুষের মতন যাই তা হলে মনে কোরবে এরা কখন মিথ্যা কথা কোচ্চে না।

ভট্টাচার্য্য। ভাল ভাল, বেশ বোলেছ। কাল যাতে সুবিধা হয় করা যাবে। একটু পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "লক্ষ্মণ কিছু জল খাবে কি?" ভট্টাচার্য্যের রাগ ক্ষান্ত হইয়া লক্ষ্মণের উপর ভক্তি হইয়াছে।

লক্ষ্মণ বলিল "না।"

ভট্টাচার্য্য ইহাতে খুসি হইলেন। লক্ষ্মণ কিছু জল খাইতে চাহিলে ঘরে এমন কিছু ছিল না যাহা তাহাকে দিতে পারিতেন। একটু পরে কহিলেন "লক্ষ্মণ চিরজীবী হয়ে থাক। আমি তোমাদের নিয়ত আশীর্ব্বাদ না কোরে জল গ্রহণ করি না।"

লক্ষ্মণ সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া কহিল "তা কি আমাকে বোলতে হবে?"

অতঃপর লক্ষ্মণ নিজ বাটীতে চলিয়া গেল। ভট্টাচার্য্যও আহারান্তে শয়ন করিলেন।

পর দিবস লক্ষ্মণের কথা অনুসারে ভট্টাচার্য্য মহাশয় রায় মহাশয়কে বলিলেন "আমি মহাশয়ের পুরোহিত, মহাশয় পালকীতে যাবেন আমি গরুর গাড়িতে যাব এতে মহাশয়ের অপযশ হবে, বিশেষ আমাদের ছোট লোক জ্ঞানে আদালতে আমাদিগের কথা বিশ্বাস না কোরলেও কোরতে পারে। আমি কিছু নিজের জন্যে বোলছি না, আপনারি মঙ্গলের জন্য।

আমাদের কি? আমরা দরিদ্র লোক, চলে গেলেও আমাদের ক্ষতি নাই, কিন্তু তাতে আপনার ক্ষতি ভিন্ন উপকার নাই।

রায় মহাশয় মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিরক্ত হইলেন কিন্তু প্রকাশে কিছু বলিতে পারিলেন না। মোকর্দ্দমা করিতে হইলে সাক্ষীদিগকে যে কিরূপ সেবা করিতে হয় তাহা যাহারা মোকর্দ্দমা না করিয়াছে তাহারা সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে না।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া রায় মহাশয় দুখানা পালকীর বায়না দিলেন। ভট্টাচায্য মহাশয় কহিলেন "দুখানায় হবে কেন? বটব্যাল ভায়া আছেন লক্ষ্মণ আছে, তাদের গরুর গাড়িতে নিয়ে যাওয়া তো উচিত নয়?"

বটব্যাল। আমার পালকীতে কাজ নেই মহাশয়। আমি এ জন্মেও পালকীতে চড়ি নাই, আজ সাক্ষী দিতে যাব ব'লেই কি পালকীতে না গেলেই হবে না?

ভট্টাচার্য্য। তুমি তো ও সব কথা বোঝনা ভায়া? রায় মহাশয় বল্‌বা মাত্রেই বুঝেছেন।

বটব্যাল। তা বুঝি না বুঝি মহাশয় আমার পালকীতে কাজ নাই।

পরদিবস শিবিকারোহণে সকলে যাত্রা করিলেন। নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌঁছিয়া রায় মহাশয় ও লক্ষ্মণ চন্দ্র প্রথমত উকীল অনুসন্ধানে নিক্রান্ত হইলেন।

প্রথমত স্বজনীকান্ত বাবুর বাসায় গেলেন। স্বজনীকান্ত বাবু সংস্কৃত ভাষায় বড় পারদর্শী, করকুষ্ঠী দেখিতে পারেন ও

জ্যোতিষ গণনা করেন। রায় মহাশয় ও লক্ষ্মণ চন্দ্র বাসায় উপস্থিত হইবামাত্র স্বজনীকান্ত বাবু আসন হইতে উঠিয়া যুগল-করে আগন্তুক দ্বয়কে অভ্যর্থনা করিলেন। রায় মহাশয় ও লক্ষ্মণ চন্দ্র উভয়ে বসিলেন। পরে স্বজনী বাবু কহিলেন "মহাশয়েরা কি কারণে অনুগ্রহ করে দাসের ভবনে পদার্পণ করেছেন?" তখন রায় মহাশয় নিজের মোকর্দ্দমার কথা বলিলেন। মোকর্দ্দমার নাম শ্রবণ করিয়াই স্বজনী বাবু ভৃত্যকে তামাক দিতে কহিলেন ও আপন মুহুরীকে বাজার হইতে জলযোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন আনিতে আদেশ করিলেন। স্বজনী বাবু নূতন উকীল। মক্কেলের জন্য যৎ-পরোনাস্তি পরিশ্রম করেন এবং শুনা আছে ব্যবসায় করিতে হইলে মক্কেলকে যত্ন না করিলে কিছু হয় না এই জন্য ইষ্টদেব নির্ব্বিশেষে মক্কেলদিগকে যত্ন করেন। জলযোগের জন্য মিষ্টান্ন আনিবার আদেশ শুনিয়া লক্ষ্মণ চন্দ্র কহিল "মহাশয় মিষ্টান্ন আনবার প্রয়োজন নাই, আমরা আহার করেই আসছি, আপা-ততঃ আমাদের মোকর্দ্দমার হালটা শুনুন। স্বজনী বাবু যেন নব পঞ্জিকা শ্রবণ করিতে বসিলেন। একাগ্র চিত্তে অন্য দিকে চক্ষু না ফিরাইয়া অনিমেষ লোচনে রায় মহাশয়ের মুখপানে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। সমস্ত শ্রবণ করিয়া স্বজনী বাবু কহিলেন তিনি মোকর্দ্দমার ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছেন। কিরূপ অর্থ লইবেন জিজ্ঞাসা করিলে কহিলেন "দশ টাকা দিলেই চলিবে।" তখন লক্ষ্মণ কহিল "আচ্ছা এখন তো আমাদের কাছে টাকা নাই। বাসা হ'তে

টাকা নিয়ে মহাশয়ের নিকট আস্‌ছি।” এই বলিয়া লক্ষ্মণ ও রায় মহাশয় উভয়ে গাত্রোত্থান করিলেন। বাহিরে আসিয়া রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন “কি বল লক্ষ্মণ, এঁকেই কি ওকালতি দেওয়া উচিত ?”

লক্ষ্মণ। আপনি ক্ষেপেছেন নাকি ? যে উকীল জান্‌বেন যত যত্ন করে সে তত নূতন, তত অকর্ম্মণ্য, ও তাহার পশার তত কম। এ কথন শুনেছেন যে উকীলে মক্কেলকে জলখাবার দেয় ?

রায় মহাশয়। আমারও তাই বোধ হচ্ছে। অতি ভক্তিই যে চোরের লক্ষণ। তখন তাঁহারা উভয়ে পরামর্শ করিয়া গৌরী বাবুর বাসায় গেলেন।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রামসিংহের প্রত্যাগমন।

লালবিহারী বাবু ও বিধুমুখীর পদধূলি লইয়া নলিন কলিকাতায় ডাক্তারি শিক্ষা করিবার জন্য গমন করিয়াছে। তদবধি লালবিহারী বাবু মনের সুখে কালাতিপাত করিতেছেন। কিন্তু শাস্ত্রের কথা মিথ্যা হইবার নহে। “চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানিচ সুখানিচ।” দিন কএক পরেই রামসিং আসিয়া উপস্থিত। রামসিং যতদিনের বিদায় লইয়া গিয়াছিল তাহা পরিপূর্ণ হইয়া গেলে লালবিহারী বাবু মনে করিয়াছিলেন হয়

তো রামসিং মরিয়া গিয়াছে অথবা অন্য কোন স্থানে কর্ম্ম পাইয়াছে। এরূপ ভাবেন নাই যে পুনরায় সেই চৌগোপ্পা বিকট মূর্ত্তি তাঁহার নেত্রপথে পতিত হইবে। কিন্তু সশরীরে রামসিংকে দর্শন করিয়া সে ভ্রম ঘুচিয়া গেল। রামসিং বাবুকে সেলাম করিয়া কহিল "হজুর আমার অত্যন্ত পীড়া হয়েছিল তাই এতদিন আসতে পারি নাই।"

লাল। কি কোরবো? তোমার ছুটী ফুরালে তোমার জায়গায় দোসরা লোক বাহাল হয়েছে। তোমার চাকরী আর নাই। এখন তুমি দোসরা জায়গায় কর্ম্মের চেষ্টা কর আর না হয় দেশে ফিরে যাও।

রামসিং। কেন বাবু তা হবে কেন? এই দেখুন আমি ডাক্তারের সার্টপীকিট এনেছি। আমি যথার্থ পীড়িত না হলে তো এ সার্টপীকিট পেতাম না?

লাল। ও সার্টপীকিটে তোমার আর কোন ফল হবে না।

রাম। আপনি একবার কালেক্টর সাহেবের কাছে আমার এ সার্টপীকিটখান পাঠিয়ে দিয়ে পত্র লিখুন। যদি তিনি কোন ইনসাফ না করেন তবে আমি কমিসনারের কাছে দরখাস্ত কোরব। আমার সামান্য চাকুরি, তাই বলেই কি বিনা অপরাধে সে চাকুরি যাবে?

লালবিহারী বাবু শুনিয়া অবাক! এ আবার কমিসনার সাহেবের নিকট দরখাস্ত করিবে! কিন্তু রামসিং পাছে গুপ্তকথা প্রকাশ করিয়া দেয় এজন্য কলেক্টর সাহেবের নিকট চিটি লিখিতে স্বীকৃত হইলেন। ভাবিলেন কমিসনার সাহেব কখন

এরূপ অবস্থায় রামসিংকে পুনরায় বাহাল করিবেন না। আশ্চর্য্যের বিষয় চিটীর জবাবে কলেক্টর সাহেব রামসিংকে পুনরায় বাহাল করিলেন ও যে কমাস ছুটীতে ছিল তাহার অর্দ্ধেক বেতন দিতে আদেশ করিলেন।

চিটীর উত্তর পাইয়া রামসিং যেরূপ আহ্লাদিত, লালবিহারী বাবু সেই রূপ বিষাদিত হইলেন। যতদিন অনুপস্থিত ছিল রামসিং তাহার অর্দ্ধেক বেতন সরকার হইতে বুঝিয়া লইল পরে লালবিহারী বাবুকে কহিল "হজুর যা দেবেন তা দিন, তা হলে একেবারে টাকা আমি বাটী পাঠিয়ে দি।"

লালবিহারী বাবু কহিলেন "তুমি এতদিন এখানে ছিলে না। আমার কাজও কিছু কর নাই। আমি তোমাকে টাকা দিব কেন?"

রামসিং। আমি জোর কোরছি না, আপনি অনুগ্রহ করে যদি দেন তাই বোলছিলাম। সরকারি কাজ তো এতদিন করি নাই কিন্তু সরকার বাহাদুর তার অর্দ্ধেক বেতন দিলেন। আমার পক্ষে উভয়েই সমান। সরকার বাহাদুর দিয়েছেন। আপনিও দিবেন মনে করেছিলাম। যদি না দেন তবে আমি আর কি কোরব? এই বলিয়া রামসিং মুখ ভার করিয়া বাবুর নিকট হইতে চলিয়া গেল।

লালবিহারী বাবু রামসিংহের ভার মুখ দেখিয়া ভীত হইলেন। বিশ রসী না যাইতে যাইতে রামসিংহকে ডাকিলেন। ডাকিয়া কহিলেন "দেখ রামসিং, যদিও তোমার কিছু পাবার কথা নাই তথাপি তুমি আমাকে পূর্ব্বের কাজে সন্তুষ্ট করেছ বোলে আমিও

এ কয়েক মাসের অর্দ্ধেক বেতন তোমাকে দিব।" এই বলিয়া কয়েক মাসের টাকা গণিয়া দিলেন। রামসিং লালবিহারী বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে চলিয়া গেল।

নলিন মেডিকেল কলেজে ভরতি হইয়াছে। মেডিকেল কলেজ একটী ক্ষুদ্র পৃথিবী বিশেষ। আর কোন কলেজ, আর কোন ইস্কুল মেডিকেল কলেজের মতন নহে। যাহারা বিশেষ যত্ন করিয়া অনুসন্ধান না করিয়াছে তাহারা এ কালেজের কিছুই জানে না। ছাত্রদিগের যে বেতন দিতে হয় তাহা যে বড় অধিক তাহা নহে, কিন্তু যে পরিশ্রম করিতে হয় সেরূপ পরিশ্রম রাস্তার কুলী মজুরেরাও করে না। এই জন্যেই বোধ হয় ধনবান লোকের পুত্রাদি কখন মেডিকেল কলেজে যায় না। প্রাতঃকালে যাইতে হয় আর সন্ধ্যার সময় ফিরিয়া আসিতে হয়। সমস্ত দিনে হয় তো দু ঘণ্টা পড়া হইল, কখন বা তিন ঘণ্টা ইহার বেশী নহে। পড়া এই ;—যে শিক্ষক মহাশয় টেবিলের নিকটে দণ্ডায়মান হইয়া নিজের হস্ত লিপি পড়িতেছেন, আর ছাত্র বা শ্রোতৃ বর্গ যাহা ইচ্ছা করিতেছে। কেহ নিদ্রা যাইতেছে, কেহ বা কোন উপন্যাস বা নাটক পড়িতেছে অথবা দুই জন কাগজ পেনসিলে গল্প করিতেছে। কথা কহিলে পাছে অধ্যাপক মহাশয় টের পান এই ভয়ে কাগজ পেনসিলেই গল্প চলে। কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিবেন না যে কালেজে ছাত্রদিগের কোন কষ্ট স্বীকার করিতে হয় না। প্রাতঃকালে ছটার সময় আসিয়াছে আর অপরাহ্ণ ছটার সময় যাইতে হইবে। মধ্যাহ্নে আহারাদি অনেকের হয় না। অপেক্ষাকৃত সঙ্গতিপন্ন

হইলে মিষ্টান্ন কিনিয়া খায়, তাহা না হইলে ছাত্রেরা মুড়ি কড়ায়ে দিনপাত করে। দিন কয়েক পরেই আবার রাত্রিতে থাকিতে হয়। তখন আরও অধিক কষ্ট হয়। যে দিন যাহার কলেজে রাত্রে থাকিবার পালা সে দিন তাহার নিদ্রার সঙ্গে প্রায় সম্বন্ধ থাকে না। আমি স্থূল এই কয়েকটী কথা মাত্র বলিলাম। বস্তুত সমস্ত কথা বলিতে হইলে একখানি গ্রন্থ না লিখিলে চলে না। নলিনকে এ সমস্ত কষ্টই সহ্য করিতে হইতেছে।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লক্ষ্মণের গূঢ় মন্ত্রণা।

রায় মহাশয় ও লক্ষ্মণ উভয়ে অনেক উকীল পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে রাধারমণ বাবুকে ওকালত নামা দিল। রাধারমণ বাবু দুতালা বাটীতে বাস করেন, দুহাতের দশ আঙ্গুলে দশটা আংটী পরেন, সর্ব্বদাই ইংরাজী কথা বলেন এবং মোকর্দ্দমা হারিলেও অর্দ্ধদণ্ড আদালতে বকাবকি করেন। লক্ষ্মণ বলিল "উকীল তো এইরূপ চাই। মোকর্দ্দমায় যা থাকে না থাকে সে তো হাকিমই বুঝ্‌বেন, কিন্তু দাঁড়ায়ে একজন বকাবকি না কোরলে হাকিম মনোযোগ কোরবে কেন ?"

বিপদে পড়িলে লোকের বুদ্ধি লোপ হয়। রায় মহাশয়েরও সেইরূপ হইয়াছিল। লক্ষ্মণ যাহা বলিল তাহাতেই সম্মত হইলেন। রাধারমণ বাবুকেই ওকালতনামা দিলেন। অতঃপর

রাধারমণ বাবু কি লইবেন সে কথা উপস্থিত লওয়ায় রাধারমণ বাবু কহিলেন সে কথা তাঁহার মোহরের বোলবে। তখন লক্ষ্মণ ও মোহরের জনান্তিকে গমন করিল। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল যে মোহরের রায় মহাশয়ের নিকট দেড় শত টাকা চাহিবে, তাহার একশত টাকা বাবুকে দিবে আর পঞ্চাশ টাকা সে নিজে ও লক্ষ্মণ এই দুই জনে ভাগ করিয়া লইবে।

এইরূপ স্থির করিয়া আসিয়া লক্ষ্মণ রায় মহাশয়ের নিকট আসিয়া কহিল "সব স্থির হয়েছে এখন উঠুন। ওবেলা টাকা দিতে হবে।"

"কত টাকা" রায় মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

লক্ষ্মণ উত্তর করিল "রাস্তায় গিয়ে বোলব।"

রায় মহাশয় জানিতেন লক্ষ্মণ এ মোকর্দ্দমায় বিলক্ষণ কিঞ্চিৎ গ্রহণ করিবে। কিন্তু লক্ষ্মণের হাতে এসমস্ত কর্ম্মের ভার অর্পণ না করিলে লক্ষ্মণ রাগ করিয়া অপর পক্ষে যাইবে তাহাও জ্ঞাত ছিলেন। সুতরাং লক্ষ্মণকে কিছু বলিবার যো নাই।

বৈকালে টাকা আনিবার সময় রায় মহাশয় রামটহলকে ডাকিলেন। রামটহল রায় মহাশয়ের বহুকালের বিশ্বাসী ভৃত্য, টাকার বাক্স ও চাবি রামটহলের নিকটে থাকে। রামটহল উপস্থিত হইলে রায় মহাশয় তাহাকে আপাততঃ একশত টাকার নোট খানি বাহির করিয়া দিতে বলিলেন। রামটহল গৃহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় নিজে নোট বাহির করিয়া না দিয়া বাক্স ও চাবিটী রায় মহাশয়ের নিকট দিয়া কহিল "আমার হাত অবসর নাই, আপনি বের কোরে দিন।"

রায় মহাশয় বাক্‌স খুলিয়া নোট দিবেন কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া নোট খানি পাইলেন না। রামটহলকে জিজ্ঞাসা করিলেন। রামটহল কহিল সে ইংরাজী পড়িতে জানে না। কোথার নোট কোথায় গিয়াছে সে কি রূপে বলিবে? যদি ইংরাজী পড়িতে জানিত তবে কেন কোন উচ্চকাজ না করিয়া ভৃত্যের কাজ করে। সে বহুকাল রায় মহাশয়ের বাটীতে আছে কখনও একটী পয়সা চুরি করে নাই। এতকাল পরে যদি রায় মহাশয়ের অবিশ্বাস হইয়া থাকে জবাব দিলেই হইল। তিন টাকার চাকরি সে বহুত পাইবে।

রামটহলের কথা শুনিয়া রায় মহাশয় কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইলেন। কহিলেন "আমি তো তোমাকে অবিশ্বাস কোর্‌ছি না। নোটখানা নাই তাই জিজ্ঞাসা কোর্‌ছিলাম কোথায় গেল?"

রামটহল। আপনি সেথান এনেছেন কি?

রায় মহাশয়ের খুব স্মরণ হইতেছে যে তিনি নোট খান আনিয়াছেন। কিন্তু খুঁজিয়া না পাওয়ায় ভাবিলেন, না আনা হইয়াও থাকিতে পারে। যাহাই হউক গবর্ণমেণ্ট গেজেটে ও অন্যান্য খবরের কাগজে নোটের নম্বর দিয়া ঘোষনা করিয়া দিলেন যে তাঁহার একশত টাকার নোট হারাইয়া গিয়াছে। আপাততঃ দশ টাকার দশ খানি নোট লক্ষ্মণের হস্তে দিয়া উকীল মহাশয়ের বাটী পাঠাইয়া দিলেন।

মোকর্দ্দমার দিবস ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রত্যুষেই সন্ধ্যাহ্নিক সমাপন করিয়াছেন। পাক শাক প্রায় প্রস্তুত হইয়াছে। রান্ন

মহাশয়ের পূজাও প্রায় সমাপ্ত হইল। বটব্যালের সন্ধ্যাহ্নিক নাই। তিনি আফিসের মৌতাত চড়াইয়া কেবল তামাকই টানিতেছেন। তদ্দর্শনে ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিলেন "বটব্যাল ভায়া, সন্ধ্যাহ্নিক কর আর নাই কর একটা ফোঁটাই নয় পর।

বটব্যাল। তাতে আর কার কি বিশেষ ফল হবে?

ভট্টাচার্য্য। তোমার আমার না হয়, রায় মহাশয়ের হবে। ফোঁটা দেখলে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত মনে কোরে আদালত সাক্ষ্য বিশ্বাস কোরবেন।

বটব্যাল। আপনি পরেছেন তো? তা হলেই হবে?

ভট্টাচার্য্য। বড় শ্লেষ কোরলে যে? আমার কথাটা গ্রাহ্য হলো না কি? ভট্টাচার্য্য মহাশয় একথাটা রাগ করিয়া বলিলেন।

বটব্যালকে ভট্টাচার্য্য মহাশয় যখন তখন ঠাট্টা করেন। বটব্যাল কখন কিছু বলে নাই। আজ বটব্যালের অন্তঃকরণটা বোধ হয় ভাল ছিল না, তাই ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া তিনিও রাগত হইয়া কহিলেন "ফোঁটা দেখলে যেখানে সকলেই অবিশ্বাস করে সেখানে আদালত একলা কেন বিশ্বাস কোরবে?"

ভট্টাচার্য্য। কে অবিশ্বাস করে? আমরা কার কি করেছি? তুমি মুখ সাম্‌লে কথা বোলো।

বটব্যাল। আপনিও একটু মুখ সামলালে ভাল হয়। আপনারা কার কি করেছেন? আপনাদের মতন চোর আর কেউ আছে? সিঁদেল চোর ভাল, ডাকাত ভাল, কিন্তু ছ্যাঁছড়া চোর কিছু নয়। আপনারা ছ্যাঁছড়া চোর।

ভট্টাচার্য্য। কি বল্লি বিট্‌লে, আমরা ছ্যাঁছড়া চোর?

বটব্যাল। ছ্যাঁছড়া চোরই তো? একটা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধের দক্ষিণা চারি আনা। যদি ষোলটা মন্ত্র পড়াতে হয় একটা মন্ত্রের দাম এক পয়সা। এই একটা একটা মন্ত্রের পাঁচ সাত কথা চুরি করেন। কত লাভ হয়? দু কড়া কি চার কড়া। বলুন দেখি এ ছ্যাঁছড়া চুরি কি না?

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রাগে শরীর কাঁপিতেছে। বটব্যালের কথায় উত্তর করিবেন এমন সময় লক্ষ্মণ আসিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ডাকিল। কহিল "ছি! আপনি কি একেবারে ছেলে মানুষ হলেন? বটব্যাল মহাশয়ের কথায় চটেন? উনি কাকে না কি বলেন?"

ভট্টাচার্য্য। রসো হে বাপু। দুটো কথা বোলে আসি।

লক্ষ্মণ। আর বোল্‌তে হবে না। কথাতেই কথা বাড়ে।

বটব্যাল। লক্ষ্মণ থাম। উনি কি বোল্‌বেন বলুন না?

পূজার ঘর হইতে রায় মহাশয় এই গোলযোগ শুনিয়া বাহিরে আসিলেন ও উভয় পক্ষকে বিস্তর সান্ত্বনা, বিস্তর তোষামদ করিয়া নিরস্ত করাইলেন।

উভয়ে নিরস্ত হইলে লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের হাত ধরিয়া স্থানান্তরে লইয়া গিয়া কহিল "মিথ্যা ঝগড়া কোরলে কি হবে? একটা কাজের কথা শুনুন। বলি আদালতে "কি গায়ে দিয়ে যাবেন?"

যে অবধি লক্ষ্মণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পালকীতে আসিবার উপায় উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছিল সেই অবধি ভট্টাচার্য্য মহাশয়

লক্ষ্মণকে বিশেষ অনুগ্রহ ও স্নেহ করেন। আশীর্ব্বাদ না করিয়া জলগ্রহণ তো এখনও করেন না পূর্ব্বেও করিতেন না।

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় কহিল "আমিতো মনে করেছি নামাবলি খানা গায়ে দিয়ে যাব। তোমার কি বিবেচনা ?"

লক্ষ্মণ। যদি আদালতে অনেকক্ষণ থাকৃতে হয় তবে শীত কোরবে যে ?

ভট্টাচার্য্য। তবে নয় বালাপোষ খানা নিয়ে যাব ?

লক্ষ্মণ। তাহলে লোকে কি বোলবে ? রায় মহাশয়ের পুরোহিতের বালাপোষ গায় ?

ভট্টাচার্য্য। আমার তো বাপু আর কোন গাত্রবস্ত্র নেই ? তুমি কি বিবেচনা কোরেছ ?

লক্ষ্মণ। আমার বিবেচনা কি শুনবেন ?

ভট্টাচার্য্য। অবশ্য। তোমার কথা শুনবো না তো কার কথা শুনবো ?

লক্ষ্মণ। যদি আমার কথা শুনেন তবে রায় মহাশয়কে বলুন যেন তাঁর ভাল শাল জোড়া আপনাকে দেন। তা হলে লোকে তুচ্ছ কোর্‌বে না। আর আমাকে জামিয়ার থান দিন, নিতান্ত না হয় নূতন বনাতখান।

ভট্টাচার্য্য। যে কথা বোলেছ মন্দ নয়। কিন্তু এক দিনের তরে শাল গায়ে দিয়ে কি বড় মানুষ হব ? আর তো কখন গায়ে উঠবে না ?

লক্ষ্মণ। আপনি তবে আমার কথা বুঝতে পারেন নি।

একবার ব্রাহ্মণ বিশেষ পুরোহিতকে যে জিনিস দান কোর্‌বেন তা কি আর ফিরিয়ে নেবেন? আমি ভৃত্য। আমাকে যা দেবেন তাও কি আর ফিরে নিতে পারবেন?

ভট্টাচার্য্য মহাশয় আহ্লাদ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন "চির-জীবী হয়ে থাক বাপু, আমার মাথায় যত চুল এত পরমায়ু তোমার হোক। তোমার প্রস্তাব আমি এক্ষণেই গিয়ে রায় মহাশয়কে ব'লছি।

লক্ষ্মণ। দেখ্‌বেন যেন আমার নাম কোরবেন না।

"ক্ষেপেছ না কি? আমি কি পাগল?" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় রায় মহাশয়ের নিকট গেলেন। লক্ষ্মণ সেই স্থানে দাঁড়া-ইয়া ভাবিতে লাগিল "এমত সুযোগ আর শীঘ্র হবে না। এই সুযোগে যদি অন্তত দু মাসের বাড়ী খরচটা না নিতে পারি তবে আর কি কোরলাম? কিন্তু লোক গুলো যে হুঁসিয়ার। দেখা যাক্। ক্ষেত্রে কর্ম্ম বিধিয়তে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় যথা দীক্ষিত সেইরূপ রায় মহাশয়ের নিকটে গিয়া বলিলেন। রায় মহাশয়ের মন একে চঞ্চল, তাহাতে লক্ষ্মণের গূঢ় বুদ্ধির মধ্যে প্রবেশ করা কাহার সাধ্য? তিনি অনায়াসেই সম্মত হইলেন কেবল তাহা নহে, ভাবিলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয় এরূপ পরামর্শ দিয়া যথার্থই তাঁহার মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন।

কাছারি যাইবার সময় রায় মহাশয় একখানি বালাপোষ ও ভট্টাচার্য্য মহাশয় রায় মহাশয়ের ভাল জোড়াটী, এবং লক্ষ্মণ জামিয়ার খানি গায়ে দিয়া যাত্রা করিলেন। বটব্যাল এক

দোহর গায়ে দিয়া গেলেন। তিনি ঘরে যাহা ব্যবহার করেন অন্যত্রেও তাহাই ব্যবহার করিবেন এই তাহার প্রতিজ্ঞা। ভট্টাচার্য্য ইহাতে সন্তুষ্ট হইলেন কারণ পাছে সকলে শাল চাহিলে কেহই না পায়। লক্ষ্মণ বটব্যালকে যার পর নাই বোকা মনে করিল। নহিলে এরূপ সুযোগ ছাড়িবে কেন?

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয়ের কারাবাস।

রায় মহাশয়ের মোকর্দ্দমা হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্বস্ত্যয়ন, পালকী আরোহণ, শাল গায়ে সকলি বৃথা হইয়া গিয়াছে। রায় মহাশয়ের ছয় মাসের কারাবাসের আদেশ হইয়াছে। রাধারমণ বাবু এত বক্তৃতা করিলেন, কারাবাসের হুকুম হইয়া গেলেও অনেকক্ষণ চেঁচাইলেন, কিছুতেই কিছু হইল না। হাকীম কোন মতেই শুনিলেন না, কিছুতেই তাঁহার মত ফিরিল না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে লক্ষ্মণ একশত টাকার নোট উকীল বাবুকে দিবার জন্য লইয়া গিয়াছিল, কিন্তু পঞ্চাশ টাকা বই তাঁহাকে দেয় নাই। বলিয়াছিল এজলাসে উপস্থিত হইবার সময় আর পঞ্চাশ টাকা দিবে। বাবুর মোহরেরকে কিছুই দেয় নাই। বলিয়া আসিয়াছিল বিচারের দিন বাবুর ও তাঁহার টাকা পরিশোধ করিবে।

ক্রমে বিচারের দিবস উপস্থিত হইল। রায় মহাশয়ের মোকর্দ্দমা পেশ হইল, উকীলের ডাক হইল, কিন্তু উকীল সমস্ত টাকা না পাইলে আসিবেন না। রায় মহাশয় জানিতেন উকীলের সহিত একশত পঞ্চাশ টাকার বন্দবস্ত হইয়াছে। অবিলম্বে আর পঞ্চাশ টাকা লক্ষ্মণের হস্তে দিলেন। লক্ষ্মণ তাহার উনচল্লিশটী টাকা নিজের পকেটস্থ করিল, আর এক টাকার একখানি ষ্ট্যাম্প খরিদ করিল, অপর দশটী টাকা উকীল বাবুর মোহরেরকে দিয়া পায় ধরিয়া কহিল "আপনি উকীল বাবুকে এজলাসে যেতে বলুন। আমি অবিলম্বে সমস্ত টাকা দিতেছি। আমাদের হাতে টাকা থাকলে এত দেরিও হত না আপনাদেরও চাইতে হ'ত না। এই দেখুন ষ্ট্যাম্প খরিদ করেছি। একজন একশত টাকা ধার দিবে। খৎ লিখিয়া দিলেই দেয়। টাকা পাবামাত্র মহাশয়ের ও উকীল বাবুর টাকা অবিলম্বে পরিশোধ কোরছি।"

মোহরের লক্ষ্মণকে সমভিব্যাহারে লইয়া উকীল বাবুর নিকট পৌছিয়া সমস্ত বিবরণ বলিল এবং ষ্ট্যাম্পখানি দেখাইল। উকীল ও মোহরের উভয়েই ফাঁদে পড়িলেন। বাবু এজলাসে গেলেন। বক্তৃতা করিলেন। মোকর্দ্দমা হারিলেন। কারাবাসের আদেশ হইলে মোহরের আসিয়া লক্ষ্মণের নিকট বাকী টাকা চাহিল। লক্ষ্মণ দেখাইল ষ্ট্যাম্প এখনও সাদা আছে, গোলযোগ বশতঃ লেখা হয় নাই। লেখা পড়া হইলেই টাকা পাওয়া যাইবে। পাওয়া গেলেই সমস্ত দেনা দিবেক। এইরূপ বাক্যালাপে পাঁচটা বাজিয়া গেল। কাছারি বন্ধ হইল। রায়মহাশয়কে

জেলে লইয়া গেল। মোহরেরকে টাকা আদায় জন্য কাছারি রাখিয়া উকীল বাবুও চলিয়া গেলেন। লক্ষ্মণচন্দ্রও এক ফাঁকে নিজ বাসায় চলিয়া আসিল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া বিরক্ত হইয়া মোহরেরও বাসায় চলিয়া গেল।

রায়মহাশয়কে যখন জেলে লইয়া যায় তখন তাঁহার দেওয়ানকে ডাকিয়া বলিয়া গেলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের নিকট হইতে শাল জোড়াটী ও লক্ষ্মণের নিকট হইতে জামিয়ার থানি যেন ফিরিয়া লওয়া হয়। এবং নিজে জেলের ব্যয়ের জন্য কুড়ীটী টাকা লইয়া গেলেন। আর কহিয়া গেলেন যখন যে টাকা চাহিয়া পাঠান তাহা যেন অবিলম্বে পাঠান হয়। রায়মহাশয় শুনিয়াছিলেন জেলখানায় ব্যয় করিতে পারিলে কোনই কষ্ট হয় না। কিন্তু সে কত টাকার কাজ তাহা তাহার সংস্কার ছিল না। তিনি যে কুড়ী টাকা লইয়া গেলেন তাহার চারি পাঁচ টাকা কাছারি হইতে জেলখানায় যাইতে যাইতে খরচ হইয়া গেল। এ খরচ কেবল পথমধ্যে কনষ্টেবলের ধাক্কা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য। আর পোনর যোল টাকা জেলখানায় পৌঁছিবামাত্র জেলের জমাদার ও প্রতিহারিরা প্রায় কাড়িয়া লইল বলিলে হয়। বস্তুত রায়মহাশয় জেলে আসিতেছেন শুনিয়া সকলেরি ধনলিপ্সা শাণিত হইয়া রহিয়াছে।

ক্ষণকাল পরেই জেলার আসিয়া রায়মহাশয়ের পরিধান বস্ত্রাদি ছাড়াইয়া লইয়া জেলের উরদী অর্থাৎ এক জাঙ্গিয়া গামুছা জামা আর টুপী পরাইয়া জেলের মধ্যে যথানিয়মে প্রবেশ করাইল।

এ দিকে রায়মহাশয়ের দেওয়ান ও বটব্যাল যথার্থই বিষণ্ণ-

চিত্তে আর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও লক্ষ্মণচন্দ্র বিষাদ ত্যাগ করিয়া বাসায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সন্ধ্যা উপস্থিত হইলে সকলে সায়ংসন্ধ্যা সমাপন করিয়া কমিটী করিয়া বিবেচনা করিতে বসিলেন এক্ষণে কি কর্ত্তব্য। সকলেরি মতে আপীল করা প্রয়োজন বোধ হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয়েরও সেই মত, অধিকন্তু এই যে আপীলের সঙ্গে সঙ্গে আর একটা বৃহৎ শিব স্বস্ত্যয়ন করা কর্ত্তব্য। বটব্যাল (বোধ হয় প্রাতঃকালের রাগের বশে) কহিলেন "যদি আবার স্বস্ত্যয়ন করিতে হয় তবে নিশ্চিন্তপুরের পঞ্চানন বেদান্ত বাগীশ দ্বারা করানই কর্ত্তব্য।"

বটব্যালের কথা শুনিয়া রাগে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ওষ্ঠাধর কাঁপিতে লাগিল। কহিলেন "কেন, আর কেউ কি স্বস্ত্যয়ন কোর্‌তে পারে না?"

বটব্যাল ইতিপূর্ব্বেই সায়ংকালের মৌতাত চড়াইয়াছিলেন। তিনি অর্দ্ধমুদ্রিতনেত্রে কহিলেন স্বস্ত্যয়ন যার চেতন আছে সেই কোরতে পারে, কিন্তু সকলের হাতে ফল হয় না।

"তবে কি আমার স্বস্ত্যয়নে ফল হয় নাই?" ক্রোধভরে ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন।

বটব্যাল সংক্ষেপে উত্তর দিলেন "তা তো স্বচক্ষেই দেখলেন?"

"কি বল্লি ম্লেচ্ছ আফিংখোর? যত বড় মুখ তত বড় কথা? আমি যদি স্বস্ত্যয়ন না কোরতাম তা হ'লে ছ মাসের জায়গায় হয় তো ছ বৎসরের মেয়াদ হতো, তার কি বল দেখি?"

বটব্যাল উত্তর করিতে যাইতেছিলেন কিন্তু দেওয়ানজী তাঁহার মুখে হাত দিয়া কহিলেন "ছি বটব্যাল মহাশয় এই কি

বিবাদের সময়? এখন কি করা কর্ত্তব্য তাই ঠিক করুন। স্বস্ত্যয়ন তো করাই যাবে, কিন্তু তা ছাড়া আর কি করা উচিত? লক্ষ্মণ, তুমি চুপ কোরে আছ কেন? তোমার বিবেচনায় কি করা কর্ত্তব্য?"

লক্ষ্মণ আপীল হইবেই হইবে জানিতে পারিয়া মনে মনে স্থির করিতেছিল "মূল মোকর্দ্দমায় এই হইল, আপীলে আর কি হইতে পারে?" সুতরাং অন্যমনস্ক বিধায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও বটব্যালের কলহে মন দেয় নাই। দেওয়ানজী দ্বারা নিজ মন্তব্য কথা ব্যক্ত করিতে আহূত হইয়া কহিল "আপীল করা তো সর্ব্বতোভাবে উচিত, কিন্তু আমি ভাব্‌তে ছিলাম এবার উকীলের দ্বারায় কাজ চল্‌বে না এক জন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা আবশ্যক।"

দেওয়ানজী। লক্ষ্মণ! তুমি আমার মনের কথা বলেছ। আমিও ঠিক্ করেছি একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য।

বটব্যালও সম্মতি দিলেন যে ব্যারিষ্টার না হইলে কার্য্য সিদ্ধি হইবে না। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগভরে বসিয়া থাকিলেন, কথা কহিলেন না।

লোকে সচরাচর বলে "যে দেয় থোয় করে মান তারি নাম যজমান, আর ন্যায় থোয় করে হিত, তারি নাম পুরোহিত।" কিন্তু যাঁহারা সূক্ষ্মদর্শী তাঁহারা জানেন যজমান নানাবিধ রকমের হইতে পারে কিন্তু পুরোহিত চিরকালই এক রূপ। যে ইচ্ছা সেই দেশ হউক, যে ইচ্ছা সেই কাল হউক পুরোহিতের চরিত্র সর্ব্বত্র ও সর্ব্বকালেই সমান। বোধ হয় যিনি পুরোহিত নাম

প্রথমে সৃজন করিয়াছিলেন তিনি চারিটী শব্দের চারি আদ্যক্ষর দিয়াই এই নাম প্রকটন করেন অর্থাৎ পুরীষের পু. রোষের রো, হিংসার হি, ও তস্করের ত। বস্তুত পুরোহিত মহাশয়দিগের চরিত্র কদর্য্য, রোষে পরিপূর্ণ, হিংসায় অন্ধ ও সামান্ত দ্রব্য চুরি করিবার জন্য লালায়িত।

ক্ষণকাল পরে পাচক আসিয়া কহিল রন্ধনাদি হইয়াছে। তখন সকলে উঠিয়া গিয়া আহারাদি করিয়া যে যাহার বিছানায় শয়ন করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও লক্ষ্মণচন্দ্র অকাতরে নিদ্রিত হইলেন। দেওয়ানজীর আর ঘুম হয় না। বটব্যালও নিদ্রা যাইতে পারিলেন না। ভাবনা, চিন্তা ও লজ্জা উভয়েরি সমান হইয়াছে। উভয়েই বিছানায় শয়ন করিয়া এপাশ ওপাশ করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ এইরূপ করিয়া বটব্যাল তামাক সাজিতে উঠিলেন। তখন দেওয়ানজী জিজ্ঞাসিলেন “বড়াল মহাশয় আপনি ঘুমান নাই ?”

বটব্যাল। আর ভাই কি কোরে ঘুমাই ?

দেওয়ানজী কহিলেন “না ঘুময়েছেন হয়েছে ভাল। আমি একটা কথা ভাবছি আপীলের কি ফল হয় না দেখে কিরূপে বাড়ী যাই ?

বটব্যাল। চিরজীবী হয়ে থাক ভাই, আমিও সেই কথা ভাবছি আর সেই জন্য আমারও ঘুম হয় নাই। তুমি আমি তো আপীলের ফল না জেনে বাড়ী যাবই না কিন্তু এছটার উপায় কি ?

দেওয়ান। তুমি কি বল ?

বটর‍্যাল। বোলে দেখা তো যাবে, কিন্তু বোধ হয় শুন্‌বে না।

পরদিবস প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও লক্ষ্মণচন্দ্র একজনে রায়মহাশয়ের যোড়াটী এবং একজন জামিয়ার খানি গায়ে দিয়া বাটী যাইবার জন্য বহিষ্কৃত হইলেন। তদ্দর্শনে দেওয়ানজী কহিলেন "ভট্টাচার্য্য মহাশয় আমাদের বিবেচনায় আর দিন কতক এইখানে থেকে গেলে হ'ত। বাড়ী তো যেতেই হবে কিন্তু আপীলে কি ফল হয় সেটা জেনে গেলে হতো না? লক্ষ্মণ তোমাকেও ঐ অনুরোধ করি।"

ভট্টাচার্য্যমহাশয় কহিলেন তাঁহার থাকিবার যো নাই। ৩।৫ টা একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ উপস্থিত আছে। তিনি না গেলে সমস্তই পণ্ড হইবে। লক্ষ্মণের থাকিতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু বাটী হইতে আসিবার সময় তাহার মাতার পীড়া দেখিয়া আসিয়াছে। বিশেষ গতরাত্রে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া তাহার মনটা নিতান্ত খারাপ হইয়াছে। তাহার না গেলেই নয়। যদি তাহার থাকা নিতান্তই প্রয়োজন হয় তবে একবার বাটীতে সকলকে না দেখিয়া আসিয়া থাকিতে পারে না।

উক্ত কথোপকথন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াই হইল। কথোপকথন শেষ হইলে পুনরায় দুই জনকে যাইতে উদ্যত দেখিয়া দেওয়ানজী কহিলেন "যদি নিতান্তই যাওয়া মত হয়ে থাকে তবে যোড়াটী আর জামিয়ারখানি রেখে যাবেন। শুনিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় বিস্মিত হইয়া কহিলেন "সে কি? আপনি যে আমাকে অবাক্ কল্লেন? একথা কি আপনি বোলছেন, না রায় মহাশয়ের কথা মত বোলছেন?"

দেওয়ান। আমার বলবার সাধ্য কি? আমি ভৃত্য বই তো নই?

ভট্টাচার্য্য। পৃথিবী তুমি দুভাগ হও, আমি তোমাতে প্রবেশ করি! হরে কৃষ্ণ! রায় মহাশয়ের কি এত কালের পর এই মতি গতি হ'ল? দান প্রতিগ্রহণ কোরবেন? বিশেষ পুরোহিতকে দান কোরো?

কথা শুনিয়া দেওয়ানজী কিঞ্চিৎ লজ্জিত হইলেন। ভট্টাচার্য্যমহাশয় তাহা বুঝিতে পারিয়া কহিলেন "আচ্ছা ফিরিয়ে দিতে হয় পরে দেওয়া যাবে" এই বলিয়া ভট্টাচার্য্যমহাশয় মুখ ফিরাইয়া চলিয়া গেলেন। তখন দেওয়ানজী লক্ষ্মণকে জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কি বল লক্ষ্মণ?" লক্ষ্মণ সংক্ষেপে "আমারও সেই কথা" এইমাত্র বলিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নকড়ীর উপর মাতৃ আজ্ঞা।

নকড়ীও রায়মহাশয়ের মোকর্দ্দমায় আসিয়াছিল। এ মোকর্দ্দমায় ফৈরাদির পক্ষে সে প্রধান সাক্ষী। প্রতিশোধ পরম উপাদেয় দ্রব্য হইলেও নকড়ীর মনে আর ইচ্ছা ছিল না যে রায় মহাশয় কষ্ট পান! রায় মহাশয় ব্রাহ্মণ, সে শূদ্র। শূদ্রে অনেক অত্যাচার সহ্য করে কিন্তু তথাপি ব্রাহ্মণের অনিষ্ট করা দূরে থাকুক অনিষ্টের কামনাও করে না। নকড়ী ভাবিয়াছিল রায়মহাশয়ের জোর বিশ পঁচিশ টাকা জরিমানা হইবে, এরূপ সর্ব্বনাশ যে হইবে তাহা সে স্বপ্নেও জানিত না। সুতরাং রায়মহাশয়ের কারাবাসের আদেশ হইলে সে মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইল। কিন্তু মনে মনে ভাবিল যে এ বিষয়ে তাহার কোনই হাত ছিল না। রায় মহাশয় নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। তিনি যদি তাহার অনিষ্ট চেষ্টা না করিতেন তাহা হইলে তাঁহারও কোন অনিষ্ট হইত না। নকড়ী যখন এইরূপ ভাবে, তখন

তাহার চিত্ত একটু ভাল হয় কিন্তু অবিলম্বেই আবার মনে হয় যে রায়মহাশয়ের জেলে যাওয়ায় তাহার গুরুতর অপরাধ হইয়াছে। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে বাটী আসিয়া মোকর্দ্দমার কথা তাহার মাতার নিকট কহিল। শুনিয়া নকড়ীর মাতা শিহরিয়া উঠিল। পল্লীগ্রামে ব্রাহ্মণেই অন্য সকল জাতির অনিষ্ট করিয়া থাকে। যখন অনিষ্ট করে তখন একটু কাঁদে কাটে। ক্ষণকাল পরে ভুলিয়া যায়। আবার সেই বড় কর্ত্তা সেই ছোট কর্ত্তা, সেই দাদাঠাকুর মামাঠাকুর হয়। নকড়ীর প্রতি অত্যাচারের দরুণ যে রায়মহাশয়ের এত গুরুতর দণ্ড হইতে পারে ইহাই তাহার মাতার সংস্কার ছিল না। সুতরাং তাঁহার কারাবাস হইয়াছে শুনিয়া অকপটে দুঃখিত হইল।

পল্লীগ্রামে অপরাপর জাতির বিবেচনায় ব্রাহ্মণেরা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। যাহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধনবান তাহাদিগের বাড়ীর প্রাচীনদিগকে কর্ত্তা বলিয়া ডাকে, অপরাপর সকলকে বাবু বলে। দ্বিতীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের উপাধির পরে মহাশয় শব্দ যোগ করিয়া সম্ভাষণ করে যথা চাটুজ্যে মহাশয়, চক্রবর্ত্তী মহাশয়। আর তৃতীয়শ্রেণীর ব্রাহ্মণদিগের সহিত সম্পর্ক পাতায় যথা দাদাঠাকুর, মামাঠাকুর ইত্যাদি। নকড়ীদের গ্রামে রায়মহাশয় সর্ব্বাপেক্ষা ধনী ও মাননীয় কিন্তু সকলে তাঁহাকে মহাশয় বলে তাহার কারণ এই যে নবাবী আমলে তাঁহাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা মহাশয় উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নকড়ী তো সামান্য লোক, নকড়ী অপেক্ষা কত কত বড় লোককে রায়মহাশয় মারিয়াছেন,

জেলে দিয়াছেন তাহার সংখ্যা নাই। অদ্য নকড়ীর জন্য সেই রায়মহাশয়ের কারাবাস, একথা শুনিয়া গ্রামে সকলেই দুঃখিত হইল। বড়লোক যত দিন বড় থাকে তত দিন সকলেই তাহাদিগকে হিংসা করে, কিন্তু বড়লোক দরিদ্র হইলে তাহার জন্য দুঃখিত হয় না এরূপ লোক খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর।

নকড়ীর মাতার দুঃখের এই এক কারণ, কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও এক গুরুতর কারণ ছিল। এই সপ্তদ্বীপা সসাগরা পৃথিবী মধ্যে নকড়ীর মাতা একমাত্র নকড়ী ভিন্ন আর কাহাকেও ভাল বাসিত না। সেই নকড়ীর জন্য রায় মহাশয় জেলে গিয়াছেন। রায়মহাশয় ব্রাহ্মণ। পাছে শাপ দেন, তাহা হইলে নকড়ীর অমঙ্গল হইবে। এই ভাবিয়া নকড়ীর মাতার চিরশুষ্ক চক্ষু আজি একটু আর্দ্র হইল। কহিল "বাবা এখন উপায় ?"

নকড়ী বলিল "মা আমি মনে করেছি একটা প্রায়শ্চিত্ত কোর্‌বো ?"

নকড়ীর মাতা। ভাল, ভাল। তাতে খরচ কি হবে ?

নকড়ী। বোল্‌তে পারিনে। কাল ভট্টাচার্য্যমহাশয়কে জিজ্ঞাসা কোর্‌বো।

নকড়ীর মাতা নকড়ীর হস্তধারণ করিয়া কহিল "বাবা, যতই খরচ হয়, একর্ম্ম অবিশ্যিই কোরবে। নয় বাড়ী ঘর বাঁধা দেব। বাবা ব্রহ্মশাপে পড়ো না, পড়ো না।"

নকড়ী মায়ের চরণে প্রণাম করিয়া কহিল "মা একর্ম্ম আমি অবশ্যই কোরবো।"

পরদিবস প্রাতে নকড়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী গমন করিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিল ভট্টাচার্য্য

মহাশয় তাহার সহিত বাক্যালাপ করিবেন কি না। যদি অন্য কোন কারণ বশত নকড়ীকে অদ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহে যাইতে হইত তাহা হইলে বোধ হয় সে যাইত না। কিন্তু প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবেক বিশেষ এ বিষয়ে মাতৃ-আজ্ঞা হইয়াছে, ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নকড়ীকে যাইতে হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় সবে প্রাতঃ সন্ধ্যা সমাপন করিয়া বসিয়াছেন। নকড়ী মনে করিয়াছিল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহার সহিত কথা কহিবেন না। কিন্তু নকড়ী প্রাঙ্গণে পৌছিবামাত্রেই ভট্টাচার্য্যমহাশয় আদর করিয়া নকড়ীকে ডাকিয়া বসিতে বলিলেন। নকড়ী বসিল। পরে ভট্টাচার্য্য জিজ্ঞাসিলেন "তবে, কি মনে করে?"

নকড়ী। উপস্থিত বিষয় মহাশয় সকলি অবগত আছেন। আপনি অবশ্য জানেন এতে আমার কোন হাত ছিল না। কিন্তু তথাপি আমার মনে হচ্ছে যেন আমি ঘোর পাপে পড়েছি। এর একটা প্রায়শ্চিত্ত করা আমার দরকার বোধ হচ্ছে। তাই আপনার কাছে ব্যবস্থা জান্‌তে এসেছি কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হবে।

ভট্টাচার্য্য। হাঁ সে ভালই করেছ। শাস্ত্রে লিখ্‌ছে "শোক-স্থানসহস্রাণি, ভয়স্থানশতানিচ" লোকের শোক ও ভয় যখন তখন হতে পারে। একারণ মুক্তিলাভের জন্য সর্ব্বদা দেবতা-দিগকে সন্তুষ্ট রাখবে। মুক্তি অর্থাৎ মুচ ধাতু কতি প্রত্যয় কোরে মুক্তি। তুমি বুদ্ধিমান্ তুমি তো সকলি বোঝ।

নকড়ী বুঝুক না বুঝুক ভট্টাচার্য্যমহাশয় যদি বুঝিয়া থাকেন তাহা হইলেই যথেষ্ট।

অতঃপর ভট্টাচার্য্যমহাশয় জিজ্ঞাসিলেন কিরূপ প্রায়শ্চিত্ত কোরবে ?

নকড়ী। খরচ পত্রের জন্য আমি পিছু পাঁও নাই, আপনি যা ব্যবস্থা দিবেন তাই কোরবো।

ভট্টাচার্য্য। নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমং। দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ।" তুমি কাপড় প্রস্তুত কোরে বিক্রয় কর, চাস বাসও কোরে থাক। অতএব শাস্ত্রমত তুমি মূদির কার্য্য কর। এ অবস্থায় শাস্ত্রে লিখেছে এক ভরি পাকা সোনা গঙ্গাস্নান কোরে ব্রাহ্মণকে দান কোরলেই সর্ব্বপাপ বিনষ্ট হয়।

নকড়ী। এক ভরি পাকা সোনা কোথায় পাব ?

ভট্টাচার্য্য। রজত খণ্ড দ্বারা কাঞ্চন মূল্য দান কোরলেই হবে।

নকড়ী। তা হলে কত টাকা লাগ্‌বে ?

ভট্টাচার্য্য। চব্বিশ টাকা।

নকড়ী। আচ্ছা আমি তাতেই রাজি আছি, কিন্তু আমার দান গঙ্গাতীরে কে গ্রহণ কোরবে ?

ভট্টাচার্য্য। এই শক্ত কথা। কিন্তু তুমি নিতান্ত ভাল মানুষ, বিশেষ আমাদিগের অনুগত। আর তোমার যাতে মঙ্গল হয় এই আমার নিয়ত বাসনা। বস্তুত আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ না কোরে জল গ্রহণ করি না। তা যদি আর কেহ না লয়, তবে আমিই নেব।

নকড়ী। আচ্ছা চেষ্টা কোরে দেখি, যদি আর কেউ নিতে না চান তবে মহাশয়ের নিকট আসবো। এই বলিয়া নকড়ী

তথা হইতে গাত্রোত্থান করিল। প্রাঙ্গণের অর্দ্ধেক গিয়াছে এমন সময় ভট্টাচার্য্যমহাশয় পুনরায় তাহাকে ডাকিলেন। এমন শীকার মুখে থেকে যাবে এ ভট্টাচার্য্যমহাশয়ের সহ্য হইল না। নকড়ী ফিরিয়া আসিলে কহিলেন তোমার আর কারু কাছে যেতে হবে না। আমি তোমার দান গ্রহণ কোরব। যদিও আমরা শূদ্রের দান গ্রহণ করি না, কিন্তু মনে হলো গঙ্গার গর্ভে দাঁড়ায়ে শূদ্রের দান গ্রহণ কোরলে সে দান গ্রহণে কোন দোষ নাই।

নকড়ী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথায় সম্মত হইয়া বাটী চলিয়া গেল। যথাকালে প্রায়শ্চিত্ত হইল। ভট্টাচার্য্য মহাশয় টাকাগুলি গ্রহণ করিলেন। নকড়ী ও নকড়ীর মাতার চিত্ত প্রফুল্ল হইল।

ত্রয়স্ত্রিংশৎ পরিচ্ছেদ।

রায় মহাশয় কারাগারে পরিচিত।

জেলখানায় বার চৌদ্দজন কয়েদী লইয়া একটী একটী দল প্রস্তুত হয় এবং এক এক দলের এক এক জন করিয়া সর্দ্দার থাকে। সর্দ্দারকে নিজ হস্তে কোন কাজ করিতে হয় না। সে তাহার অধীনস্থ কয়েদীদিগকে খাটায়। রায় মহাশয়ের আগমন বার্ত্তা শুনিয়া সকল সর্দ্দারেরই ইচ্ছা যে তিনি তাহারি দলে যান। তাহার কারণ এই যে নূতন বিশেষ ধনবান ব্যক্তি জেলে আসিলে প্রায়ই কিছু অর্থ লইয়া আইসে, আর যে সর্দ্দার হয় সে তাহার কিছু না কিছু পায়ই পায়। রায়মহাশয় অদৃষ্টক্রমে যে দলে প্রবিষ্ট হইলেন সে দলে তাঁহার জমিদারির একজন প্রজা সর্দ্দার। রায়মহাশয়কে দেখিবামাত্র সে প্রণাম করিয়া কহিল কি সর্ব্বনাশ আপনি এখানে কেন?

রায়মহাশয়। তুমি কে?

সর্দ্দার। আমি আপনার প্রজা।

রায়। আমি তো তোমাকে চিনি না?

সর্দ্দার। আপনি আমাকে কেমন করে চিন্‌বেন? আমি আপনার কেশবপুর তালুকের প্রজা। কেশবপুর আপনার বাড়ী থেকে তিন কোশ পথ তফাৎ। বিশেষ আমি প্রায়ই বাড়ী থাকি না।

রায়। কোন জায়গায় চাকরি কর কি?

সর্দ্দার। আমার চাকরি এই।

রায়। এই কি?

সর্দ্দার। দুঃখের কথা আর কেন জিজ্ঞাসা করেন। আমি বছরের মধ্যে এগার মাস জেলে থাকি। আমি আপনাকে দেখেছি কিন্তু আপনি আমাকে কেমন করে চিন্‌বেন?

রায়। কেন? তোমাকে বছরের মধ্যে এগার মাস জেলে থাক্‌তে হয় কেন?

সর্দ্দার। যদি সে কথা আপনি শুন্‌তে চান তবে আজ রাত্রিতে বলবো। এখন কথা কইলে হিতে বিপরীত ঘটবে আপনাকে আমাকে উভয়কে সাজা পেতে হবে। এখন মোটা-মুটী এক কথা বলে দি। যদি আপনার কাছে টাকা কড়ি থাকে তবে হয় এই পাতকুয়ায় ফেলে দিন, নয় আমাকে দিন।

রায়। তার মানে কি?

সর্দ্দার। আপনি যতই লুকিয়ে রাখুন টাকা থাকলে প্রকাশ হবেই হবে। প্রকাশ হলেই টাকা গুলি কেড়ে নেবে আর আপনাকে হয় বেত দেবে নয় আর কোন সাজা দেবে। আমি বহুকালের পাপী; আমি জেলের হাল বিলক্ষণ বুঝি। আমার কাছে টাকা থাকলে আমি নিজের জন্য কিছুই ব্যয় কোরবো

না। যাতে আপনি সুখে থাকেন তার চেষ্টা কোরবো। কিন্তু আমার কাছে যে টাকা থাকবে তা কেহই টের পাবে না।

অপর স্থানে যেখানে যে অপমান হউক না কেন চেনা লোকে না টের পাইলে তাহাতে তত কষ্ট হয় না। কিন্তু চেনা লোকে টের পাইলে যৎপরোনাস্তি মনস্তাপ উপস্থিত হয়। লর্ড লেক দিল্লির যুদ্ধ জয় করিয়া তাঁহার এক বন্ধুকে লিখিয়াছিলেন যে মনে করিলে তিনি দিল্লীশ্বর হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি কোম্পানীর বেতন ভোগী ভৃত্য, তিনি এ নিমকহারামের কার্য্য করিলে তাঁহার সমপাঠীরা কি বলিবে, এই ভয়ে সে কার্য্য হইতে বিরত হইয়াছিলেন। রায়মহাশয় তেমনি মনে করিয়াছিলেন তাঁহার প্রজার সহিত সাক্ষাৎ না হইলেই ভাল হইত। কিন্তু ভবিতব্যের দ্বার কে রুদ্ধ করিতে পারে?

সর্দ্দারের কথা মত রায়মহাশয় পূর্ব্বদিবসে প্রতিহারী ইত্যাদিকে ফাঁকি দিয়া যে অর্থ রাখিয়াছিলেন তাহা সর্দ্দারের হাতে সমর্পণ করিলেন। সর্দ্দার কহিল সে তাহার এক কড়াও নিজের জন্য ব্যয় করিবে না। সকলই রায় মহাশয়ের হিতের জন্য খরচ হইবেক। অতঃপর সকলেই নিয়মিত কার্য্যে ব্যাপৃত হইল। রায় মহাশয় কখন স্বহস্তে শারীরিক পরিশ্রমের কাজ করেন নাই। সুতরাং শারীরিক পরিশ্রম করিতে তাঁহার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হইল। সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া যতটুকু কাজ করা উচিত তাহা হইল না। জেলে নিয়মিত কার্য্য না করিতে পারিলে সাজা পাইতে হয়। রায় মহাশয়ের সর্দ্দার,

পাছে তাহার সম্মুখে রায় মহাশয় সাজা পান, এই ভয়ে তাঁহার বাকী কাজ সে করিয়া দিল।

জেলখানায় একবার এগারটার সময় ও একবার পাঁচ টার সময় কয়েদিরা আহার করে। সরকার বাহাদুর কাহারো ধর্ম্মের উপর হস্তক্ষেপ করেন না। কিন্তু ব্রাহ্মণে একসূর্য্যে দুইবার আহার করে না। সরকার বাহাদুর কি এ নিয়ম বজায় রাখেন? শিকেরা জন্মাবধি কখন মস্তকের কেশ ছাটে না। সে নিয়মটা বজায় রাখা হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণদিগকে দিনে দুইবার আহার দিতে সঙ্কুচিত হন না, ইহার কারণ এই একমাত্র হইতে পারে শিকেরা বলবান, ব্রাহ্মণেরা দুর্ব্বল।

রায় মহাশয়ের পাঁচ টার সময় ক্ষুধার উদ্রেক হয় নাই, এজন্য আহার করিতে অস্বীকৃত হইলেন। কিন্তু জমাদ্দার বেত্র হস্তে আসিয়া রায় মহাশয়কে কহিল আহার করিতে হইবেই হইবে। কি করেন? রায় মহাশয় অগত্যা আহার করিতে বসিলেন। কিন্তু ধর্ম্ম নষ্ট হইল, এজন্য দুঃখে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। রায় মহাশয়ের সর্দ্দার তাঁহার দুঃখের কারণ বুঝিতে পারিয়া দুঃখে কাঁদিতে লাগিল।

আহারান্তে সকলকে ঘরের মধ্যে বন্ধ করিল। রায় মহাশয়ের সর্দ্দার রায়মহাশয়ের নিকট শয়ন করিল। ক্ষণকাল পরে সকলের গোলমাল থামিলে সর্দ্দার কহিল "আমার দুর্দ্দশার কাহিনী যদি শুনতে ইচ্ছা হয়, শুনুন আমি বলি।" এই বলিয়া এই গল্প করিল। যখন আমার বয়স সতের আঠার বছর তখন আমি আর তিন চার জন একত্র হয়ে নষ্টচন্দ্র কোরতে যাই।

আমাদের বাড়ীর কাছে স্বষ্টিধর ঘোষের বাড়ীতে অনেক কুমড়ো, লেবু, নারিকেল হয়েছিল। তাই নষ্ট কোরব এই ইচ্ছা। আমরা সকলে নিঃশব্দে গিয়ে প্রথমেই যতগুলি কুমড়া ছিল সমস্ত পেড়ে টুক্‌রা টুক্‌রা কোরে কেটে ফেল্‌লাম। পরে দেখ্‌লাম একটা কলাগাছে প্রকাণ্ড এককাঁদি কলা ফলে রয়েছে। তখন সেই কলাগাছ কাটতে আরম্ভ কোরলাম। দেখতে দেখতে কলাগাছ কাটা হ'ল। গাছ এরূপ শব্দ কোরে মাটীতে পোড়ল যে তাতে কুম্ভকর্ণেরও নিদ্রা ভঙ্গ হয় কিন্তু স্বষ্টিধর বা তার বাড়ীর কারও নিদ্রা ভঙ্গ হ'ল না। তখন আমাদের আরও সাহস বাড়লো। তার গাছের সমস্ত নারিকেল পাড়লাম, গোয়ালে যত গরু ছিল সমস্ত ছেড়ে দিলাম। আরও কত কি কোরলাম তা এখন স্মরণ নাই। পরদিন স্বষ্টিধর উঠে সমস্ত দেখে একেবারে শিশুর মত কাঁদতে লাগলো। আমাদের আর আনন্দের সীমা রইল না। দুই এক দিন পরে স্বষ্টিধর জানতে পারলে যে আমরাই তার এ অনিষ্ট কোরেছি। তখন সে থানায় গিয়ে নালিস কোরল। আমরা ভাবলাম নষ্টচন্দ্র কোরেছি এতে আমাদের কোন শাস্তিই হবে না। সুতরাং যখন দারগা এলো স্পষ্ট নিজ নিজ দোষ স্বীকার কোরলাম। কিন্তু দারগা আমাদের যখন চালান দেয় তখন আমাদের প্রথম ভয়ের সঞ্চার হ'ল। তখন আর কাঁদা কাটা কোরলে কি হবে? যথা সময়ে আমাদের বিচার হয়ে ছ ছ মাস কোরে কারাবাসের হুকুম হ'ল। জেলে এসে প্রথমে মনে হ'ল এ ছমাস আর শেষ হবে না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে সময় পুরে উঠলো।

আমরাও খালাস হলাম। যখন প্রথমে জেলখানা হতে বার হলাম তখন অনেক দিন নৌকায় বাস কোরলে যেরূপ শরীর ঘোরে, ঠিক সেইরূপ বোধ হ'ল। পৃথিবী কি প্রকাণ্ড বোধ হ'ল! প্রথমে রাস্তা খুঁজে পাই না। রাস্তার লোক দেখলে লজ্জা বোধ হ'তে লাগলো যেন সকলেই জানে যে আমরা জেলে ছিলাম। ক্রমে ক্রমে নিজের গ্রামের নিকট গেলাম কিন্তু লজ্জাক্রমে দিনমান থাকতে গ্রামে প্রবেশ কোরতে পারলাম না। সন্ধ্যা হলে বাড়ী গেলাম। পিতা মাতা যে কত দুঃখ কোরলেন, কত কাঁদলেন তা বলা যায় না। পরদিন ঘরের বার হতে লজ্জা কোরতে লাগলো। কিন্তু ক্রমে ক্রমে দু একমাস পরে আবার পূর্ব্বের মতন হলাম। প্রথম প্রথম যার সঙ্গে দেখা হ'ত সেই পায়ে বেড়ীর দাগ দেখতে চেতো ও জেলখানা সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা কোরত। দু এক মাস পরে এ যন্ত্রণা হতে নিষ্কৃতি পেলাম। আবার পূর্ব্বের মত সচ্ছন্দচিত্ত হলাম। তবে যখন জেলের কথা মনে উঠত তখনই কষ্ট বোধ হ'ত। ক্রমে ক্রমে তাও সেরে গেল। এইরূপ বৎসরাবধি কেটে গেল এমন সময়ে গ্রামে দাসেদের বাড়ী সিদ হ'ল, ফের দারগা গ্রামে এলো, এবং আমাদের ও অন্যান্য কুচরিত্র লোকদের তলপ কোরে লয়ে গেল। আমরাই চুরি কোরেছি এই কথা বলাবার জন্য 'যে কত পীড়ন কোল্লে তা বলা যায় না। যাতনা সহ্য কোরতে না পেরে স্বীকার কোরলাম। পুনরায় আমাদের চালান দিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট হাজার অনুনয় বিনয় কোরে বোল্লাম যে

পুলিসের অত্যাচারে একরার করেছি, কিছুতেই কিছু হ'ল না। আবার মেয়াদ হ'ল। এবার দু বৎসরের জন্য। জেলে আসতে পূর্ব্বের মত আর ভয় হ'ল না। দুই বৎসর আবার কেটে গেল। আবার বাড়ী গেলাম। এবার আর তত লজ্জা হ'ল না। মনে মনে একটা সান্ত্বনা হ'ল লোকে যাই বলুক না আমি তো চুরি করি নাই। এইরূপ দু এক বৎসর যায় আবার আমাদের গ্রামের নিকটে এক গ্রামে চুরি হওয়ায় আমাদের ধরে নিয়ে গেল, আবার যৎপরোনাস্তি শারীরিক কষ্ট দিল, আবার চালান দিল। কিন্তু এবার খালাস হলাম। বাড়ী ফিরে এসে ভাবলাম চুরি কোরলে তো কষ্ট পাই, না কোরলেও সেই কষ্ট পাচ্ছি। এ অপেক্ষা চুরি করাই ভাল। সেই অবধি যতবার সত্য সত্যই চুরি কোরেছি তত বারই নিরাপদে কাটায়েছি। এবার যে জেলে এসেছি সে মিথ্যা মিথ্যা। এই পর্য্যন্ত শ্রবণ করিয়া রায়মহাশয় নিদ্রিত হইলেন। সর্দ্দারও গল্প বন্ধ করিল।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ডাক্তার বাবুর বাড়ী নিমন্ত্রণ।

আমাদিগের অন্তঃপুর কেমন, সেখানে কি হয় না হয় এ গ্রন্থে তাহা বিশেষরূপে কাহাকেও বলা হয় নাই। প্রথমাবধি সে বিষয় কাহাকে বলিবারও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু নাটক অভিনয়ে যেরূপ মাঝে মাঝে বাদ্য না হইলে ভাল লাগে না, গ্রন্থেও সেইরূপ মাঝে মাঝে এক বিষয় হইতে অন্য বিষয়ের কথা না বলিলে ভাল লাগে না। তাই বলিয়া পাঠক মনে করিবেন না আমি এ অধ্যায়ে যাহা লিখিব তাহা অসত্য বা অমূলক। বস্তুত এরূপ সত্য-কথাপূর্ণ পরিচ্ছেদ এ পুস্তকে অতি অল্পই আছে। যদি এ বিষয়ে কাহারো সন্দেহ থাকে তবে আমাকে পত্র লিখিলে আমি তাহার জবাব দিব এবং দেশ কাল পাত্র সমস্তই প্রকাশ করিব। কিন্তু বিদিত থাকা উচিত যে যে পাঠক আমাকে পত্র লিখিবেন তিনি যেন একখানি অর্দ্ধ আনার টিকিট পত্র মধ্য পাঠাইয়া দেন। নচেৎ তাঁহার দুই

পয়সা অপব্যয় হইবেক কারণ আমি এ সম্বন্ধে বেয়ারিং চিটী লিখিয়া জবাব দিব তাহার আর সন্দেহ নাই।

অতএব পাঠকবৃন্দ প্রস্তুত হউন। যদিও এ পরিচ্ছেদে যাহাদিগের অবতারণা করা যাইবেক তাহাদিগের সহিত আপনাদিগের আর দেখা হইবার সম্ভাবনা নাই তথাপি যে কথাটা লিখিতেছি সেটী সামান্য নহে। বস্তুতঃ সেটী এত গুরুতর যে আমি বর্ণনা করিতে পারিব কি না সন্দেহ হইতেছে। নীলকমল বাঁচিয়া থাকিলে পদ্যে তান লয় সংযোগ করিয়া তাহা গান করিতে পারিত। কিন্তু নীলকমল লোকান্তরে গমন করিয়াছে। এক্ষণে হয় বঙ্কিম বাবু, নয় হেমচন্দ্র এই দুয়ের একজন এভার না লইলে আর উপায়ান্তর নাই। কিন্তু এ দুই মহামনস্বীর কাহারু সহিত আমার পরিচয় নাই। অপরিচিত ব্যক্তির উপর কেহ কোন গুরুতর কার্য্যের ভার দিতে চায় না। আমারও ইচ্ছা নয় যে এ উৎকট কার্য্যের ভার তাঁহাদিগের হস্তে ন্যস্ত করি। অতএব যথা সাধ্য আমিই এ মহা ব্যাপার বর্ণনার ভার গ্রহণ করিলাম। বৃহৎ কার্য্যে সকলেরি ক্রটী হয়। আমারও যে হইবেক তাহার আর সন্দেহ নাই। কিন্তু মরাল যেরূপ জলটুকু বাদ দিয়া দুদটুকু খায়, আমার নিবেদন, পাঠক বৃন্দ! যেন সেইরূপ দোষটুকু বাদ দিয়া গুণটুকু গ্রহণ করেন। (শেষু কথাটা কল্পতরু হইতে নকল করা।)

ডাক্তার বাবুর গৃহিণী আজ মহাকুমার সমস্ত স্ত্রীলোকদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। লালবিহারী বাবুর স্ত্রী বিধুমুখী, মুন্সেফ বাবুর স্ত্রী জগৎমোহিনী, ও অন্যান্য ফৌজদারী ও দেওয়ানী

আমলা সকলেরি পরিবারের নিমন্ত্রণ হইয়াছে, সকলেই আসিতে সম্মত হইয়াছেন। ডাক্তার বাবুর বাটীতে আজ মহাধুম। প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী রন্ধনশালায় গিয়াছেন, ডাক্তার বাবুর উপর অনুমতি হইয়াছে তিনি আজ বাটী আসিতে পাইবেন না। সুতরাং দশটার মধ্যে নিজের কার্য্য সমাধা করিয়া তিনি বৈঠকখানা ঘরে বসিয়া আছেন। বেলা ক্রমে এগারটা বাজিয়া গেল। এমন সময়ে চারিজন বেহারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া আর্ত্তনাদ করিতে করিতে এক খানা পাল্‌কী আনিয়া ডাক্তার বাবুর প্রাঙ্গণে উপস্থিত করিল। পালকীর মধ্যে হইতে আড়াই হাত লম্বা ও দেড় হাত চওড়া একটী মাংস পিণ্ড নিষ্ক্রান্ত হইল। বাটীর অভ্যন্তর হইতে এক জন চাকরাণী আসিয়া মাংস পিণ্ড সমাদরে লইয়া গৃহের মধ্যে চলিয়া গেল। ডাক্তার বাবু ভাবিতে লাগিলেন এ কি? ক্ষণকাল পরে শুনিলেন ইনি মুনসেফ বাবুর সহধর্ম্মিণী। শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন "তবু ভাল।"

ডেপুটী ও মুনসেফ কেমন, যেরূপ গুরু ও পুরোহিত, বিড়াল ও কুকুর, গাধা ও ঘোড়া।

পুরোহিত সম্বৎসর মন্ত্র পড়ান, আর গুরু ঠাকুর বৎসরে একবার আইসেন। প্রাপ্তির বেলা কিন্তু গুরুঠাকুরের অধিক। বিড়ালের দ্বারা কোন কাজ হয় না কিন্তু বিছানায় শয়ন করেন, দুধটুকু মাছটুকু খান। কুকুর সমস্ত দিন রাত বাড়ী চৌকী দেয়, কিন্তু যদি দৈবাৎ গৃহের মধ্যে প্রবেশ করে অমনি লোকে দূর দূর বলিয়া তাড়াইয়া দেয়। ঘোড়া ও গাধার বিষয় বাক্য

ব্যয় নিষ্প্রয়োজন। মুনসেফ দশ টার সময় কাছারি যান আর পাঁচটার সময় আইসেন। যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করেন কিন্তু বেতন অল্প, খাতির অল্প, লোকের নিকট সম্মান অল্প। ডেপুটীরা দুপরের সময় কাছারি যান, চারিটা না বাজিতে বাজিতে চলিয়া আইসেন। বেতন বেশী, খাতির বেশী, লোকের নিকট সম্মান বেশী।

অদ্য মুনসেফ সকালে সকালে কাছারি গিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার স্ত্রীও ডাক্তার বাবুর বাটীতে আসিবার অবকাশ পাইয়াছেন। ডেপুটী বাবুর কাছারি যাইতে বেলা হইয়াছে এজন্য বিধুমুখী এখনও আসিতে পারেন নাই।

যখন জগৎমোহিনী আসিলেন তখন ডাক্তার বাবুর স্ত্রী রন্ধন শালায় ছিলেন বলিয়া নিজে আসিয়া তাঁহাকে আদর করিয়া বসাইতে পারেন নাই। ক্ষণকাল পরে তিনি অবকাশ পাইলেন। তখন যাঁহারা যাঁহারা আসিতে লাগিলেন সকলকেই নিজে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইতে লাগিলেন। ইহাতে জগৎমোহিনীর মনে কোন কষ্ট হয় নাই। কারণ তাঁহারা সকলেই তাঁহার নিম্ন পদস্থ। কিন্তু যখন বিধুমুখী আসিলেন এবং তাঁহাকে দেখিয়া ডাক্তার বাবুর স্ত্রী উঠিয়া গিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া গৃহের মধ্যে আনিয়া বসাইলেন তখন তাঁহার আর বরদস্ত হইল না। কেবল রাগ প্রকাশ করিবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সুযোগ পাইতেও অধিক বিলম্ব হইল না। বিধুমুখী প্রথমত জগৎমোহিনীকে দেখিতে পান নাই, সুতরাং অন্যান্য স্ত্রীলোকদিগের সহিত কথাবার্ত্তা করিতেছিলেন এবং সকলেই আগ্রহ

সহকারে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া তাঁহার কথা শুনিতেছিল। জগৎমোহিনী এক পাশে একলা পড়িলেন ইহাতে তাঁহার ক্রোধানল আরও জ্বলিয়া উঠিল।

স্ত্রীলোকের অধিকাংশ কথাবার্ত্তার বিষয় নিজ নিজ স্বামীকে লইয়া। বিধুমুখীও নিজ স্বামীর কথা কহিতেছিলেন। ক্ষণকাল পরে জগৎমোহিনী কহিলেন "তোমার সোয়ামীর কথা যে আর ফুরায় না ?"

বিধুমুখী তখন জগৎমোহিনীকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন "কি দিদি, তুমি এসেছ ? আমি এতক্ষণ তোমাকে দেখতে পাই নি।"

জগৎমোহিনী মনে করিলেন কথাটা তাঁহাকে অবজ্ঞা করিয়া বলা হইল, এজন্য তিনি কহিলেন "দেখ্‌বার অবকাশ থাকলে তো ? যে সোয়ামীর কথা পেড়েছো, তার মধ্যে তো আর তির গুলি প্রবেশ হবার যো নাই।"

বিধুমুখী জগৎমোহিনীর চেহারার ও কথার সুরে জানিতে পারিলেন যে তিনি রাগ করিয়াছেন। তখন নিজেও একটু রাগত হইয়া উত্তর করিলেন "একলা আমিই কি সোয়ামীর কথা কই তোমরা কি কও না ?"

জগৎ। কবনা কেন ? কিন্তু সোয়ামী বুঝেতো আছে ? আমার সোয়ামীর মতন ক জনের সোয়ামী আছে ? এমন সোয়ামী যার আছে তার সোয়ামীর কথা না কহাই আশ্চর্য্য।

বিধুমুখী শুনিয়া বিলক্ষণ রাগত হইলেন, কহিলেন "তোমার সোয়ামী কি গুণে এত ভাল, আর অপরের সোয়ামীই বা কি দোষ করেছে ?"

জগৎ। আমার সোয়ামী বি, এ, বি, এল। সে তো আর কেরানী গিরি করে করে মুনসেফ হয় নাই ?

বিধু। অমন কত বি এ, বি এল আমাদের কাছে চাকরির উমেদারি কোর্‌তে আসে।

জগৎ। কি, ছোটমুখে বড় কথা ? আমাদের মতন লোকে ওঁর কাছে চাকরির উমেদারি করে ?

বিধু। তোরই ছোট মুখে বড় কথা। জানিস না আমরা আর তোরাই বা কি ?

জগৎ। জানি জানি আমাকে আর শেখাতে হবে না। চিরকাল কলম পিসে পিসে আজ হাকীম হয়েছেন। ডিপুটীও হাকীম আরশলাও পাখী। আ আমার কপাল!

বিধু। না ডেপুটি হাকিম কেন, হাকিম মুনসেফ। যে কথায় কথায় জরিমানা করে, জেলে দেয়, সে হাকিম না। হাকিম যে দু টাকা আর পাঁচটাকা ধার কর্জ্জের মোকদ্দমা ক'রে বেড়ায়।

জগৎ। দুটাকা আর পাঁচ টাকা ধার কর্জ্জের মোকদ্দমা ? আমার তাঁবে ক জন পেয়াদা আছে জানিস ?

বিধুমুখী। রেখে দে তোর পেয়াদা। আমি মনে কোরলে এখনি তোকে জেলে দিতে পারি।

জগৎ। আমি মনে কোরলে এখুনি তোর বাড়ী ঘর দুয়ার ভেঙ্গে নদীর জলে ফেলে দিতে পারি।

বিধু। হ্যাঁ মনে কোরলে তোমরা গন্ধমাদনও আন্‌তে পার।

এই শ্লেষ বাক্যে জগৎমোহিনী অধিকতর রাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তদ্দর্শনে বিধুমুখীও উঠিলেন। ডাক্তার বাবুর স্ত্রী ভয়ে কম্পিতা, পাছে একটা হাতাহাতি হয়। তিনি আসিয়া ছুজনের মধ্যস্থলে দাঁড়াইলেন। অন্যান্য সকলে এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন। কেহ বা পরের কলহে কলহ করিবেন বলিয়া, কেহ বা শুদ্ধ তামাসা দেখিবার জন্য। কিন্তু এক্ষণে মুখামুখী ছাড়িয়া পাছে হাতাহাতি হয় এই জন্য সকলেই ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ছুই জনকে ছুই ঘরে লইয়া গেলেন।

ইহার পর কাহার কিরূপ আহার হইল সে কথা বলা বাহুল্য।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নকড়ী ও রামটহল।

যথা সময়ে রায়মহাশয় জেলখানা হইতে মুক্ত হইলেন।

যে দিবস তিনি মুক্ত হইবেন সে দিবস প্রাতঃকালে তাঁহার দেওয়ান একখানি গাড়ি ভাড়া করিয়া জেলখানার দ্বারে উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহার ভৃত্য পরিষ্কার বস্ত্রাদি লইয়া দণ্ডায়মান ছিল। রায়মহাশয় বাহির হইবামাত্রেই ভৃত্য আসিয়া পরিষ্কার বস্ত্রাদি প্রদান করিল। রায় মহাশয় সেই সমস্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া গাড়িতে চড়িলেন। দেওয়ান গাড়ির সম্মুখে বসিল। প্রখর কশাঘাতে অশ্বদ্বয় ধাবমান হইল।

পূর্ব্বে এক অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে দেওয়ানজী আপীল করিবেন কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। রায় মহাশয়েরও বিশ্বাস ছিল আপীল হইবেক। কিন্তু ফলতঃ আপীল হয় নাই এক্ষণে রায় মহাশয় দেওয়ানজীকে তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন যে তিনি অনেক উকীল মোক্তারের পরামর্শ লইয়াছিলেন। সকলেই আপীল করিতে নিষেধ করিয়াছিল। বলিয়াছিল আপীলে দণ্ড হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। এই কারণেই আপীল করা হয় নাই। অতঃপর রায় মহাশয় নকড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। দেওয়ানজী কহিলেন নকড়ী এ বিষয়ে গর্ব্বিত হওয়া দূরে থাকুক বরঞ্চ দুঃখিত আছে। তাহার প্রায়শ্চিত্তের কথারও উল্লেখ করিলেন। শুনিয়া রায় মহাশয় কহিলেন। "ও বকা ধার্ম্মিকের ভিটেয় ঘুঘু চরাব তবে আমি মানুষ, নতুবা আমাকে যেন কেউ মানুষ বোলে মনে না করে।"

এইরূপ নানাবিধ কথোপকথন হইতে হইতে গাড়ী রায় মহাশয়ের গ্রামে প্রবেশ করিল। ক্ষণকাল পরেই ঢাক ঢোলের বাদ্য তাঁহার কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইল। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন "এ কি?"

দেওয়ান। আপনার শুভাগমনে সকলেই আনন্দিত। তাই সকলে বাদ্য গীত ও নানাবিধ মঙ্গলাচরণ কোরেছে।

রায়। সে কি? আমি জেল খেটে আসছি, আমার জন্য এসব কেন? আমার গ্রামে আসতেই লজ্জা হচ্ছিল, কি রকমে বাড়ী প্রবেশ করবো তাই ভাবছিলাম। এ সমস্ত কেন?

দেওয়ান। এতে আর লজ্জা কি? রাজ দণ্ডে কে না দণ্ডিত হয়ে থাকে?

রায় মহাশয় কি করেন! হেঁট মস্তকে, কাহারু দিকে না চাহিয়া গাড়ির মধ্যে বসিয়া রহিলেন। ক্ষণকাল মধ্যেই গাড়ি তাঁহার বাটীতে আসিয়া পৌঁছিল।

ছয় মাসের পর রায় মহাশয়কে দর্শন করিয়া বাটীর পরিবারেরা যথা বিহিত রোদনাদি করিল। রায় মহাশয় অনেকক্ষণ বাটীর মধ্যে থাকিয়া বর্হিবাটী আসিলেন। পাড়ার সমস্ত লোক আসিয়া সেখানে সমবেত হইয়াছিল। সকলেই রায় মহাশয়ের প্রত্যাগমনে পুলকিত। কেবল এক মাত্র নকড়ী সেখানে উপস্থিত ছিল না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে রায় মহাশয়ের কারাবাসে নকড়ীর অকৃত্রিম দুঃখ হইয়াছিল। কিন্তু আজ আসিয়া সে দুঃখ প্রকাশ করিলে কে তাহার কথা বিশ্বাস করিবে? বরঞ্চ হিতে বিপরীত হইবার সম্ভাবনা। সে উপস্থিত থাকিলে অনায়াসে লোকে মনে করিতে পারিবে যে রায় মহাশয়ের দুঃখে তাহার যে আনন্দ হইয়াছে তাহাই প্রকাশ করিতে আসিয়াছে। এই সমস্ত ভাবিয়া নকড়ী যায় নাই। কে না মনে করিবে নকড়ী না যাইয়া ভালই করিয়াছে? কিন্তু গ্রামের সমস্ত লোকে যে কায করে, আর এক জনে যদি তাহা না করে, তাহা হইলে যে না করে, তাহার মনে কষ্ট হয়, ও অন্যান্য সকলের মনে রাগ হয়। যদিও রায় মহাশয়ের বাটীতে একথা কেহ কাহাকে কহিল না কিন্তু ফিরিয়া আসিবার সময় রাস্তায় সকলেই বলাবলি করিতে লাগিল "লোকটা কি পাষণ্ড! রায়

মহাশয় এত কষ্ট পেলেন তবু ওর রাগ পড়ে না? এতে ওর ভাল হবে না। রায় মহাশয় ওকে দেখ্‌বেই দেখ্‌বে। ওর সমস্ত জারি জুরি জন্মের মতন ভেঙ্গে দেবে।” এই রূপ নানা জনে নানা রূপ বলিতে বলিতে যে যাহার বাটী চলিয়া গেল।

অন্ধকার গৃহে হঠাৎ প্রবেশ করিলে কিছুই দেখা যায় না কিন্তু ক্ষণকাল তথায় অবস্থিতি করিলে ক্রমে ক্রমে বিলক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। রায় মহাশয়ের লজ্জা সেই রূপ ক্রমে ক্রমে হ্রাস হইয়া গেল। এখন আর কাহারও সহিত দেখা করিতে তাঁহার কষ্ট হয় না, বস্তুত সকলের সহিতই তাঁহার আবার সাক্ষাৎ কথোপকথন ইত্যাদি সমস্তই চলিতেছে, এক মাত্র নকড়ীর সহিত তাহার সাক্ষাৎ হয় নাই। কিন্তু তাহার কারণ নকড়ীই। নকড়ী যমের সম্মুখে যাইতে যত ভীত না হইত, রায় মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে তদপেক্ষা অধিক ভীত হইত। অনেকে পরামর্শও দিয়াছিল “যা রায় মহাশয়ের পায়ে ধরে কেঁদে পড় গিয়ে।” কিন্তু কোন মতেই নকড়ীর সাহস হইল না।

এই রূপে চারি পাঁচ মাস কাটিয়া গেল। কিন্তু নকড়ীকে কিরূপে জব্দ করিবেন একথা রায় মহাশয়ের অন্তঃকরণে নিয়ত জাগরিত আছে। তাঁহার মনোগত ইচ্ছা এই যে নকড়ী এরূপ সাস্তি পায় যে তাহার সহিত আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা না থাকে। তাহার যাহাতে প্রাণদণ্ড হয় এরূপ ইচ্ছা রায় মহাশয়ের ছিল না বটে, কিন্তু যাহাতে তাহাকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর যাইতে হয় এরূপ সংঘটন করিতে পারিলে তিনি আর কিছুই চান না।

রায় মহাশয় এই চিন্তা করিতেছেন এমন সময় তাঁহার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধির অনুকূলে একটি ঘটনা ঘটিল। ঘটনাটী এই।

রায় মহাশয়ের কারাবাস হওয়া অবধি নকড়ী রায়মহাশয়ের সম্পর্কীয় কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিত না। তাঁহার ভৃত্যবর্গের সহিতও যাহাতে না দেখা হয় এইরূপ করিয়া বেড়াইত। বস্তুত রায় মহাশয় জেলে গিয়া যে কষ্ট না পাইয়াছিলেন নকড়ী গৃহে থাকিয়া তাহার তদপেক্ষা অধিক কষ্ট বোধ করিয়াছিল। এক দিবস বর্ষাকালে নকড়ী হাটে যাইতেছে। মস্তকে একটী কাপড়ের বোচকা। নকড়ী প্রতি হাটে কাপড় বেচিতে যায়। অন্যান্য দিবস এরূপ সকালে যাইত যে রাস্তায় রায় মহাশয়ের লোক দূরে থাকুক সে সময়ে আর কেহই হাটে যাইত না। অদ্য নানা কারণে তাহার একটু বিলম্ব হইয়াছে। সুতরাং আজ হাটে যাইবার সময় রাস্তায় মাঝে মাঝে দুই চারি জন লোকের সহিত সাক্ষাৎ হইতে লাগিল। হাটে যাইবার রাস্তায় একস্থান ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় সেখানে দুইটী খেজুর গাছ দিয়া একটা শাঁকো প্রস্তুত করা ছিল। বর্ষাকালে সেই শাঁকোর উপর দিয়া অনেক লোক গমনাগমন করায় তাহার উপর বিলক্ষণ পিচ্ছল হইয়াছে। নকড়ী পা টিপিয়া টিপিয়া সেই শাঁকোর অর্দ্ধেক গিয়াছে এমন সময় রায় মহাশয়ের চাকর রামটহল তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া সেই শাঁকো আরোহণ করিল। নকড়ীর মাথায় মোট, রামটহলের তাহা নহে, সুতরাং নকড়ী অপেক্ষা রামটহল দ্রুত যাইতে সক্ষম। রামটহল নকড়ীর পশ্চাৎভাগে গিয়া নকড়ীকে দ্রুত যাইতে কহিল। নকড়ী

বলিল "রসো ভাই, দেখছো না আমার মাথায় মোট?"

"বাঁসের চাইতে কঞ্চি টনকোঁখ" রায় মহাশয় গ্রামের জমীদার হইয়া যে রূপ প্রভুত্ব না করিতেন তাঁহার ভৃত্যবর্গ তাহাপেক্ষা বেশী করিত। রামটহল শীঘ্র শীঘ্র না যাইতে পারায় পশ্চাৎ হইতে "সর" বলিয়া নকড়ীর পৃষ্ঠে এক ধাক্কা মারিল! রামটহলের মনে মনে কিঞ্চিৎ অহঙ্কারও ছিল। সে বেহারী, দুবেলা ডাল রুটী আহার করে ও প্রত্যহ সকাল বিকালে কুস্তি করে। শাক ভাত খাওয়া বাঙ্গালী তাহার সহিত মল্লযুদ্ধে কে আঁটিবে? এই সাহসে নির্ভর করিয়াই ধাক্কাটী মারা হইয়াছিল। ধাক্কার জোরে নকড়ী শাঁকো হইতে নিম্নে জলে পড়িয়া গেল ও তাহার মাথায় যে সমস্ত বস্ত্রাদি ছিল সমস্তই কর্দ্দমাকীর্ণ হইয়া পড়িল। তদ্দর্শনে নকড়ী রাগভরে রামটহলকে গালি দিল। রামটহল "কি বোলছিস বাঙ্গালী, যত বড় মুখ তত বড় কথা" এই বলিয়া হস্তস্থিত লাঠি দ্বারা নকড়ীর মস্তকে প্রহার করিল।

নকড়ী, রায় মহাশয় দূরে থাকুন তাঁহার বাটীর কুকুর বিড়ালকেও কিছু বলিবে না প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল। কিন্তু দারুণ বেদনা ও অপমানের ভরে পূর্ব্বের সমস্ত প্রতিজ্ঞা বিস্মৃত হইয়া সলম্ফে রাস্তায় উঠিয়া রামটহলের গলা ধরিয়া পৃষ্ঠদেশে দুই চপেটাঘাৎ করিল। রামটহল অমনি ভূমি তলে শয়ন করিলেন। তখন তাহার হস্তের লাঠি বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া নকড়ী সজোরে রামটহলকে এরূপ প্রহার করিল যে তাহার চৈতন্য পলায়ন করিল। অন্যান্য পাঁচ ছয় জন লোক সেখানে

জমা হইয়াছিল, তাহারা রামটহলকে হত চৈতন্য দেখিয়া তথা হইতে দ্রুতপদে প্রস্থান করিল। নকড়ীও অত্যন্ত ভীত হইল। দুই চারি বার রামটহলকে নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল রামটহল কথাও কয় না, নিশ্বাস প্রশ্বাসও ছাড়ে না। তখন থানা হইতে জল আনিয়া রামটহলের মুখে ও মাথায় দিল। ক্ষণকাল পরে জ্ঞান লাভ করিয়া দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক উঁ আঁ শব্দ করিতে লাগিল। নকড়ী টের পাইল রামটহল মরে নাই। তখনি আর কেহ পাছে টের পায় এই ভয়ে হাটে না গিয়া আপনার কাপড়ের বোচ্‌কা লইয়া পুনরায় বাটী ফিরিয়া আসিল।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

নূতন হাঙ্গামা।

যে পাঁচ ছয় জন লোক রামটহলের বিড়ম্বনা দেখিয়া দ্রুত পদে হাটে গিয়াছিল তাহারা রটনা করিল নকড়ী রাম টহলকে মারিয়া ফেলিয়াছে। অমনি দলে দলে লোক দেখিতে আসিতে লাগিল। রায় মহাশয়ও অতি সত্বর এ ঘটনার সংবাদ পাইলেন। পাইবামাত্র লোক জন পাঠাইয়া রামটহলকে পালকী করিয়া বাটী আনয়ন করিলেন। দেখিলেন রামটহলকে একেবারে পিসিয়া ফেলিয়াছে। কোথায় সে ডাল রুটীর শরীর আর কোথায় কি? লগুড়াঘাতে সমস্তই নিষ্পেষিত হইয়া গিয়াছে।

রায় মহাশয়ের অন্যান্য ভৃত্যেরা কহিল "মহাশয় হুকুম দিন, এখুনি তাঁতি ব্যাটার মুণ্ডু এনে আপনার পায়ে দি।" রায় মহাশয় সকলকে থামাইলেন। কহিলেন "এত ব্যস্ত হবার দরকার নাই। যদি কিছু কর্ত্তে হয়, পরে করা যাবে। এক রাত্রের মধ্যে ও কোথায় পালাবে?" অনন্তর তিনি বটব্যাল মহাশয়কে, ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে ও লক্ষ্মণ চন্দ্রকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সেই সাল জামিয়ারের কথা যদিও তিনি বিস্মিত হন নাই কিন্তু তথাপি ইহাদিগকে ত্যাগ করিতে পারেন না। ভট্টাচার্য্য বিষয় কার্য্যে বড় মজবুত। লক্ষ্মণ চন্দ্রকে নিজ দলে না লইলে অপর পক্ষে যাইবে। সুতরাং 'গতস্য শোচনা নাস্তি এই বাক্যের স্বার্থকতা স্মরণ করিয়া বটব্যালের সহিত অন্য দুই জনকেও ডাকিলেন।

বটব্যাল ও লক্ষ্মণ উভয়ে বাটীতে ছিলেন, সংবাদ পাইবা মাত্র আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হাটে গিয়া ছিলেন। তাঁহার অনুসন্ধান করিতে অনেকক্ষণ দেরী হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি কতক গুলি পানে খাইবার দোক্তা তামাক হস্তে আনিয়া রায় মহাশয়ের বাটী উপস্থিত হইলেন। সকলে সমবেত হইলে কি করা কর্ত্তব্য রায় মহাশয় তাহার প্রস্তাব করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় রাগে অগ্নিবৎ হইয়া কহিলেন "এক্ষুনি ও ব্যাটাকে ধ'রে এনে উত্তম মধ্যম দেওয়া উচিত। কি বল বটব্যাল ভায়া?" বটব্যালের সহিত তাঁহার যে অসদ্ভাব হইয়াছিল এক্ষণে তাহার অনেক হ্রাস হইয়াছে।

বটব্যাল হুকা টানিতে টানিতে কহিলেন "আমার বিবেচনায়

বোধ হচ্ছে আপনি যা বল্লেন তা করা উচিত নয়। আমিত মূর্খ। শাস্ত্রও জানিনে, জমিদারিও বুঝিনে। কিন্তু দেশে আইন কানন বর্ত্তমান আছে। নালিশ করাই আমার বিবেচনায় উচিত।”

রায় মহাশয়। লক্ষ্মণ কি বল?

লক্ষ্মণ। আমার কথা শুন্‌বেন?

রায় মহাশয়। সঙ্গত হলে কেন শুন্‌বো না?

লক্ষ্মণ। তবে আমার পরামর্শ এই সুযোগ পেয়েছেন এখন ছাড়বেন না। নকড়ীর সঙ্গে যাতে আপনার আর সাক্ষাৎ না হয় এই আপনার মনের কথা। তবে এ সুবিধা ছাড়্‌বেন না। আমার বিবেচনায় একেবারে খুন হয়েছে বোলে নালিশ করা উচিত।

রায় মহাশয়। তা কেমন করে হবে?

লক্ষ্মণ। খুব সহজে হবে। আপনার চাকরকে দেশে পাঠিয়ে দিন। নাম বদল ক’রে গিয়ে সেখানে থাক্। এখানে খুনের মোকদ্দমা চল্‌বে?

রায় মহাশয়। একটা লাস চাইতো?

লক্ষ্মণ। তার আভাব কি। কত লোক ওলাউঠায় এখন মরছে। একটা না একটা লাস পৌঁছে দিলেই হবে?

রায়। ডাক্তারে যে পরীক্ষা কোরবে?

লক্ষ্মণ। কল্লেই বা? এমন একটা পচা লাস দেবেন, যে তা পরীক্ষা করে কিছুই ঠিক হবে না?

রায়। তাতে কি হবে?

লক্ষ্মণ। আপনার মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হবে। ডাক্তার সাহেব নিশ্চয় কিছু বোলতে পারবেন না। সুতরাং নকড়ীর ফাঁসি হবে না। কিন্তু যা বোলবেন তাতে জন্মের মতন দ্বীপান্তর হবে।

রায় মহাশয়। কি বলেন ভট্টাচার্য্য মহাশয়? বটব্যাল কি বল।

ভট্টা। ব্যাটার যাতে ফাঁসি হয় তাই করা কর্ত্তব্য।

বটব্যাল তামাক টানিতে টানিতে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া কহিলেন "আমার বিবেচনায় এ দুয়ের কিছুই ভাল না। ফাঁসি দেওয়াও উচিত নয়, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরও উচিত নয়। কাপড়ে আগুন বেঁধে রাখা যায় না। যতই করুন সত্য কথা প্রকাশ হবেই হবে। এই জন্য আমি বলি প্রকৃত ঘটনা যা হয়েছে তাই লয়ে নালিস করা। তাতে অন্ততঃ দুই বৎসর মেয়াদ হবেই হবে। আর তা হলেই যথেষ্ট হবে।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও লক্ষ্মণ উভয়েই এই কথা শুনিয়া বটব্যালকে কাপুরুষ বলিয়া উঠিলেন। রায় মহাশয় ভুগে পণ্ডিত। তাঁহার মত বটব্যালেরই মতন কিন্তু পাছে সে কথা বলিলে আবার তাঁহাকেও কাপুরুষ বলে এই ভয়ে তিনি লক্ষ্মণের মতে মত দিলেন। তাঁহার এ মত হইবার আর একটী বিশেষ কারণ এই যে তাঁহারি অপযশ বিলোপনার্থ লক্ষ্মণ ও ভট্টাচার্য্য এত চেষ্টা করিতেছেন। যদি তিনি তাঁহাদিগের কথা না শুনেন তাহা হইলে তাহারাই বা তাঁহাকে কি মনে করিবেন?

এইরূপ স্থির হইলে সকলে একত্র হইয়া রামটহলের কাছে গমন করিলেন। বটব্যাল অসুখ হইয়াছে বলিয়া বাটী চলিয়া গেলেন। বস্তুত তাহার অসুখ হয় নাই কিন্তু তাঁহার অনভিমত কার্য্য হইতেছে দেখিয়া তিনি সেখানে থাকিতে পারিলেন না।

রায় মহাশয়, ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও লক্ষ্মণ তিন জন রামটহলের নিকট গমন করিলেন। রায় মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন "রামটহল এখন কেমন আছ?"

রামটহল। আব কেমন আছি? আমার হাডডী সব পিঁষে দিয়েছে।

রায়। এখন টাট্‌কা টাট্‌কা বলে অত দরদ হচ্ছে, একটু পরেই সারবে?

রাম। আ হজুর! আর সেরেছে! আমার যা নসিবে ছিল তাই হয়েছে। এমন প্রজাও কেউ অধিকারে রাখে!

রায় মহাশয়। সে যা হোক একটা কথা বলি। তোমার বাড়ী গাজীপুর জেলায়। তুমি অন্য এক জেলায় গিয়ে নাম বদ্‌লে থাক! আমরা তোমাকে খুন করেছে বলে মোকর্দ্দমা করি তা হলে হয় ওর ফাঁসি হবে নৈলে পুলিপোলাও হবে। এতে রাজি আছ?

রাম। তা রাজি আছি, কিন্তু আমার গুজরাণের কি হবে?

রায়। তার জন্য ভাবনা নেই। তোমারে এখন যে পাঁচ টাকা বেতন দি এ পাঁচ টাকা চিরকালি দেব।

রাম। হুজুর আপনার এক্‌বালে আমি বেঁচে আছি। হজুর যা বল্‌বেন তাই কর্‌বো।

রায়। তবে কাল সকালে কিম্বা আজ রাত্রেই যাওয়া উচিত। কাল সকালে তোমাকে কেউ দেখ্‌লে মোকর্দ্দমা চলার পক্ষে বিঘ্ন হবে।

রাম। হুজুর যখন বল্‌বেন তখনি যাব।

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

ব্যারিষ্টার "গোষ।"

রামটহল রাত্রেই চলিয়া গিয়াছে।

পর দিবস প্রাতে যথা নিয়মে থানায় সম্বাদ দেওয়া হইল। দারগা আসিয়া তদারক করিয়া রিপোর্ট দিল। নকড়ীকে জিজ্ঞাসা করিলে নকড়ী যাহা সত্য তাহাই বলিল। রামটহল প্রহারে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিল তাহা গোপন করিল না। কিন্তু তাহার পর কি হইল তাহা সে বলিতে পারিল না। দারগা রিপোর্ট করিল যে তাহার বিশ্বাস এই যে খুন হইয়াছে। রিপোর্ট গেলে চারি পাঁচ দিবস পরে লাস অনুসন্ধান করিবার হুকুম আসিল। পাঠকের স্মরণ থাকিতে পারে এ সময় ওলাউঠার প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। সুতরাং রায়মহাশয় অনায়াসে নদী হইতে একটা পচা লাস আনয়ন করিয়া দিলেন। লাস এরূপ অবস্থায় আসিল যে কাহার লাস তাহা কেহ ঠিক করিতে পারিল না। কিন্তু

দারগার পকেট ভারি করিয়া দেওয়ায় সে রায়মহাশয় যেরূপ বলিলেন সেইরূপ লিখিয়া লইল।

রিপোর্ট প্রথমতঃ পুলিস সাহেবের নিকট গেল। পুলিস সাহেব সে রিপোর্ট লালবিহারী বাবুর নিকট পাঠাইলেন। তাঁহার হুকুমে নকড়ীর চালান হইয়া হাজতে থাকিবার আদেশ হইল। এবার যাহাতে নকড়ী কোন মতে বাঁচিয়া যাইতে না পারে বিধিমত প্রকারে তাহার উদ্যোগ আরম্ভ হইল। মহাকুমায় যত ভাল ভাল উকীল সমস্তই রায় মহাশয়ের পক্ষে নিয়োজিত হইল। এ সমস্ত উকীলেরই যে প্রয়োজন ছিল তাহা নয়, পাছে নকড়ী তাহার কাহাকে নিযুক্ত করে এই ভয়ে। ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া রায় মহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্রকে একজন দক্ষ ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য কলিকাতায় পাঠাইলেন। রায় মহাশয় কহিলেন "যে সকল উকীল নিযুক্ত করা হয়েছে তাতে আর ব্যারিষ্টারের প্রয়োজন নাই, কিন্তু মফঃসলের হাকিম ব্যাটারা ব্যারিষ্টারদের ডরায় এই জন্য একজন ব্যারিষ্টার চাই।"

বটব্যাল সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি কহিলেন "যদি দরকার না থাকে তবে এত টাকা খরচ কোরে একটা কাক তাড়ান আন্‌বার দরকার কি ?

রায়। কাক তাড়ান কি ?

বটব্যাল। দেখেননি কি ক্ষেতে একটা কোরে খড়ের মানুষ গড়ে রাখে কিম্বা কাল হাড়িতে চুন দিয়ে একটা মানুষ আঁকিয়ে রাখে ? তাই দেখে জানয়ারে ভয় পায়, আর সে ক্ষেতে যায় না।

যদি ব্যারিষ্টার দরকার না থাকে তবে হাকিমকে ভয় দেখাবার জন্য এত টাকা খরচের প্রয়োজন কি ?

লক্ষ্মণ। বড়াল মহাশয় আপনি বিষয় কর্ম্ম কিছুই বোঝেন না। এ সময় আপনার পরামর্শের দরকার নাই, যখন ব্রাহ্মণ ভোজন করান হবে তখনিই আপনি পরামর্শ দিবেন।

বটব্যালের এ কথাটা ভাল লাগিল না। কিন্তু তথাপি কোন উত্তর দিলেন না। নেত্র মুদ্রিত করিয়া তামাক টানিতে আরম্ভ করিলেন।

অতঃপর লক্ষ্মণ চন্দ্র তিন শত টাকার নোট সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন।

আজ কাল ব্যারিষ্টার গলিতে গলিতে পাওয়া যায়। লক্ষ্মণ মনে করিল ভাল ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিতে হইলে অধিক টাকা লাগিবে। কিন্তু হাকিমকে ভয় দেখাবার জন্য অত টাকা খরচের প্রয়োজন কি ? নূতন ব্যারিষ্টার অধিক টাকা চাহিবে না। আবার নূতন ইংরাজ ব্যারিষ্টার অপেক্ষা বাঙ্গালি ব্যারিষ্টার সস্তা। এই ভাবিয়া হাড়কাটার গলিতে এক ব্যারিষ্টার বাবুর বাসায় গেল। দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কি ঘরে আছেন ?"

দ্বারবান উত্তর করিল "এ বাটীতে কোন বাবু লোক থাকে না।"

লক্ষ্মণ। এই না ব্যারিষ্টারের বাটী ?

দ্বারবান। হাঁ এই ব্যারিষ্টার সাহেবের বাটী।

লক্ষ্মণ বুঝিল বাবু বলায় কাজ নয়, সাহেব বলিতে হইবে।

ব্যারিষ্টার সাহেব গৌর বর্ণ। অল্প চিন্তায় মস্তক প্রায় কেশ শূন্য। মুখে অল্প অল্প বসন্তের দাগ। স্থূল কলেবর নাম বি, সি গোষ। হঠাৎ যদি কেহ ঘোষ বলে তাহা হইলে চটিয়া যান। বি সি টা বিপিনচন্দ্রের সংক্ষিপ্তসার। তাঁহার মাতা তাঁহাকে চিটী লিখিতে হইলে যদি বি সি না লিখিয়া বিপিনচন্দ্র লেখেন তাহা হইলে সে চিটি লন না।

বিলাত হইতে প্রথমতঃ আসিয়া চব্বিশ ঘণ্টা প্যান্টুলেন কোটে আবৃত থাকিতেন। ধুতি চাদর পরা দূরে থাকুক এ দেশে সাহেবেরা যে সাদা কাপড় পরেন গোষ সাহেব তাহাও পরিতেন না। সর্ব্বদাই গরম কাপড় পরিধান করিতেন। খানসামা, বাবুরচি, বেয়ারা ইত্যাদি সাহেবদিগের যাহা প্রয়োজন সমস্তই নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তখন ব্যবসায়ে নূতন প্রবৃত্ত বলিয়া খরচপত্রের জন্য তাঁহার পিতা তাঁহাকে যথেষ্ট টাকাও দিতেন।

গল্প আছে একজন ব্রাহ্মণের পুত্র খৃষ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। এক দিবস পাদরি সাহেব তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। খৃষ্টিয়ান, গিয়া দেখিলেন টেবেলে খানা সাজান রহিয়াছে। কাঁটা চামচও প্রস্তুত আছে। খৃষ্টিয়ান কখন এরূপ হাতিয়ার দ্বারা আহার করেন নাই। সকলে টেবিলে বসিলে প্রথমতঃ মাংসের ঝোল দিল। সকলেই চামচ দিয়া ঝোল খাইতে আরম্ভ করিল। খৃষ্টিয়ানও চামচেয় ঝোল তুলিলেন কিন্তু চিরকাল হাতই মুখে দেওয়া অভ্যাস, অদ্যাও হাত মুখে দিলেন সুতরাং চামচ হইতে ঝোল তাঁহার বামস্কন্ধে পড়িয়া তাহার বস্ত্রাদি নষ্ট হইয়া গেল।

ব্যারিষ্টার সাহেব নূতন সাহেবি ঘরকন্না সুরু করিয়া যৎপরোনাস্তি কষ্টে পড়িলেন। গ্রীষ্মকালে এক দিবস সন্ধ্যার সময় খানা খাইতে গিয়া দেখিলেন খানসামা পান্তা ভাতও ঠাণ্ডা মাংস টেবেলে দিয়াছে। দেখিয়া গোষ সাহেব রাগ করিয়া বলিলেন "একি ?"

খানসামা কহিল "বন্দা যখন কমিসনার সাহেবের কাছে ছিল, গরমি কালে সাহেব রোজ রোজ খানার সময় পান্তাভাত ও ঠাণ্ডা মাংস খেতেন। মনে কোরে ছিলাম হজুর ও তাই খাবেন। এ গরম মুলুকে হজুর লোকের জন্য ঠাণ্ডাই ভাল।"

গোষ সাহেবের আর রাগ করিবার যো রহিল না। কমিসনার যাহা খান তাহা যদি তিনি না খান তাহা হইলে তো তাঁহার জাতিও গেল সাহেবিও গেল। সুতরাং চুপ করিয়া থাকিলেন। খানসামার আয়েসের সীমা রহিল না। একবেলা রন্ধন করিয়া দুবেলা খাওয়ায়, ফুর্ত্তি করিয়া বেড়ায় আর রাত্রে খানা দিবার সময় হাসিয়া বাঁচে না।

একদিবস গোষ সাহেব দেখিলেন তাঁহার একটী কোটের এক জায়গার সেলাই খুলিয়া গিয়াছে। পাছে পরিধান করিলে আরও বেশী খুলিয়া যায় এজন্য সে কোটটী মেরামত করিতে দিবেন বলিয়া আর একটী কোট পরিয়াছেন। বেয়ারা দেখিবামাত্র সেই কোটটী পরিধান করিয়া গোষ সাহেবের নিকট আসিল। গোষ সাহেব গোসা করিয়া কহিলেন "আমার কোট পরেছ কেন ?"

বেয়ারা। হজুর বান্দা যব কালেক্টর সাহেবকা পাস থা তব এয়সা টুটা ফাটা কাপড়া বরাবর মিল্‌তা থা।"

গোষ। ও টুটা ফাটা হায় নাই। ছেরেফ সিলাই খোল গিয়া।

বেয়ারা। আগার আপ ইয়ে মাংতা হাম তুরন্তে উত্তর দেতা হায়। এই বলিয়া বেয়ারা কোট খুলিয়া গোষ সাহেবের টেবিলের উপর রাখিল। গোষ মহা বিপদে পড়িলেন। ভৃত্যে কাপড় খুলিয়া দিতেছে তাহা কিরূপে পরিবেন, কোটটীও নূতন, চল্লিশ টাকা খরচ পড়িয়াছে তাহাই বা কিরূপে ছাড়িয়া দেন। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কহিলেন "আচ্ছা এ কোট তোম লে লেও। লেকেন আওর কবি হামকো বেগর পুছ্‌কে কাপড়া আপড়া মত লেও।"

বেয়ারা মনে মনে হাসিতে হাসিতে কহিল "হজুর আপকা এক টুকরা সুতাবি হাম নেহি লেগা।"

এইরূপে গোষ মহাশয় সাহেবি করেন। কিন্তু সত্বর দেখিতে পাইলেন এইরূপ সাহেবিতে কেবল লোকসান মাত্র। অধিকন্তু তাঁহার পিতা মাসে মাসে যে টাকা দিতেন তাহা আর দিতে প্রস্তুত নহেন। তখন খানসামা, বেয়ারা, খিদমতগার সমস্ত বরতরফ করিয়া বাঙ্গালা চাকর রাখিলেন। পূর্ব্বে তিনজনে যে কাজ করিত এক্ষণে একজনে তাহা করে। গরম কাপড় পরিতেন কিন্তু ঘরে পাখা না থাকায় তাঁহার গায়ে এরূপ দুর্গন্ধ হইল যে অপর লোক দূরে থাকুক তিনি নিজেই নিজের গায়ের গন্ধে টিকিতে পারেন না। কাজে কাজেই তাঁহাকে ধুতি পরিতে হইল। কিন্তু এখনও ধুতি পরিয়া দ্বারের বাহিরে যান না। যদি রাস্তায় কাহার সহিত কথা কহিতে হয় তাহা হইলে দ্বারের

আড়ালে থাকিয়া মুখ বাড়াইয়া কথা কন, পাছে ধুতি পরা দেখিলে জাত যায়।

লক্ষ্মণ চন্দ্র যখন দ্বারবানের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল গোষ সাহেব মনে করিলেন একটা শীকার পাওয়া গিয়াছে। বিলাত হইতে প্রত্যাগমন করা অবধি অদ্যাপি কোন মোকর্দ্দমা পান নাই। এই প্রথম মোকর্দ্দমা পাইবার উপক্রম দেখিয়া ধুতি চাদর ব্যস্তসমস্ত হইয়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংরাজি কাপড় চোপড় পরিলেন। ক্ষণকাল পরে দ্বারবান আসিয়া জানাইল, একজন মোকর্দ্দমার জন্যে আসিয়াছে। গোষ সাহেবের আর অধরে হাসি ধরে না। কহিলেন "বল একটু পরে সাহেবের সহিত দেখা হবে।" ভাবিলেন আসিবামাত্র দেখা করায় গরজ বুঝাইবে, কিন্তু অধিকক্ষণ থাকিতেও ভয় হইতে লাগিল পাছে আগন্তুক অন্য কোন ব্যারিষ্টারের বাটীতে যায়। সুতরাং দশ বার সেকেণ্ডের মধ্যে দ্বারবানকে কহিলেন "যে ব্যক্তি আসিয়াছে তাহাকে লইয়া আইস।"

লক্ষ্মণ আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। পরে লক্ষ্মণ যে জন্য আসিয়াছে তাহার পরিচয় দিলে গোষ সাহেব তৎক্ষণাৎ তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজে যে চৌকিতে বসিয়াছিলেন তাহার নিকটে একখানি চৌকিতে তাহাকে বসাইলেন। অতঃপর মোকর্দ্দমার হাল শুনিয়া কহিলেন তিনি অবশ্যই এ মোকর্দ্দমায় উপস্থিত থাকিবেন এবং যাহাতে জিত হয় তাহা করিবেন। লক্ষ্মণ মনে মনে কহিতে লাগিল "তোমার হাতে চালানের ভার পড়লেই তো প্রতুল।" লক্ষ্মণ ব্যারিষ্টার সাহে-

বের দুই চারি কথা শুনিয়াই তাঁহার বিদ্যার দৌড় বুঝিয়া লইয়াছে।

পরে টাকার কথা উপস্থিত হইল। ব্যারিষ্টার সাহেব জিজ্ঞাসিলেন "কি দিবেন?"

লক্ষ্মণ ছেলে মানুষ নয়। সে হঠাৎ নিজে সে বিষয়ে কিছু না বলিয়া জিজ্ঞাসিল "মহাশয় কি চান?"

ব্যারিষ্টার সাহেব কোন বিষয়ে ভাবিতে হইলে বাম নেত্র মুদ্রিত করিয়া, এবং ওষ্ঠাধর বামদিকে আকর্ষণ করিয়া মুখ খানি বক্র করত মাথা কণ্ডুয়নে প্রবৃত্ত হন। এক্ষণে কি জবাব দিবেন তাহা ভাবিয়া লইতে গিয়া ঠিক সেইরূপ আকৃতি ধারণ করিলেন। যে মূর্ত্তি হইল তাহা দেখিয়া লক্ষ্মণের হাসি সম্বরণ করা ভার হইল। কি করে, অতি কষ্টে দক্ষিণ হস্ত দ্বারা নিজের মুখ আবৃত করিয়া হাসি ঢাকিবার জন্য কাসিতে লাগিল।

ব্যারিষ্টার সাহেব বিষম সমস্যায় পড়িয়া গেলেন। যাহা বলিবেন তাহা যদি লক্ষ্মণ অল্প মনে করে তা হলে পশার ক্ষতি,—অধিক বলিলে পাছে তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্য লোকের কাছে যায়। ক্ষণকাল এইরূপ চিন্তা করিয়া জিজ্ঞাসিলেন "এখান থেকে কতদূর যেতে হবে?"

লক্ষ্মণ। আজ্ঞে চব্বিশ ক্রোশ।

ব্যারিষ্টার। কিসে, রেলে না গাড়িতে?

লক্ষ্মণ। গাড়িতে কতক রেলে কতক।

ব্যারিষ্টার। আচ্ছা আমি আমার মুহুরীকে (clerk) জিজ্ঞাসা করে বলছি।

পল্লিগ্রামের দু এক স্থানে এরূপ নিয়ম আছে যে যখন পুরুষ মানুষ বাটী না থাকে তখন যদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি আসিয়া কাহার অন্বেষণ করে, অথবা অন্য কোন কথার প্রশ্ন করে তখন বাটীর স্ত্রীলোকেরা ক্ষণকাল কথা কহে না। তাহাতে যদি আগন্তুক সে ব্যক্তি বাটী নাই না বুঝিয়া পুনঃ পুনঃ অনুসন্ধান করে তখন অগত্যা একজন স্ত্রীলোকে হাঁকিয়া বলে " ও খোকা, বল তিনি বাড়ী নাই ?" অথচ খোকা তাহার কোন পুরুষেও নাই কিম্বা হয়ও নাই।

ব্যারিষ্টার সাহেবের তেমনি কোন পুরুষেও মোহরের ছিল না। কিন্তু আড়ম্বর ও বাজার গরম করিবার জন্য এই রূপ বলিলেন। যাহা হউক উঠিয়া গিয়া ক্ষণকাল পরে আসিয়া বলিলেন তিন শত টাকা দিতে হইবেক। লক্ষ্মণ একশত বলিল। ব্যারিষ্টার দুই শতে নামিলেন। লক্ষ্মণ দেড় শতে উঠিল। ব্যারিষ্টার সম্মত হইলেন কিন্তু কহিলেন "একথা কাহাকে বলো না। তুমি নিতান্ত বিপদে পড়েছ বলে আমি অত অল্প টাকায় যেতে স্বীকার কোরলাম।"

লক্ষ্মণ। তা হলে একটা কাজ করা চাইতো, কিন্তু সে কথা আমার হুজুরের নিকট বোল্‌তে ভয় হচ্ছে ?

ব্যারিষ্টার। কিছু ভয় নাই, সচ্ছন্দে বল।

লক্ষ্মণ। তবে রসিদটা তো তিনশ টাকার দিতে হবে ?

ব্যারিষ্টার কাল বিলম্ব না করিয়া কহিলেন "হাঁ তা তো দিতেই হবে। তা যেখানে উপকার কোরতে বসেছি সেখানে সর্ব্বতোভাবেই করবো।"

লক্ষ্মণ অমনি পকেট হইতে দেড়শত টাকার নোট ও রসিদ ষ্ট্যাম্প বসান একখানি কাগজ বাহির করিল। নোট গণিয়া লইয়া ব্যারিষ্টার সাহেব কাগজখানিতে তিন শত টাকার রসিদ লিখিয়া দিলেন। বাকী দেড় শত টাকা লক্ষ্মণের হইল।

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শত্রুতা সাধনের চরম চেষ্টা।

রায়মহাশয়ের বাটীতে ধূম ধামের সীমা নাই। নকড়ীর যে হাজত হইয়াছে ইহারি জন্য গ্রামের কালী বাড়িতে মহা সমা-রোহে পূজা দেওয়া হইয়াছে এবং ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে পুনরায় শিব সস্ত্যয়ণ আরম্ভ হইয়াছে। এবার গাভী ঘৃতে তাহার আর সন্দেহ নাই। বাটীতে দুগ্ধ আনয়ন করিয়া ভট্টা-চার্য্য মহাশয়ের সমক্ষে ঘৃত প্রস্তুত হইয়াছে। আর আর যে সকল উদ্যোগ করা উচিত তাহার কোন ক্রটী হয় নাই। সাক্ষী-গুলি চমৎকার হইয়াছে। ব্যারিষ্টার হউন আর উকীলই হউক কেহই তাহাদিগকে অপ্রতিভ করিতে পারিবেন না। সাক্ষী নির্ব্বাচনের সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয় লক্ষ্মণ ও রায় মহাশয় অনেক তর্ক বিতর্ক করিয়াছিলেন। সকলের নাম ঠিক হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বলিলেন “সইন্দ্র তক্ষক সহায় কোরলে হয় না ?”

রায়মহাশয় জিজ্ঞাসিলেন “তার মানে কি ?”

ভট্টাচার্য্য। বুঝ্‌লেন না ? নলিন যত দূর সাধ্য আপনার

অনিষ্ট কোরতে ক্রটী করে নাই। সে এক্ষণে কলিকাতায় আছে, তার কিছু কোরবার যো নাই, কিন্তু এরূপ উপায় আছে যা দ্বারা তাকে এরূপ কষ্ট দেওয়া যেতে পারে যে সেরূপ কষ্ট সে জন্মেও পায় নাই।

লক্ষ্মণ। তাকে কষ্ট দিয়ে কি হবে? মনে করে দেখুন তার দোষ কি? সে কি অন্যায় কাজ কোরেছে?

ভট্টাচার্য্য। দুষ্টের দমন সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। ছলে বলে কৌশলে, যেরূপে হোক দুষ্টের দমন কর্ত্তব্য। মনে কর সে যদি ডেপুটী বাবুর বাটী না থাকতো তা হলে কি রায়মহাশয়ের এরূপ শাস্তি হ'ত?

রায়মহাশয়। কেমন কোরে এখন তাকে শাস্তি দেওয়া যায়?

ভট্টাচার্য্য। তার ভগ্নীকে সাক্ষী মেনে দিন। তাঁকে তো আদালতে যেতে হবে? তা হলেই যথেষ্ট শাস্তি হ'ল।

লক্ষ্মণ। আপনি বলেন কি?

ভট্টাচার্য্য। আমি বেশ বোলতেছি। আমার বিবেচনায় একার্য্য সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

লক্ষ্মণ। তবে যা বিবেচনা হয় করুন।

রায়মহাশয় ও লক্ষ্মণ কাহারো এবিষয়ে মত ছিল না কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের অনুরোধে স্বীকৃত হইয়া মনোরামাকে সাক্ষী শ্রেণীর মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন।

পল্লীগ্রামে একথা চিরকাল প্রচলিত আছে যে যাহাকে আর কোন রূপে জব্দ করা না যাইতে পারে তাহার বাটীর

স্ত্রীলোকদিগকে সাক্ষী মানিয়া তাহাকে জব্দ করিবে। শত্রুতা সাধনের চরম চেষ্টা এই। রায়মহাশয় ও লক্ষ্মণ চিরকাল মোকর্দ্দমা মামলা করিয়াছেন বটে কিন্তু এরূপ প্রতিহিংসা পরায়ণ কখনও হন নাই। অদ্য ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের পরামর্শে অনিচ্ছা সত্ত্বেও এই কার্য্য করিতে হইল।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সমন জারি।

প্রতিহিংসারূপ সুস্বাদু ফল সংসার বৃক্ষে আর ফলে না। কিন্তু এটা ইংরাজি কথা। বাঙ্গালায় ইহার অর্থ এই যে তোমার অনিষ্ট করিয়াছে তাহাকে জব্দ করিতে পারিলে যেরূপ সুখ হয়, এরূপ সুখ আর কিছুতেই হয় না। মনোরমাকে সাক্ষী মানায় রায় মহাশয়ের যদিও অধিক সুখবোধ হয় নাই, কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বিলক্ষণ সুখ হইল।

যথা সময়ে আদালত হইতে মনোরমার নামে সমন বাহির হইল। সরল হৃদয়া মনোরমা সমনের নামও কখন শুনেন নাই। তাঁহার বাটীতে কখনও পেয়াদাও আইসে নাই, চাপরাসীও আইসে নাই। পেয়াদা চাপরাসী দূরে থাকুক গরিব বলিয়া গ্রামের চৌকিদারও কখন রাত্রিকালে মনোরমাকে বাটী গিয়া তাঁহাকে ডাকে নাই। আজি সেই

মনোরমার বাটিতে মাথায় লাল পাগড়ী গালে চৌগোপ্পা যমদূতের ন্যায় একব্যক্তি আসিয়া প্রাঙ্গন হইতে 'মনোরমা ব্যাওয়া, মনোরমা ব্যাওয়া'' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিল।

গৃহের জানালার ভিতর দিয়া মনোরমা পেয়াদা দেখিয়া অত্যন্ত ভয় পাইলেন। বাটী একাকিনী থাকিতেন বলিয়া মনোরমাকে অনেকের সহিত কথা কহিতে হইত। অদ্যও বোধ হয় বাহির হইয়া আসিয়া কথা কহিতেন, কিন্তু দুটী কারণ বশতঃ তাহা করিলেন না। প্রথমতঃ তাঁহাকে কেহ কখন বেওয়া বলিয়া ডাকে নাই, সুতরাং বেওয়া বলিয়া অভিহিত হওয়ায় অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। দ্বিতীয়তঃ পেয়াদা পাছে তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যায় এই ভাবিয়া তিনি কুটিরের দ্বার বন্ধ করিলেন। পেয়াদা জানিতে পারিল কুটীরের অভ্যন্তরে লোক আছে। তখন কহিল "তাই হলেই হলো। তুমি বাহিরে এস আর না এস সে তোমার ইচ্ছা। আমি যে জন্যে এসেছিলাম তা হয়েছে।" এই বলিয়া সমনখানি তাহার দপ্তর হইতে বাহির করিয়া কুটীরের একখুঁটীর গায়ে বাধিয়া দিয়া গেল। কহিল " এই সাক্ষ্য দিবার সমন বাঁধিয়া গেলাম'' এই বলিয়া পেয়াদা চলিয়া গেল। তখন মনোরমা বাহিরে আসিয়া দেখিলেন এক খণ্ড কাগজ খুঁটীর গায়ে ঝুলিতেছে। মনোরমা কাগজখানি লইয়া পড়িয়া দেখিলেন। সমস্তই প্রায় ছাপার হরপ, অতি অল্পই হাতের লেখা। ছাপা অবলীলাক্রমে পড়িলেন কিন্তু হস্তাক্ষর ভাল পড়িতে পারি-লেন না। কিন্তু ভালই পড়ুন আর মন্দই পড়ুন বুঝিতে

কিছু পারিলেন না। রবিন্‌সনি বাঙ্গালা তাঁহার বোঝা দূরে থাকুক বিদ্যাসাগর মহাশয় বুঝিতে পারেন কিনা সন্দেহ। অতঃপর তিনি কাগজখানি হাতে করিয়া মকড়ীর বাটীতে গেলেন, দেখিলেন মঙ্গল বাটীতে আছে। তখন মঙ্গলকে কহিলেন "মঙ্গল এই কাগজখানা কারুকে দিয়ে পড়িয়ে আন্‌তে পার ?"

মঙ্গল কহিল " পড়িয়ে আনবার ফল কি ? আমার কি মনে থাকবে ?"

মনোরমা। তবে কি হবে ? আমি তো এক রকম ছাপার লেখাটা প'ড়তে পেরেছি, কিন্তু তায় ফল কি ? ওর মানে কিছু বুঝ্‌তে পারিনি।

মঙ্গল। তবে এক কাজ কোল্লে হয় না ? আমি লক্ষ্মণ গুপ্তকে ডেকে আনি, সে এসে পড়ে আপনাকে বুঝিয়ে দেবে।

মনোরমা। সেই পরামর্শ ভাল। তুমি একবার তার কাছে যাও দেখি লক্ষ্মী।

মঙ্গল একখানি চাদর স্কন্ধে ফেলিয়া লক্ষ্মণের বাটী গেল। লক্ষ্মণ খবর পাইবামাত্রেই চলিয়া আসিল। মনে করিল ইহাতেও দুপয়সা হবার সম্ভাবনা। লক্ষ্মণ মনোরমার বাটীতে আসিয়া সমনখানি পাড়িয়া তাহার অর্থ বুঝাইয়া দিল। চারি দিবস পরে মনোরমাকে আদালতে গিয়া সাক্ষ্য দিতে হইবেক। শুনিয়া মনোরমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিলেন " কিসের সাক্ষ্য দিতে হইবেক ?"

লক্ষ্মণ কহিল "নকড়ীর নামে এক খুনি মোকর্দ্দমা উপস্থিত হয়েছে। তার যা জানেন তাই গিয়ে আদালতে বলে আস্‌তে হবে।"

মনোরমা। আমি শুনেছি যে তার নামে রায় মহাশয়েরা এক মোকর্দ্দমা রুজু করেছেন, কিন্তু এ ছাড়া আর তো কিছু জানিনে, তবে আমার যাবার দরকার কি?

লক্ষ্মণ। সুদ্ধ আপনি এছাড়া আর যে কিছু জানেন না তাই বল্‌বার জন্য।

মনোরমা। মঙ্গল গিয়ে বলে এলে হয় না?

লক্ষ্মণ। না।

মনোরমা। তবে এর উপায়? আমি বিধবা মানুষ, কথন গ্রামের বাহির হই নাই, আমি কেমন করে আদালতে যাব?

লক্ষ্মণ। তা হাকিম শুনবেন না।

মনোরমা। যদি কিছু খরচ পত্র কল্লে এদায় থেকে উদ্ধার হতে পারি, আমি তা কোত্তেও রাজি আছি। তখন মনোরমা লক্ষ্মণের হস্ত ধারণ করিয়া কহিলেন "বাবু আমি তোমার হাত ধোরছি, যাতে আমি এদায় হতে উদ্ধার হতে পারি তাই করে দেও। লোকে তোমাকে বড় বুদ্ধিমান বলে। দেখ দেখি বাবু যদি কোন কৌশলে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে পার তা হলে আমি এ জন্মেও তোমার উপকার ভুল্‌ব না। আমি দুটাকা পর্য্যন্ত দিতে রাজি আছি। মনোরমা মনে করিলেন দুটাকা বড় ছোট কথা নয়।

লক্ষ্মণ মনে মনে ভাবিল "ইহার ভাই তো চারি টাকা বেতন

পায়, তা হতেও এ কিঞ্চিৎ বাঁচিয়েছে, কিন্তু কেবল যে দু টাকা মাত্র বাঁচিয়েছে তাহা অসম্ভব। যেখানে দুটাকা আছে সেখানে আরও কিছু আছে তার সন্দেহ নাই।” প্রকাশে কহিল “টাকায় সকলি হয়। টাকায় বাঘের দুদ পর্য্যন্ত মেলে, কিন্তু এ দুটাকার কাজ নয়।”

মনোরমা। তবে কত চাই ?

লক্ষ্মণ। দশ টাকার কমে কোন মতেই হবে না।

পুনরায় মনোরমার শরীর শিহরিয়া উঠিল। মনে করিয়াছিলেন কষ্টে শ্রষ্টে থাকিলে তিনি যে দুটাকা দিতে চাহিয়াছিলেন তাহা দু মাসে পুনরায় বাঁচাইতে পারিবেন। কিন্তু দশ টাকা কোথা হইতে দিবেন। বিশেষ নলিন বাড়ী নাই। তাহার নিকট পত্র লিখিলেও চারি দিবসের মধ্যেও জবাব আসিবে না। কি করেন ? সাত পাঁচ ভাবিয়া স্থির করিলেন এ বিপদ হইতে উদ্ধার হইবার জন্য দশ টাকা খরচ করিলেও নলিন কিছু বলিবে না। বিশেষ নলিন জানিতও না যে কিঞ্চিৎ সঞ্চিত ধন আছে। কিন্তু এ বোয়ের গহনার টাকা। এটাকায় কখনই হাত দিবেন না এই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। কিন্তু কি করেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া কহিলেন “লক্ষ্মণ দশ টাকার কমে হবে না ?”

লক্ষ্মণ। কোন মতেই না।

তখন মনোরমা তথা হইতে উঠিয়া গিয়া কুটীরের অভ্যন্তর হইতে কাঁদিতে কাঁদিতে দশটী টাকা আনিয়া লক্ষ্মণের হাতে দিলেন। লক্ষ্মণ পাষাণ হৃদয় হইয়াও সে দশটী টাকা লইতে পারিল না। টাকাগুলি পুনরায় মনোরমার হস্তে দিয়া কহিল

"আপনার সহিত আমি প্রবঞ্চনার কথা কহিব না, যথার্থ যা ঘটেছে তাই ব'লব, কিন্তু আপনি একথা কারও নিকট প্রকাশ কোর্‌বেন না। আপনাকে সাক্ষ্য মানার প্রধান মূলাধার ভট্টাচার্য্য মহাশয়, আপনি যদি তাঁহাকে রাজি ক'রতে পারেন, তাহলেই আপনি এদায় হতে মুক্ত হতে পারেন। কিন্তু তিনি যে দশ টাকায় শুন্‌বেন তা আমার বোধ হয় না।"

মনোরমা। আমি যদি তাঁর পায়ে ধরি তাতেও কি শুন্‌বেন না?

লক্ষ্মণ। আপনি চেষ্টা কোরে দেখুন।

এই বলিয়া লক্ষ্মণ চলিয়া গেল। তখন মনোরমা মঙ্গলকে কহিলেন "এখন কি করি?" মঙ্গল বলিল "আপনি ডাক্‌লে যে ভটচাজ্জি মহাশয় আপনার বাটীতে আস্‌বেন তা বোধ হয় না, লক্ষ্মণও বোধ হয় আপনার হয়ে দুকথা তাঁকে বোল্‌বে না। আমার বিবেচনায় এই বোধ হয় আপনি সন্ধ্যার পর ভটচাজ্জি মহাশয়ের বাটীতে যান, গিয়ে তাঁর ইস্তিরীকেও দু কথা বলুন, আর তাঁহাকেও দুকথা বলুন। বোধ হয় ভটচাজ্জি মশার ইস্তিরী যদি দুকথা বুঝিয়ে তাঁর সোয়ামিকে বলেন তাহলে আপনার আর কষ্ট পেতে হবে না।"

মনোরমা মঙ্গলের কথা শুনিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। কহিলেন "তুমি যা বলেছ ঠিক। হাজার হোক তোমরা ব্যাটা মানুষ, তোমাদের যে বুদ্ধি আছে আমাদের কি তা আছে।" পরে একটু ভাবিয়া কহিলেন "মঙ্গল, তুমি তো আমার সঙ্গে যাবে? আমি তো আর একলা যেতে পারিনে?"

মঙ্গল। আপনার সঙ্গে যাব এ আর বড় কথা কি? যদি সমুদ্রে ঝাঁপ দিলে আপনার উপকার হয় আমি তাও কোত্তে পারি।

মঙ্গলের কথা শুনিয়া মনোরমা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর দিবা অবসান হইলে নিজের সন্ধ্যাহ্নিক সম্পন্ন করিয়া মনোরমা মঙ্গলের নিকট গেলেন। মঙ্গল কহিল "এত সকালে যাবার দরকার নাই। ভটচাজ্জি মশায় এতক্ষণ রায় মহাশয়দের বাড়ী গিয়েছেন।"

মনোরমা। আমি সেই জন্যেই এত শিগ্‌গির যেতে চাই। তা হলে গিন্নীর সঙ্গে দুকথা কৈতে পারবো।

মঙ্গল অমনি চাদরখানি স্কন্ধে ফেলিল। মনোরমা আগে আগে চলিলেন। মঙ্গল একখানি লাঠি হাতে করিয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিল।

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী পৌঁছিয়া মনোরমা দেখিলেন তাঁহার স্ত্রী একটী বালক ক্রোড়ে লইয়া তাহাকে নিদ্রিত করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন। মনোরমাকে দেখিতে পাইয়া তিনি জিজ্ঞাসিলেন "রাত্রে কি মনে করে মা?"

মনোরমা সমস্ত বৃত্তান্ত তাঁহাকে অবগত করাইলেন, কহিলেন যদি ভট্টাচার্য্য মহাশয় এ বিপদ হইতে তাঁহাকে উদ্ধার না করেন তবে কাহারু করিবার ক্ষমতা নাই। বিশেষ লক্ষ্মণ তাঁহাকে একথা কহিয়াছে, আর লক্ষ্মণ বুদ্ধিমান একথা সকলেই জানে, অতএব সে যাহা বলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গৃহিণী কহিলেন "তা এর জন্য তুমি এত কষ্ট কোরে এলে কেন? একজন লোক পাঠিয়ে দিলেই তো হ'ত।"

মনোরমা কহিলেন, "আমার আর কে আছে যে এখানে আস্‌বে? এক মঙ্গল? সে যা শুনে যায় তা তার মনে থাকে না?"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী মনোরমার কথা শুনিয়া যথার্থই ব্যথিত হইলেন, কহিলেন "ভদ্র লোকের বউ ঝিকে আদালতে নিয়ে সাক্ষী দেওয়ান তো কখন দেখিও নাই, শুনিও নাই, এর পরে যে কি হবে তা বলা যায় না। আজ তোমাকে সাক্ষী মেনেছে, কাল আমাকে মানবে, আর পাঁচ দিন পরে রায় মহাশয়ের পরিবারকে মান্‌বে। এ পথ রায় মহাশয় নিজে দেখাচ্ছেন, একি তাঁর উচিত?" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী জানিতেন না যে ইহার মূলীভূত কর্ত্তা তাঁহারি নিজের স্বামী।

এইরূপ কথায় বার্ত্তায় অনেক রাত কাটিয়া গেল, অবশেষে ভট্টাচার্য্য মহাশয় বাটী প্রত্যাগত হইলেন। অমনি মনোরমা সে কামরা ত্যাগ করিয়া পার্শ্বের কামরায় প্রবেশ করিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় অদ্য সংযম করিয়াছেন, কল্য রায় মহাশয়ের বাটী শিব স্বস্ত্যয়ন করিতে হইবেক। প্রাতে তাঁহার হবিষ্যোপযোগী দ্রব্যাদি রায় মহাশয়ের বাটী হইতে আসিয়াছে। কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে মধ্যাহ্নে দিব্য করিয়া মাছ ভাত আহার করিয়াছেন ও রাত্রেও তাই করিবেন তাহা আর কে জানিবে। অদ্য বাটী আসিয়া একটু বিশ্রাম করিয়া কহিলেন "রাত্রি অধিক হয়েছে আমার ভাত দাও।" ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী এই কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের গা টিপিলেন অর্থাৎ চুপ করিতে বলিলেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ইঙ্গিতের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন না। ভাবিলেন ব্রাহ্মণী তাঁহার সঙ্গে পরিহাস

করিতেছেন, এই ভাবিয়া কহিলেন "আর তোমার গদ্দি কোর্‌তে হবে না, বুড়ো হলে তবু ঠাট টুকু বজায় আছে।" এবার গৃহিণী ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কর্ণে নিজ অধরোষ্ঠ সংলগ্ন করিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কহিলেন ও "ঘরে অপর লোক আছে।" শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় শিহরিয়া উঠিলেন। মনোরমাও অন্ন আনিবার আজ্ঞা শুনিয়া শিহরিয়া উঠিলেন। ভাবিলেন কলিকালে যে দেবতারা নিদ্রিত তাহার কারণই এই। একটু বিলম্বে ভট্টাচার্য্য মহাশয় নিজদোষ ঢাকিবার জন্য একটু উচ্চৈঃস্বরে কহিলেন "বলি ছেলেটাকে চারটি ভাত এনে দেবে না?" ঠিক এই সময় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দাসী ক্ষেমা আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাকে কহিলেন "ও ক্ষেমা ছেলেটার জন্য একখানা যায়গা করে দেনা?" ক্ষেমা ইহার পূর্ব্বের বৃত্তান্ত কিছু জানিত না সুতরাং অমনি গালে হাত দিয়া বড় বড় করিয়া কহিল "ওমা, সে আবার কি? ও যে চার মাস উত্তুরে পাঁচ মাসে পড়ে নি? ও কেমন করে ভাত খাবে? তোমার যায়গা করে দিচ্ছি। এই মাছের ঝোলটুকু হলেই হয়।"

ক্ষেমার কথা শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় যে ফাঁপরে পড়িলেন তাহা বর্ণনাতীত। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের স্ত্রী সমস্ত কথা ঢাকিবার জন্য কহিলেন "শুন্‌তে পাচ্ছি রায়মহাশয়েরা নাকি মনোরমাকে সাক্ষী মেনেছেন? সে মেয়েটা কেঁদে কেঁদে খুন হয়ে এখানে এসেছে, ঐ পাশের ঘরে আছে। বোল্‌ছে তুমি যদি দয়া কর তাহলে তার সাক্ষী দিতে হয় না আর লক্ষ্মণ তাকে এইরূপ বলে দিয়েছে এবং তাহারি কথায় সে এখানে এসেছে।

মনোরমার নাম শুনিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের লজ্জা গিয়া রাগ হইল। ভাবিলেন সে একথা প্রকাশ করিয়া দিলে অবশ্যই সে হিংসার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ কহিতেছে ইহা বলিলেই সকলে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবনা মনোমধ্যে উদিত হওয়ায় তাঁহার লজ্জা গেল। রাগ হইল, তাহার কারণ এই যে লক্ষ্মণ তাঁহাদিগের নিজ ঘরের মন্ত্রণা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক প্রকাশ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ উপস্থিত না থাকায় সে রাগ মনোরমার উপর ব্যয় করিলেন, কহিলেন "ও পাপীয়সীটাকে তুমি স্থান দিয়েছ। অম্‌নি কুচরিত্রা কতকগুলা লোকের দ্বারায় গ্রামটা ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল। ওই আর ওর ভাই এরা দুজনে একত্রে হয়ে লালবিহারী বাবুর কান ভারি করে দিয়ে রায় মহাশয়ের মেয়াদ দেওয়ালে। এমন রায় মহাশয়! যাঁর স্মরণ লয়ে কত চোর ডাকাৎ বাটপাড় রক্ষা পায়, যাঁর প্রতাপে বাঘে ছাগলে এক ঘাটে জল খায়, তাঁকে কিনা একজন সামান্য তাঁতি প্রহার করে? এখনও তিন বৎসর হয় নাই একজন লোক আপন স্ত্রীকে খুন কোরে তাঁহার স্মরণ লওয়ায় সে ফাঁসি থেকে বেঁচে গেল, সেই রায় মহাশয় কিনা একটা তাঁতিকে এক ঘা মেরে জেলে যান। তাঁর কি বুদ্ধি নাই? না অর্থ নাই? সকলি আছে। তিনি মোকর্দ্দমার যোগাড় কোত্তেও ক্রটী করেন নাই। তবে তিনি হারেন সে কেবল ওই কুচরিত্রা স্ত্রীলোক ও ওর ভায়ের জন্য। "ও আমার এখানে এসেছে কেন? যাক সে তাঁতি বাড়ী যাক। ও ভদ্র লোকের বাড়ীতে এলো কেন? আমার দ্বারায় ওর কোন উপকার হবে না।"

ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের কথা শুনিয়া তাঁহার স্ত্রী হতবুদ্ধির ন্যায়

হইলেন। মনোরমা আস্তে আস্তে অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বাহিরে আসিলেন। মঙ্গল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের চাকরের সহিত বহির্বাটীর দরজায় ছিল তাহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাটী ফিরিয়া আসিলেন।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

"বড় বাড়িলে ঝড়ে ভাঙ্গে।"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে নলিনকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া লালবিহারী বাবু দিন কতকের জন্য চিত্তের প্রফুল্লতা লাভ করিয়াছিলেন কিন্তু সে প্রফুল্লতা অধিকদিন থাকে নাই। রাম সিং ফিরিয়া আসায় তাঁহার সে শাকে বালি পড়িয়াছিল। কিন্তু তথাপি তাঁহার চিত্তচাঞ্চল্য তত অধিক হয় নাই। তিনি পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় কাজকর্ম্ম করিতে লাগিলেন; দশটার সময় কাছারী যান এবং সমস্ত দিনের কাজ না শেষ করিয়া বাটী ফিরিয়া আইসেন না। ইহার জন্য কখনও কখন তাঁহাকে কাঁছারি বাতি জ্বালাইয়া কাজ কর্ম্ম করিতে হইত। প্রতিজ্ঞা করিলেন আর কাজ বাকী ফেলিবেন না। এই রূপ কাজ করায় তাঁহার নিজের শরীর হালকা বোধ হইতে লাগিল, আমলাবর্গের অনেক সুবিধা

হইল। পূর্ব্বে তাহারা কাছারি আসিয়া নিষ্কর্ম্মা বসিয়া থাকিত, কোথার কাগজ কোথায় যাইত তাহার ঠিক থাকিত না এবং যখন যেখানির দরকার হইত অত্যন্ত পরিশ্রম স্বীকার করিয়া খুঁজিতে হইত। এক্ষণে আর সে সব গোলের কিছুই রহিল না।

অঙ্গারং শত ধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি। রাম সিং লালবিহারী বাবুর উপর যে প্রভুত্ব পাইয়াছে তাহা সে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। এবং সে কথা বিস্মৃত না হওয়াতে যে সমস্ত ঘটনাবলি ঘটিবার সম্ভাবনা তাহা ঘটিতে লাগিল। রাম সিং বাবুর সহিত বাক্‌সটী লইয়া টেবেলের উপর রাখিয়া নিজে অশ্বথ বৃক্ষের ছায়ায় গিয়া শয়ন করিত এবং অন্যান্য পেয়াদা বা আরদালির সহিত গল্প করিত এবং পান তামাক খাইত। তাহার সঙ্গিদের সহিত সর্ব্বদাই হাসি তামাসা চলিতেছে, কাছারির কোন কাজের জন্য তাহাকে ডাকিলে সে অমনি মুখ ভারি করিয়া আসিত। যদি অল্প সল্প কাজ হয় তবে উঁ আ করিয়া সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গিয়া পুনর্ব্বার অশ্বথ তলায় সভা শোভন করে। যদি এমন কোন কাজ পড়ে যে তাহা সম্পন্ন করিতে অধিক পরিশ্রম প্রয়োজন হয় অথবা কোন দূর স্থানে যাইতে হয়, তবে সে অবিলম্বে বলিয়া ফেলে "দেখুন না বাবু আমি কত দুবলা হয়ে গিয়েছি। হজুর ডেপুটী বাহাদুর নিজেই জানেন আমার কি হাল হয়েছে।" আমলারা ডেপুটী বাহাদুরের দোহাই শুনিলে আর কিছু বলে না। রাম সিং তাঁহার প্রিয় পাত্র, কি জানি তাহার নামে কিছু বলিলে পাছে হাকিম পর্য্যন্ত চটিয়া যান।

রাম সিং এই রূপ চা'ল চলিতে লাগিল। আমলারা সকলে বিরক্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যহই তাহারা গিয়া রসিক বাবুর নিকট নালিস করে, রসিক বাবু হঠাৎ কিছু বলিতে ইচ্ছা করেন নাই। যতই কেহ কিছু না বলে ততই রাম সিংহের বুজরুগী বাড়ে। এক দিবস একটা বড় দরকারি কাজ উপস্থিত, শীঘ্র করিতে হইবেক। কাছারিতে আর কোন চাপরাসী নাই। রসীক বাবু রাম সিংকে ডাকিলেন। রাম সিং আস্তে আস্তে হুঁ হাঁ করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। রসীক বাবু কহিলেন "রাম সিং তুমি শীঘ্র গিয়া এই কখানা চিঠী ডাক ঘরে দিয়ে এস। এ বড় জরুরী চিঠী আজ না গেলেই নয়। যদি আদ ঘণ্টার মধ্যে না ডাক ঘরে পোঁছে দিতে পার তবে ডাক বন্ধ হয়ে যাবে, তা হলে আর আজকার ডাকে যাবে না, আর আজকার ডাকে না গেলে আমাদের সকলেরি জবাবদিহী হতে হবে। যাও শীগ্‌গির যাও।"

রাম সিংহের মাথায় বজ্রাঘাৎ পড়িল। সে কহিল "আপনি তো জানেন আমার তবিয়াত ভাল নয়, আর আমার দে মে তাকৎ নেই। হামসে কিস্তর একাম সফরেগা?"

রসিক বাবু। সে দোসরা দিন হবে। তুমি তাজা আছ, ঠিক ঠাক আছ, কাহিল হও নি, তবে কেন কাজ ক'রতে পার না?

রাম সিং। আমি পারি না বাবু। আপনার এত বাত বলবার দরকার কি?

রসিক বাবু। এত বাত বলবার দরকার এই যে তুমি তো

সরকারি চাকর, সরকার থেকে তলব পাও, তবে সরকারি কাজ ক'রবে না কেন? রসিক বাবু যখন একথা কহিলেন তখন তাঁহার চক্ষু রাগে রক্ত বর্ণ হইয়াছে।

রাম সিং। আমি সরকারি চাকর, আর তুমি কি সরকারি চাকর নও?

এই কথা শুনিয়া রসিক বাবু রাগ করিয়া কহিলেন "কি ব্যাটা যত বড় মুখ তত বড় কথা, হুঁসিয়ার হয়ে কথা ক।"

রাম সিং বাবুর বলে বলিয়ান। সেও কহিল "তোমার যত বড় মুখ তত বড় কথা? তুমি ব্যাটা ফ্যাটা বোলো না।"

রসিক বাবু রাগ না সহ্য করিতে পারিয়া রাম সিংহের গালে এক চপেটাঘাৎ করিলেন। রাম সিং অমনি উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া বাবুর নিকট নালিস করিল। রসিক বাবু অপ-রাপর আমলাদিগের পানে চাহিয়া কহিলেন "আজ তো আমার চাকরি গেল। আমি এক্ষণেই গিয়ে রিজাইন দেব।" অন্যান্য সমস্ত আমলারা কহিল "আমরাও আর থাকবো না।"

লালবিহারী বাবু এজলাস থেকে এ সমস্ত কথাই শুনিতে পাইয়াছেন। যতই শুনিতেছিলেন ততই রাগে তাঁহার শরীর জ্বলিতেছিল। মনে স্থির করিয়াছিলেন ব্যাটাকে উত্তম মধ্যম দিয়া অদ্যই তাঁড়াইয়া দিবেন। আর তিনি ছ টাকার পেয়াদার অধীনে থাকিতে পারেন না। সুতরাং যখন রাম সিং কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া নালিস করিল তখন তাঁহার দুঃখ কি ক্লেশ হওয়া দূরে থাকুক তাঁহার রাগ শত গুণ বৃদ্ধি হইল। তখন তিনি রাম

সিংকে কিছু না বলিয়া রসিক বাবুকে ডাকিলেন। রসিক বাবু রাগে রক্ত বর্ণ আঁখি, গিয়া এজলাসে প্রবেশ করিলেন মনে স্থির করিয়াছেন যদি লালবিহারী বাবু তাঁহাকে কিছু বলেন তবে তাঁহাকে যথোচিৎ শুনাইয়া দিবেন।

রসিক বাবুকে দেখিয়া লালবিহারী বাবু কহিলেন "আপনি এক্ষণেই এই ব্যাটার নামে নালিস করুন। আপনার কোন দোষ নাই। আমি ব্যাটাকে দেখিয়ে দিচ্চি।"

রসিক বাবু অমনি নালিস করিলেন। কাছারির অন্যান্য আমালারা সাক্ষ্য দিল। মোকর্দ্দমা রাম সিংহের বিপক্ষে সাবুদ হইয়া গেল। তখন লালবিহারী বাবু রাম সিংহের দিকে চাহিয়া কহিলেন "তোমার কিছু বলিবার আছে?"

রামসিং। হজুরবন্দা যব আপনার সঙ্গে কল্‌কাতায় তামাসা দেখ্‌তে গিয়াছিল———"

লালবিহারী। ওসব কিছু দরকার নেই। এ উপস্থিত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে তোমার কি ব'লবার আছে?

রামসিং স্বপ্নেও ভাবে নাই যে এরূপ সামান্য বিষয় হইতে এরূপ গুরুতর ব্যাপার ঘটিবে। গোস্তাকি করাই তাহার স্বভাব দাঁড়াইয়া গিয়াছে ও এরূপ গোস্তাকি চিরকালই করিয়া আসিতেছে, চিরকালই বাবু তাহাকে কোন না কোন রূপে মাপ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু অদ্য আর এক ভাব দেখিয়া আর এক রকম কথা শুনিয়া তাহার যেন জ্ঞান চৈতন্য লোপ পাইয়া গেল। সুতরাং যখন লালবিহারী বাবু কহিলেন "ওসব দরকার নেই। এ উপস্থিত মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে কি আছে বল" তখন সে

আর অন্য কথা কহিতে পারিল না। এই মাত্র বলিল "হজুর মালিক, বন্দা হজুরের বিস্তর খিদমত করেছে।"

লালবিহারী বাবু কহিলেন "বস্, বস্। আর দরকার নেই। তোমার ছ মাস কঠিন পরিশ্রমের সহিত মেয়াদ হইল।" এই হুকুম দিয়া কোর্টের হেড কনষ্টেবলের দিকে চাহিয়া কহিলেন "একে এখুনিই জেলে লইয়া যাও।" আজ্ঞা মাত্র হেড কনষ্টেবল তিন চারি জন অন্য কনষ্টেবলের সঙ্গে রামসিংকে জেলে লইয়া গেল।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা এজলাসে।

মনোরমা মনোদুঃখে ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিয়া সে রাত্রি অতিশয় উৎকণ্ঠায় যাপন করিলেন। পরদিবস প্রাতঃকালে মঙ্গলকে দিয়া লক্ষ্মণ গুপ্তকে ডাকাইয়া সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করাইলেন। লক্ষ্মণ শুনিয়া অকপটে দুঃখিত হইল। তাহার চেষ্টা কেবল অর্থ উপার্জ্জন, কেহ কষ্ট পায় এ তার মনোগত অভিপ্রায় নয়। কিন্তু কি করে? তাহার এ বিষয়ে কোন হাত নাই। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল আপনার সাক্ষ্য দিতে যেতেই হবে তার আর সন্দেহই নাই। না গেলে ওয়ারেণ্ট জারি কোরে আপনার যথা সর্ব্বস্ব বেচে নেবে।"

মনোরমা। তবে এখন উপায়? আমি একাকিনী বিধবা। আমি কিরূপে আদালতে যাই?

লক্ষ্মণ কহিল "আপনি একখান পাল্কী কোরে যান, আর আপনার ভাইকে একখানা চিঠী লিখুন, তিনি যেন মোকর্দ্দমার দিনে আদালতে উপস্থিত থাকেত, তা হলে আপনার কোনই কষ্ট হবে না।"

লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া মনোরমার চিত্ত অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ নলিনকে পত্র লিখিলেন। ও নিজে আদালতে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলেন।

নলিন মনোরমার পত্র পাইয়া চিন্তায় অভিভূত হইলেন। ভাবিতে লাগিলেন এ শক্রতা কাহার দ্বারায় সাধিত হইল। কিন্তু ভাবিয়া আর ফল কি? মোকর্দ্দমা তাহার পরদিবস, সুতরাং তাঁহাকে সেই দিবসই যাইতে হইবেক। সন্ধ্যার সময় রেলওয়ে ষ্টেসনে আসিয়া টিকিট লইয়া রেলে চড়িলেন। পরদিবস প্রাতঃ-কালে লালবিহারী বাবুর কার্য্য স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই তিনি লালবিহারী বাবুর বাটীতে গমন করি-লেন।

বিধুমুখী নলিনকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া কহিলেন "তুমি এসময় কেন?"

নলিন কহিল "আমি বড় বিপদে পড়েছি।" এই বলিয়া মনোরমার চিঠীখানি বিধুমুখীর হস্তে দিল। বিধুমুখী চিঠীখানি পড়িয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কহিলেন "কেউ না কেউ শক্রতা কোরে এ কাজ করেছে। তুমি এর আর কিছু জান?"

নলিন কহিল "আর আমি এ বিষয়ের কিছুই জানি না। যে স্থলে সাক্ষ্য মেনেছে তখন সাক্ষ্য অবশ্যই দিতে হবে। কিন্তু তিনি কেমন কোরে আসবেন কোথায় থাকবেন, আর কতক্ষণই বা আদালতে হাজির থাকতে হবে, এ সকল বিষয়ের কিছুই জানতে পারলাম না, আর না জানার দরুণ আমার যার পর নাই চিন্তা হচ্চে।"

বিধুমুখী। থাকবার স্থানের জন্য ভাবনা নেই। আমার এই খানেই নিয়ে আস্‌বে। তোমার দিদির সঙ্গে দেখা কোরবার বড় ইচ্ছা ছিল কিন্তু এ অবস্থায় যে দেখা ক'রতে হবে তা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। যা হউক এর তো আর চারা নেই, তা আর ভেবে কি হবে? আমার দ্বারায় যদি কিছু উপকার হয় তা আমি কর্ত্তে প্রস্তুত আছি।"

নলিন কহিল "আপনি এক উপকার ক'রতে পারেন। যখনি দিদি এসে পৌঁছান তখনি যদি বাবু ঐ মোকর্দ্দমাটা লন তা হলে দিদিকে অনেকক্ষণ আদালতে থাকৃতে হবে না?"

বিধুমুখী। আচ্ছা তা আমি করে দেব, কিন্তু সাক্ষি দেওয়া হ'লে এই খানে নিয়ে আসবে তো?

নলিন। যদি সকালে সকালে সাক্ষ্য দেওয়া হয়ে যায় তবে এখানে না এলেও তো চলতে পারে? অমনি অমনি বাড়ী ফিরে যাওয়া যেতে পারে।

বিধুমুখী হাসিয়া কহিলেন "তবে আমি কোন অনুরোধ করবো না।"

নলিন ভাবিয়া দেখিল বিধুমুখীই তাহাকে মানুষ করিয়াছেন,

তাঁহাদের কৃপায় তাহার পড়া শুনা হইতেছে, বিশেষ ইতিপূর্ব্বে তিনি মনোরমাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন, এই সমস্ত ভাবিয়া কহিল "আচ্ছা সাক্ষ্য দেওয়া হলেই তাঁকে এই খানে আন্‌বো।"

এই কথার পর বিধুমুখী আপনার স্বামীর নিকট গেলেন ও নলিন বহির্ব্বাটীতে চলিয়া আসিল।

রাম সিংহকে জেলে দিয়া লালবিহারী বাবুর সমস্ত চিন্তার কারণ দূরীভূত হইয়াছিল। এক্ষণে বিধুমুখীর নিকট নলিনের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া পুনরায় তাঁহার কিঞ্চিৎ চিত্ত বৈকল্য হইল, ভাবিলেন হে পরমেশ্বর আমার অদৃষ্টে কি আর সুখ নাই? চিরকালই কি আমি মনোকষ্টে কাল যাপন কোর্‌বো?" কিন্তু এবারকার কষ্ট তত অধিক হইবে না। তাহার কারণ নলিন দু তিন দিন বই থাকিবে না, বিশেষ তাহার ভগ্নী আসিতেছে তাহাকে দেখিতে পাইবেন এবং নলিনের দরুণ তাঁহার যে সমস্ত কষ্ট হইয়াছে তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিবেন। অনন্তর বিধুমুখীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিলেন যখনি সে আসিয়া পৌঁছিবে তখনিই তাহার মোকর্দ্দমা লইবেন, আর মোকর্দ্দমার পর বিধুমুখী অনায়াসে তাহাকে নিজ বাটী আনয়ন করিতে পারেন।

বিধুমুখী স্বামীর কথা শুনিয়া প্রফুল্লমনে আসিয়া নলিনকে কহিলেন। নলিন যার পর নাই উপকৃত হইল এবং বিধুমুখীর সম্মুখে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কাছারি চলিয়া গেল।

কাছারির বহুতর লোকের সহিত নলিনের আলাপ ছিল।

যাহার সহিত দেখা হয় সেই জিজ্ঞাসা করে "নলিন এখানে কি মনে করে? এখন তো কলেজ বন্ধ হবার সময় নয়?" নলিন সকলেরই সহিত যথা বিহিত আলাপ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে লালবিহারী বাবু আসিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন। ঠিক এই সময় নলিন দেখিল দূর হইতে একখান পাল্কী আসিতেছে। পাল্কী নিকটে আসিলে নলিন দৌড়িয়া গিয়া দেখিলেন বেহারারা তাঁহাদের গ্রামের। তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা কহিল পাল্কীর অভ্যন্তরে তাঁহারি ভগ্নী মনোরমা। তখনি নলিনের আদেশ মত বেহারারা পাল্কীখানি লইয়া যেখানে লোক জনের ভিড় নাই এমন এক বৃক্ষমূলে রাখিয়া দিল।

এদিকে রায় মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় এবং অন্যান্য সাক্ষীগণ সমভিব্যাহারে আর এক অশ্বত্থ মূলে বসিয়া আছেন। ব্যারিষ্টার গোষ সাহেব নিকটবর্ত্তী ডাক বাংলায় যথাবিহিত বস্ত্র পরিধান করিয়া বসিয়া আছেন, মক্কেলের লোক আসিয়া ডাকিলেই আদালতে উপস্থিত হইবেন।

নলিন পূর্ব্বের বন্দবস্ত অনুসারে লালবিহারী বাবুর আরদালিকে কহিল "একবার ডিপুটী বাবুকে বল আমার ভগ্নী আসিয়াছেন।" আরদালি গিয়া লালবিহারী বাবুর কাণে কাণে গিয়া সমাচার দিল। লালবিহারী বাবু সর্ব্বাগ্রের যে সমস্ত অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম ছিল সে গুলি সমাধা করিয়া মহারাণী বাদী ও নকড়ী প্রতিবাদির মোকর্দ্দমা ডাকিলেন। অমনি একজন লোক গোষ সাহেব ব্যারিষ্টরের নিকট খবর দিল। খবর পাইয়া গোষ সাহেবের গা টা একটু কাঁপিয়া উঠিল। কিন্তু অবিলম্বে কাছারি

আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অনন্তর এক এক করিয়া সাক্ষ্য লওয়া হইতে লাগিল। মোকর্দ্দমার বিষয় সকলেই জানেন সুতরাং সে বিষয় বর্ণনা করিবার প্রয়োজন নাই। একটী কথা মাত্র বলিবার আছে, অর্থাৎ গোষ সাহেব কথা কহিতে গিয়া এত গোলমাল ও অসংলগ্ন বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন যে লালবিহারী বাবু তাঁহাকে বসিতে বলিলেন ও আর একজন উকীলকে মোকর্দ্দমা চালাইতে কহিলেন।

মনোরমার ডাক হইল, তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে গিয়া এজলাসের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। সমস্ত লোক মনোরমার রূপ লাবণ্য দেখিয়া চমৎকৃত হইল। লালবিহারী বাবু মনে মনে করিলেন "Full many a flower is born to blush unseen and waste its sweetness on the desert air."

অতঃপর মনোরমাকে মোকর্দ্দমার কথা জিজ্ঞাসা করায় তিনি কহিলেন তিনি ইহার না কিছু জানেন, না কিছু শুনেছেন। লালবিহারী বাবু স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন শত্রুতা সাধনের জন্যই ইহাকে সাক্ষ্য মানা হইয়াছে। মনোরমা সাক্ষ্য দিয়াই লাল বিহারী বাবুর বাটীতে গেলেন।

লালবিহারী বাবু মোকর্দ্দমা দাএরা সুপর্দ্দ করিলেন।

দ্বিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

মহদাশ্রয়ে।

নলিন ও মনোরমা লালবিহারী বাবুর বাটীতে আসিতেছেন, মনোরমা পাল্কীতে, নলিন পদব্রজে।

মনোরমা কিয়ৎ দূর আসিয়া নলিনকে কহিলেন "যখন বাটীর নিকট যাইব তখন আমাকে বোলো, আমি নেবে হেঁটে যাব।" নলিন কহিল বাড়ীর বাইরে অনেক লোক আছে সেখান থেকে কেমন করে হেঁটে যাবে? মনোরমা কহিলেন "তাতে দোষ কি? তুমি যে বাড়ীতে চাকর ছিলে আমার কি উচিত সে বাড়ীতে পাল্কী করে যাওয়া?"

দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আসিয়া বাটীর নিকট পৌছিলেন। মনোরমা পাল্কী হইতে নামিয়া হাঁটিয়া যাইতে লাগিলেন। নলিন যে ভয় করিতেছিল আসিয়া দেখিল সে ভয়ের কোন কারণ নাই কারণ ভৃত্যবর্গ লালবিহারী বাবু কাছারি গমন করিলেই সকলেই আহার করিয়া শয়ন করিয়াছে। জনপ্রাণী বাহিরে নাই। তখন উভয়েই বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন,

গমন করিয়া দেখিলেন বিধুমুখী ছেলে পিলে গুলিকে শয়ন করাইয়া নিজে শয়ন করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। ইতিপূর্ব্বে মনোরমার জন্য আতপ তণ্ডুল ইত্যাদি বিধবাদিগের আহারোপযোগী দ্রব্যাদির আয়োজন করা হইয়াছে। তাঁহার গৃহের নিকট পদধ্বনি শ্রবণ করিয়া অমনি বাহিরে আসিলেন। নলিনকে তো জানেনি, আর নলিনের সমভিব্যাহারে কে তাহাও অনায়াসে বুঝিতে পারিলেন। অমনি সম্মুখে গিয়া নিজ হস্তে মনোরমার ঘোমটাটী তুলিয়া চমৎকৃত হইলেন। এরূপ সুন্দরী স্ত্রীলোক তিনি কখনই দেখেন নাই। তখন প্রকাশে কহিলেন "আমাকে দেখে লজ্জা কি? আমার সাম্‌নে আর ঘোমটায় দরকার কি?" মনোরমা বিধুমুখীকে প্রণাম করিবার জন্য অঞ্চল গলদেশে দিয়া বসিতেছেন। বিধুমুখী তাঁহার মনের ভাব জানিতে পারিয়া কহিলেন "ছি ও কি আমাকে প্রণাম কেন?" এই বলিয়া তাঁহার হস্তধারণ করিয়া নিজের পর্য্যঙ্কে লইয়া গিয়া তাঁহাকে বসাইলেন। মনোরমা বসিবার সময় পা দুখানি মাটিতে রাখিলেন। বিধুমুখী কহিলেন "ভাল হয়ে বসো দিদি, পা তুলে বসো।"

মনোরমা। আপনার বিছানায় কি আমার পা তুলে বসা উচিত? আমার পা ময়লা।

বিধুমুখী। কেন পাল্কীতে এসো নি?

মনোরমা। পাল্কীতে সমস্ত পথ এসেছি, কেবল বাটীর কাছ থেকে চলে এসেছি।

বিধুমুখী। কেন? আমাদের বাড়ীর ভিতর পর্য্যন্ত তো

পাল্কী আসে? তখন নলিনের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "কেন নলিন তুমি তো তা জান।"

নলিন কহিল "আমি তা ওঁকে বলেছিলাম কিন্তু উনি শুন্‌লেন না। বল্লেন "এ বাড়ীতে আমাদের পাল্কী করে আসা উচিত নয়।"

বিধুমুখী "আ আমার কপাল!" এই বলিয়া একজন দাসীকে পা ধুইবার জল দিতে বলিলেন। মনোরমা কহিলেন "দাসী কেন আন্‌বে? আমিই আনছি। নলিন জল কোথায় বল দেখি।"

বিধুমুখী। ওমা সে আবার কি? এমন সময় দাসী জল আনিল। মনোরমা পদ ধৌত করিলেন।

অতঃপর অনেক বলা কওয়ায় মনোরমা স্নান করিয়া রন্ধনাদি করিলেন এবং নলিনকে আহার করিতে দিয়া নিজেও আহার করিলেন।

আহারান্তে মনোরমা বিধুমুখীকে কহিলেন "এক মহা বিপদ হতে উদ্ধার হয়ে গেলাম। আমার যে কি ভয় হয়েছিল তা ব'লতে পারি না। পরমেশ্বরের ইচ্ছায় আর আপনাদের আশীর্ব্বাদে এখন আমি পরিত্রাণ পেলাম। এখন আমার ইচ্ছে কচ্ছে এই বেলাই বাড়ী যাই। এখনও যে বেলা আছে অনায়াসে সন্ধ্যার আগেই পৌছিতে পারবো।"

বিধুমুখী। তোমার পক্ষে দুর্ভাগ্য বটে কিন্তু আমার সৌভাগ্যক্রমে যদি তোমার দেখা পেলাম তবে দুট দিন এখানে থেকে যাও। খাওয়া দাওয়ার কথা বলছি না। সে পক্ষে সেখানেও যেমন, এখানেও তেমনি।

মনোরমা। খাওয়াই কি দিদি বড় হ'লো। তোমরা আমাদের যে উপকার করেছ তাতে দু এক দিন কেন, আমরা জন্মাবধি খেয়ে পরে যেতে পারবো। এখন আশীর্ব্বাদ কর আমি নলিনের বিবাহটী দিয়ে যেতে পারি, তাহলেই আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়। তোমরা যে চারটী করে টাকা দিতে তারই কিছু কিছু বাঁচিয়ে রেখেছি আর নলিন একটু চাকরি বাকরি কর্ত্তে শিখলে অনায়াসে বিয়ে দিতে পারবো, বিশেষ আমরা কুলীন, আমাদের অধিক টাকা লাগ্‌বে না।”

বিধুমুখী। তুমি তো বড় লক্ষী! এই চারটী টাকা থেকে আবার বাঁচাতে পেরেছ?

মনোরমা। না বাঁচালে কি করি দিদি? সংসারে নানান আপদ বিপদ আছে। যদি হাতে কিছু না থাকে তবে কার কাছে চাইতে যাব? আর আমি চাইলে কেই বা দেবে? এই যে সাক্ষী দিতে আস্‌তে হলো এতেই চার পাঁচ টাকা পাল্কী ভাড়া লেগে গেল।

এইরূপ কথাবার্ত্তায় সমস্ত দিন প্রায় কাটিয়া গেল। লালবিহারী বাবু কাছারি বন্ধ করিয়া নিজ গৃহে যাইতেছেন, কিন্তু কথাবার্ত্তায় নিমগ্ন থাকায় প্রায় সন্ধ্যা হবো হবো হইয়াছে তাহা বিধুমুখীও টের পান নাই, মনোরমাও টের পায় নাই। লালবিহারী বাবুর পদধ্বনিও তাঁহাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল না। লালবিহারী বাবু সিঁড়িতে এত দূর উঠিয়াছেন যে তথা হইতে তিনি অদৃশ্য থাকিয়া মনোরমা ও বিধুমুখী উভয়কেই দেখিতে পান। সুতরাং আর অধিক না উঠিয়া তিনি তথা

হইতে সতৃষ্ণ নয়নে মনোরমাকে দেখিতে লাগিলেন। কাছারিতে মুহূর্ত্ত মাত্র মনোরমার মুখ দেখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, আর তখনকার মুখ লজ্জা ও ভয় প্রযুক্ত স্বাভাবিক ছিল না। এক্ষণে মনোরমার স্বাভাবিক মুখ দেখিয়া তাঁহার মন মোহিত হইল। পূর্ব্বে প্রতিহিংসা সাধনের জন্য যাহা মনে করিয়াছিলেন, এক্ষণে সে ভাব ঘুচিয়া গিয়া আর এক ভাব হইল ভাল বাসার ভাব—কিন্তু ফল উভয়েরি এক।

এইরূপ ক্ষণকাল মনোরমাকে দেখিয়া লালবিহারী বাবু পূর্ব্ববৎ পদধ্বনি করতঃ উঠিতে আরম্ভ করিলেন। উপর্য্যুপরি তিন দিবস মনোরমাকে দেখিলেও লালবিহারী বাবুর নয়ন মন পরিতৃপ্ত হইত না কিন্তু পাছে কেহ দেখিয়া ফেলে এই ভয়ে মিনিট কয়েকের পরেই পদধ্বনি করিয়া উঠিতে লাগিলেন। তাঁহার পদধ্বনি শুনিয়াই বিধুমুখী মনোরমাকে অপর এক কুটুরীতে যাইতে বলিয়া নিজে আপনার গৃহেতে চলিয়া গেলেন।

বিধুমুখী লালবিহারী বাবুকে দেখিবামাত্র কহিলেন "আমার মানটা যে বজায় রেখেছ, এতে আমি বড় খুসি হয়েছি।"

"সে কেমন? কি মান বজায় রাখ্‌লাম?" লালবিহারী বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিধুমুখী। বজায় রাখ্‌লে না? এই মনোরমার সাক্ষীটা আগে নিলে।

লালবিহারী বাবু জিজ্ঞাসিলেন "মনোরমা কি আমাদের বাটীতে এসেছে?" তিনি যেন তার কিছুই জানেন না।

বিধুমুখী। তাকি তুমি জান না? কেন সকাল ই

তো তোমাকে ব'লেছিলাম তাকে নিয়ে আস্‌বো? যদি তুমি তাকে দেখতে পেতে?

লালবিহারী। কেন বল দেখি?

বিধুমুখী। বোধ হয় এমন রূপ আমি কখনও দেখি নাই। তোমরা যা দুদিন দেখে ঠিক কর্‌তে না পার আমরা স্ত্রীলোকেরা তা দু মিনিটে ঠিক করতে পারি। মনোরমার নাক, কাণ, চোক, ভুরু, ঠোঁট, সবগুলিই ভাল, আর সবগুলিই যেখানে যেমন হওয়া উচিত। কারু হয় তো চোক ভাল, আর আর সব খারাপ, কারু হয় তো নাকটী ভাল আর সব মন্দ। কিন্তু মনোরমার সকল গুলিই, হাত পা আঙ্গুল নখ গুলি পর্য্যন্তই ভাল, কোনটীরি নিন্দা কর্‌বার যো নাই। আর মাথার চুলগুলি যেন কালী ঠাকুরের চুলের মতন।

বিধুমুখীর নিকট মনোরমার এরূপ বর্ণনা শুনিয়া তাঁহার ভোগ লিপ্সা দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। প্রকাশে কিছু না বলিয়া বস্ত্রাদি ত্যাগ করিলেন ও কিঞ্চিৎ জলযোগ করিয়া বাহির বাটী গিয়া বসিলেন।

গগন পান তামাক দিল। লালবিহারী বাবু ভাবিলেন কিরূপে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিবেন। বিস্তর দেখেছেন, বিস্তর কৃতকার্য্যও হয়েছেন, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থা আর সে সব অবস্থার অনেক তফাৎ। দেশ কাল পাত্র এ তিনেতেই প্রভেদ! কিন্তু চেষ্টার অসাধ্য কাজ নাই। The word "impossible" is found in the dictionary of fools only. অতএব মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন, এই তার প্রতিজ্ঞা হইল। কিন্তু কি উপায়ে এ

মন্ত্রে সিদ্ধ হইবেন। সাত পাঁচ ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া সুন্দরের পথ অবলম্বন করিলেন। সুন্দর বিদ্যালাভের জন্য মহাবিদ্যা আরাধনা করিয়াছিলেন। লালবিহারী বাবুও নিজের মহাবিদ্যার স্মরণ করিলেন। প্রকাশে গগনকে ডাকিয়া বোতল, গেলাস ও জলের সোরাই আনিতে কহিলেন। এইরূপ "মনোমত গগন যোগালে উপহার" লালবিহারী বাবু পূজায় বসিলেন। ক্ষণকাল পরেই তাঁহার চিত্ত প্রফুল্ল হইল। উপায় উদ্ভাবন হইয়াছে।

নিয়মিত সময়ে লালবিহারী বাবু আহারাদি করিয়া শয়ন করিলেন। পরদিবস প্রাতে মনোরমা বিধুমুখীকে কহিলেন "আমি আর থাকৃতে পারি না, আজ আমাকে বিদায় করে দিতে হবে। নলিনও আর থাকৃতে পারে না, তার পড়া কামাই হচ্চে।" বিধুমুখী এই কথা ডেপুটী বাবুকে গিয়া কহিলেন। ডেপুটী কহিলেন "এত ব্যস্ত কেন? এসেছেন আর দু এক দিন থাকুন না। যদি কোন বিষয়ে কষ্ট হয়ে থাকে আমাকে বলা মাত্র সাপেক্ষ, যাহাতে ওর সুবিধা হয় তাই করে দেব।" বিধুমুখীরও মনোগত ভাব এইরূপ সুতরাং স্বামীর বাক্যে পোষকতা পাইয়া লালবিহারী বাবু যাহা যাহা বলিয়াছিলেন মনোরমাকে সেই সেই কথা গুলি বলিলেন। মনোরমা কহিলেন "সে আবার কি? আমার এখানে কি কষ্ট? এখানে যেমন সুখে আছি এমন সুখ এজন্মেও আমার হয় নাই। পরমেশ্বর করুন আমি এ কদিন যে কষ্টে আছি এই কষ্টে যেন জগৎসুদ্ধ লোক থাকে। দিদি, এই জন্যই নলিন তোমাদের কথা ছাড়া আর কারু কথা

কয় না, তোমাদের কথা কয়ে ওর তৃপ্তি হয় না। ওযে এমন মহৎ আশ্রয়ে পড়বে তা আমি স্বপ্নেও টের পাইনি। এসব অদৃষ্টের ফল সেও যেখানে এসে আশ্রয় নিয়ে মানুষ হলো, আমিও সেইখানে এসে এ শঙ্কট থেকে মুক্ত হলাম। আমার এখানে কোন কষ্ট নেই, কোন অভাব নেই, তবে বাড়ী যেতে চাই, আমার যে গোটাকতক শাক বেগুণ আছে সে গুল জল না পেয়ে মরে যাবে; আর লোকেই বা কি বল্‌বে?"

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

অনুরাগের নূতন চিহ্ন।

বিধুমুখী যখন তাঁহার স্বামীর আদেশক্রমে মনোরমাকে আর দু এক দিবস থাকিতে কহিলেন তখন মনোরমা কহিলেন তাঁহার থাকিতে কোন আপত্তি নাই কিন্তু নলিনের থাকিবার যো নাই, আর নলিন না থাকিলে তাঁহাকে কে বাটীতে রাখিয়া আসিবে? বিধুমুখী কহিলেন "গগন তো তোমাদের বাড়ী চেনে? নলিন চলে গেলে গগন তোমাকে রেখে আসবে।"

লোকে পরের বাটীতে আপনার ইচ্ছামত যাইতে পারে, ও যাইয়া থাকে কিন্তু পরের বাটী হইতে ফিরিয়া আসিতে হইলে সেই বাটীর লোকের বিনা অনুমতিতে আসা যায় না। মনোরমা একটীর পর আর একটী আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন

কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। অতঃপর অত্যন্ত অসম্মতিক্রমে তাঁহাকে থাকিতে হইল। নলিনের কোন মতে থাকিবার যো নাই, সুতরাং তিনি সেই দিবসেই চলিয়া গেলেন। যাইবার সময় মনোরমাকে কহিয়া গেলেন "দিদি তুমি এক দিবস থাকৃতে স্বীকার কোরে ভালই করেছ। দেখ বাবুরা আমাকে কত আদর করেন, আমার লেখা পড়ার খরচ দেন; এরূপ অবস্থায় তুমি তাঁহাদের বারম্বার অনুরোধ ফেলে গেলে ভাল হ'ত না। বিশেষ এ বাড়ী আমাদের নিজের বাড়ী মনে ক'রলেই হয়। আমাকে বাবু ও বাবুর স্ত্রী এত আদর করেন বোধ হয় উঁহাদের আপনার সন্তান হলেও তার অধিক কোরতেন না। কিন্তু অধিক দেরি কোরো না। যত শীঘ্র পার বাটী যেও।"

নলিন সরলান্তঃকরণে এই কথা গুলি কহিল, কিন্তু ইহাতে যে বিষময় ফল ফলিল তাহা পাঠকবর্গ ক্রমে জানিতে পারিবেন।

রোগী যত নিদ্রালাভের জন্য শয্যায় এ পিট ও পিট করে ততই তাহার নিদ্রার ব্যাঘাৎ হয়। সেইরূপ লালবিহারী বাবু এ কএক দিবস যতই মনোরমার মূর্ত্তী হৃদয় হইতে দূরীকৃত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন ততই সেই লাবণ্যময় মূর্ত্তী তাঁহার চিত্তে বদ্ধমূল হইতে লাগিল। ক্ষুদ্র বৃক্ষ অনায়াসেই উৎপাটন করা যাইতে পারে, কিন্তু সেই বৃক্ষ বড় হইলে ও তাহার মূলশ্রেণী চতুর্দিগে বিস্তৃত হইলে তাহাকে উৎপাটন করা কঠিন হয়। লালবিহারী বাবু মনে করিলে মনোরমাকে মোকর্দ্দমার দিবসই পাঠাইয়া দিলে অনায়াসেই পারিতেন, কিন্তু তাহা না করিয়া মনোরমাকে নিজ বাটী রাখিয়া দিলেন। ইহার ফল এই হইল

যে প্রত্যহ মনোরমার বিরহ তাঁহার পক্ষে কষ্টকর হইতে লাগিল। প্রথমতঃ তাঁহার পরামর্শে বিধুমুখী তাহাকে এক দিবস থাকিতে বলেন। মনোরমার নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেদিবস থাকিতে হইল, বিশেষ নলিন বলিয়া গিয়াছিল দু এক দিবস থাকিলে ক্ষতি নাই। ডেপুটী বাবুর বাটী নিজ বাটী স্বরূপ। এক দিবস গেল ; বিধুমুখী—গলায় কাপড় দিয়া দ্বিতীয় দিবসও রাখিলেন। তৃতীয় দিবস বহুতর চেষ্টা করিয়াও পাল্কী পাওয়া গেল না। এই রূপ ক্রমে মনোরমাকে ডেপুটী বাবুর গৃহে সাত আট দিবস থাকিতে হইল। বিধুমুখী গলায় কাপড় দিয়া, দিব্য দিয়া পায়ে পড়িয়া তাঁহাকে রাখেন। মনোরমাও থাকেন। কারণ না থাকিলে যদি নলিনের কোন অপকার হয়, বিশেষ নলিন বলিয়া গিয়াছে "এ নিজ বাটী, এখানে থাকিলে কোন ক্ষতি নাই।" মনোরমা নলিন অপেক্ষা বড় কিন্তু নলিন ব্যাটাছেলে সুতরাং সে অধিক বোঝে এই মনোরমার মনে ধারণা। লাল-বিহারী বাবু এ পায়ে ধরা গলবস্ত্রের কথা কিছুই জানেন না। বিধুমুখীকে প্রত্যহ জিজ্ঞাসা করেন "মনোরমা কি আজ যাবে ?", বিধুমুখী বলেন "না, আজ থাকবে, কাল যাবে।" কিন্তু কি কষ্টে যে এক এক দিবস তাঁহাকে রাখিতে হয় তাহা বিধুমুখী লালবিহারী বাবুকে বলেন না।

এদিকে লালবিহারী বাবুর যত্ন যাহাতে মনোরমা থাকেন। অপরদিকে বিধুমুখীরও সেই যত্ন। লালবিহারী বাবুর যত্নের কারণ পাঠক জানিতে পারিয়াছেন, বিধুমুখীর যত্নের কারণ এই যে যদবধি আমলাগণের স্ত্রীলোক পরম্পরা আসিয়াছিল

তদবধি লালবিহারী বাবু আর কাহাকে নিমন্ত্রণ করা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং বিধুমুখী আর অপর স্ত্রীলোক দেখিতে পান না। তিনি একরূপ কারাবদ্ধ বিহঙ্গমের ন্যায় আছেন। আপাতত মনোরমাকে বাটী রাখিতে তাঁহার অনিচ্ছা দূরে যাউক, তাঁহারি ব্যগ্রতাই অধিক। বিধুমুখী ইহাতে বড় সন্তুষ্ট, বিশেষ বিধুমুখী মনোরমাকে অকৃত্রিম স্নেহ করিতেন। সুতরাং দিব্য দিয়া, গলায় বস্ত্র দিয়া মনোরমাকে রাখেন। গলায় কাপড় দেওয়া বিধুমুখীর "ব্রহ্ম অস্ত্র"। মনোরমা দরিদ্র, তাহার ভ্রাতা বিধুমুখীর দাস, এখনও তাঁহার কৃপায় তাহার পড়া শুনা ও উদরপূর্ণ হইতেছে। সুতরাং বিধুমুখী গলায় বস্ত্র দিলে তাঁহার আর কোন কথাই থাকে না তাঁহাকে থাকিতেই হয়।

লালবিহারী বাবু গলবস্ত্রাদির কথা কিছুই জানেন না। ভাবিলেন প্রথম প্রথম যাইতে বড় ব্যগ্র ছিল, এখন যায় না কেন? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে তাঁহার চেহারা বড় সুন্দর ছিল। এজন্য ভাবিলেন মনোরমা তাঁহার সৌন্দর্য্য ফাঁদে পতিত হইয়াছে। তাহা না হইলে কেন আর যাইবার কথা কয় না। এইরূপ সংস্কার আর দু তিন দিবসের মধ্যে তাহার মনে বদ্ধমূল হইল। এক দিবস বিধুমুখী সন্তানাদিকে নিদ্রিত করিবার জন্য আপনার গৃহে তাহাদিগকে লইয়া শয়ন করিয়া আছেন এবং উপকথা কহিতেছেন। বালক বালিকারা নিদ্রিত হইল ও সেই সঙ্গে সঙ্গেই নিজেই নিদ্রিত হইলেন। অধিক রাত্রি হইল কিন্তু আহারের ডাক হয় না, ইহার কারণ কি জানিবার জন্য লালবিহারী বাবু নিজের গৃহে গমন করিলেন; দেখিলেন

সকলেই সুষুপ্ত। দেখিয়া তাঁহার আর অধরে হাসি ধরে না। মনে করিলেন এই রবেই "ভেকে ভুলাইয়া ভৃঙ্গ পদ্ম মধু খাইবে।" তিনি চেষ্টা করিলেই যে কৃতকার্য্য হইবেন তাহার আর সন্দেহ রহিল না। অতঃপর তিনি নিঃশব্দে নিম্নতলে আসিতেছেন, পাছে পদধ্বনিতে বিধুমুখী জাগিয়া উঠেন। মনোরমাও সেই সময়ে রন্ধনগৃহ হইতে উপরে যাইতেছেন। লালবিহারী বাবুর পদধ্বনি শুনিতে পান নাই। হঠাৎ মনোরমা যে প্রদীপ হস্তে করিয়া আসিতেছিলেন তাহার আলোকে একজন পুরুষ মানুষের আকার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল। তখন জানিতে পারেন নাই যে লালবিহারী বাবু বহিঃর্বাটী হইতে অন্তঃপুরে আসিয়াছিলেন। সুতরাং চোর মনে করিয়া মনোরমা শিহরিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলেন। তখন লালবিহারী বাবু কহিলেন "আমি, আমাকে দেখে চীৎকার ক'রবার দরকার নাই। বাটীর সকলেই ঘুমিয়েছে, এই বলিয়া মনোরমার হস্ত ধারণ করিলেন। সর্প যেরূপ দংশন করিয়া লেজদ্বারা দংশিত ব্যক্তির হস্ত পদাদি জড়াইয়া ধরে মনোরমারও লালবিহারী তাঁহার হস্ত ধারায় সেইরূপ বোধ হইল। তিনি চীৎকারের উপর চীৎকার করিতে লাগিলেন। বিধুমুখীর নিদ্রা ভঙ্গ হইল। তিনি "কি হয়েছে, কি হয়েছে" বলিয়া একটী আলো লইয়া সিঁড়িতে আইলেন। মনোরমা অজ্ঞান হইয়া পড়িয়াছেন দেখিয়া নিজ স্বামীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হয়েছে?"

লালবিহারী বাবু কহিলেন "আমি আর কিছুই জানিনা। অনেক রাত্রি হয়েছে, অথচ রন্ধনাদি হয় নাই এই জন্য আমি

তোমার নিকট গিয়েছিলাম, দেখলাম তুমি নিদ্রা যাচ্চ। আমি তোমার পাশে শয়ন করে ছিলাম। পরে এই শব্দ শুনে, তোমাকে জাগাবার অবকাশ না পেয়ে দৌড়ে এসেছি। তুমি এসেছ ভাল হয়েছে, একটু জল এনে মুখে দাও।”

বিধুমুখী দাসীকে জল আনিতে বলিলেন এবং নিজ স্বামীকে কহিলেন “তুমি ঘরে যাও, ছেলে পিলে দেখ গিয়ে, আমি মনোরমাকে নিয়ে যাচ্ছি।” লালবিহারী কম্পিত কলেবরে গৃহে গমন করিলেন। ভাবিতে লাগিলেন যদি মনোরমা সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে তাহা হইলে তাঁহার গলায় ছুরি ভিন্ন আর কোন উপায় নাই।

মুখে জল দিতে দিতে মনোরমা চৈতন্য লাভ করিলেন। তখন বিধুমুখী সমস্ত বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। পাছে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে বিবাদ বিষম্বাদ হয় এজন্য মনোরমা আর কিছু না বলিয়া এইমাত্র কহিলেন, তিনি উপরে যাইতে ছিলেন প্রদীপের ছায়ায় বোধ হইল যেন একজন পুরুষ মানুষ নামিতেছে, এবং যেন হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে ধরিবার উপক্রম করিতেছে। তাহাতেই তিনি চীৎকার করিয়া বেহুঁস হইয়াছিলেন। বিধুমুখী তাঁহাকে অনেক সান্ত্বনা করিয়া তাঁহার নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং অনেক কষ্টে তাঁহাকে নিদ্রিত করিয়া, স্বামীর আহারাদি দিয়া নিজে শয়ন করিলেন।

লালবিহারী বাবুর অন্তঃকরণ ধক্ ধক্ করিতেছে। মনোরমা না জানি কি বলিয়াছে। আহারের দ্রব্য পড়িয়া রহিল। একটু দুদ খাইয়া শয়ন করিলেন। অনেকক্ষণ পরে বিধুমুখী গৃহে

আসিলেন। জিজ্ঞাসিলেন "কি হয়েছিল?" বিধুমুখী কহিলেন "আর কিছু নয়, একটা মিড় মিড়ে প্রদীপ আনতেছিল। তাইতে তার বোধ হ'ল যেন একটা চোর নামছে। অমন কখনও কখনও সকলেরি হয়ে থাকে।"

লালবিহারী বাবু স্বগত ও প্রকাশিত কহিলেন "বাঁচলাম।"

লালবিহারী বাবু ভাবিলেন মনোরমা যে তাঁহার নাম প্রকাশ করে নাই এ তাঁহার উপর অনুরাগের আর একটী নূতন চিহ্ন। কিজন্য যে মনোরমা তাঁহার নাম প্রকাশ করেন নাই এ তাঁহার চিত্তে উদয় হইল না। তিনি ভাবিলেন দেশ কাল প্রতিকুল বলিয়াই মনোরমা এরূপ করিয়াছেন।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নকড়ীর মোকর্দ্দমার শেষ।

নকড়ীর মোকর্দ্দমা যথা সময়ে জজ সাহেবের আদালতে পেশ হইল। সাক্ষী সাবুদ লইয়া জজ সাহেব অনেক চিন্তার পর নকড়ীর প্রাণ দণ্ডের আদেশ দিলেন। গবর্ণমেণ্ট প্লিডারের (অর্থাৎ উকীল সরকারের) আহ্লাদের হাসি আর অধরে ধরে না। নকড়ীর উকীল স্বজনীকান্ত বাবু যে যে তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি নিজের বক্তৃতা দ্বারা খণ্ড বিখণ্ড করিয়া দিয়াছেন। উভয়ে এজলাস হইতে বাহিরে আসিয়া উকিল সরকার হাস্যমুখে স্বজনী বাবুকে শ্লেষ করিয়া কহিলেন "কেমন ভায়া নকড়ীকে রক্ষা কর'তে পারলে?" স্বজনী বাবু

কহিলেন "আমার সাধ্যমত ত্রুটী করিনাই তবে ও বেচারার অদৃষ্ট মন্দ, আমার হাত কি?" প্রকৃত কথা এই স্বজনীকান্ত বাবু ও উকীল সরকার মহাশয় উভয়েই জানিতে পারিয়াছিলেন যে নকড়ী নির্দ্দোষী। এই কথা জানিতে পারিয়া দুজনে দু রকম কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিলেন। স্বজনী বাবু নকড়ীর মোকর্দ্দমা বিনা টাকায় গ্রহণ করিলেন ও তাহার দুঃখে এত কান্না কাঁদিলেন যে মঙ্গল দেখিয়া অবাক হইল কারণ নকড়ীর মাতাও তত কাঁদে নাই। অপরন্তু জিজ্ঞাসা করিলেন "এ সহর জায়গা এখানে থাকতে অনেক ব্যয়, তোমাদের হাতে খরচ পত্র আছে তো?"

মঙ্গল অমনি কাতর স্বরে কহিল "মহাশয় সে দুঃখরে কথা আর কি বোল্‌বো? আমরা এক সন্ধ্যা ভিন্ন দু সন্ধ্যা খেতে পাই না।" এই কথা শুনিয়া স্বজনীকান্ত বাবুর অশ্রুবারি দ্বিগুণ বেগে বহিতে লাগিল। অবিলম্বে তাঁহার মোহরের জজ্ঞেশ্বরকে ডাকিয়া কহিলেন "জজ্ঞেশ্বর, মঙ্গলকে দশটী টাকা ধার দেও।" মঙ্গল টাকা গুলি কাপড়ে বান্ধিয়া অত্যন্ত ম্লানমুখে গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেল। বাড়ীর বাহিরে গিয়াই হাসিতে লাগিল। উকীল সরকার মহাশয় নকড়ীর নিকট লোকদ্বারা জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন নকড়ী তাঁহাকে কত দিতে পারে। রায় মহাশয় যত দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন যদি নকড়ী তাহার অধিক দিতে পারে তবে তাহার কোন ভয় নাই, না পারিলে যে তাহার অদৃষ্টে কি হইবে তাহা তিনি বলিতে পারেন না। নকড়ী কাহাকে কিছু দিবে না এই তার প্রতিজ্ঞা; সুতরাং উকীল সরকারকেও কিছু দিতে স্বীকৃত

হইল না। নকড়ীর মাতা বারম্বার কহিল "বাবা যথা সর্ব্বস্ব বিক্রী করেও যাতে উকীল সরকার খুসী হন, তা কর।" নকড়ী কোনমতে শুনিল না, কহিল" "মরণ কাহারো দুবার হয় না কিন্তু একবার হবেই হবে। তফাৎ এই যে দুদিন আগে কি দুদিন পরে। তবে কেন আমি আমার মাতাকে ও ইস্তিরিকে ভিখারিণী কোরে যথা সর্ব্বস্ব উকীল সরকারকে দিয়ে যাব ?"

উকীল সরকার মহাশয়ের লোক গিয়া যখন তাঁহাকে এই সম্বাদ দিল তখন তিনি রায়মহাশয়ের মোক্তারের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, কিন্তু তখনও তাহাকে কোন স্পষ্ট জবাব দেন নাই। উকীল সরকার মহাশয়ের লোক তাঁহাকে জানাস্তিকে ডাকিয়া লইয়া গিয়া নকড়ীর সহিত যে যে কথা হইয়াছিল তাহা কহিল। উকীলসরকার শুনিয়া কহিলেন "চুপ কর। একথা ও মোক্তার ব্যাটা (অর্থাৎ রায়মহাশয়ের মোক্তার) টের পেলে কিছুই দেবে না।" অতঃপর উকীল সরকার রায় মহাশয়ের মোক্তারকে ডাকিলেন। তিনজন একত্র হইয়া পরামর্শ চলিতে লাগিল। উকীলসরকার কহিলেন "নকড়ী পাঁচ শত টাকা দিতে চাচ্চে, আপনারা যদি ওর ডবল না দেন তবে আমাদ্বারা কোন সাহায্য হবে না।" মোক্তার অনেক চেষ্টা করিয়া অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া সাত শত টাকার বন্দবস্ত ঠিক করিলেন।

আদালতে দুজন জল্লাদ থাকে, একজন উকীল সরকার আর একজন যে ফাঁসি দেয়। পূজার সময় পুরোহিত মন্ত্র পড়িয়া

খড়্গাখানি পাঁটার স্কন্ধে ছোঁয়াইয়া দেন, কর্ম্মকার তাহাকে কাটে, শ্রাদ্ধের সময় পুরোহিত হলুদ দিয়া গাভিবৎসের পার্শ্বে দাগ দিয়া দেন, গোয়ালা তপ্ত লৌহের দ্বারায় সে দাগ পাকা করিয়া দেয় বিবেচনা করিয়া দেখিলে উভয়েরি কার্য্য সমান। অদ্য উকীল সরকার সাত শত টাকা দক্ষিণা পাইয়া নকড়ীর স্কন্ধে খাঁড়া খানি ছোঁয়াইয়া দিলেন।

নকড়ীর মাতা জজ সাহেবের রায় শুনিবামাত্র "ওরে আমার নকড়ীরে" বলিয়া চীৎকার করিয়া জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়িয়া গেল। লোকে মাথায় জলদিয়া, বাতাস করিয়া নকড়ীর মাতার চৈতন্য সম্পাদন করিল। চেতন পাইয়া নকড়ীর মাতা কাঁদিতে লাগিল "ও বাবা নকড়ী, তুমি তো কখন কারু মন্দ করনি, কখনও কারুরে গাল দেওনি, কখন কারুকে রূষ্ট কথাটা কওনি, তবে তোমার অদৃষ্টে এমন হলো কেন? মাথার উপর ঈশ্বর আছেন তিনি জানেন, তোমার কল্যাণের জন্যে আমি কারুকে উঁচু কথটী কইনি, ব্রাহ্মণ দেখলে তখনি প্রণাম করেছি উচু গাছ দেখলে তখনি নমস্কার করেছি মাটীর ঢিবি দেখলে তখনি মনে মনে বলেছি তুমি যে দেবতা হও আমার নকড়ীকে বাঁচিয়ে রেখ। তোমার অদেষ্টে এমন হবে এ আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। ও জজ সাহেব তুমি আমাকে ফাঁসি দাও আমার নকড়ীকে রেহাই দেও।" ফলতঃ নকড়ীর মাতা যেরূপ আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল তাহা শুনিয়া জজ সাহেব আর সে দিবস কাছারি থাকিতে পারিলেন না। চাপরাসিরা নকড়ীর মাতাকে থামাইবার জন্য "চুপ, চুপ" ইত্যাদি রুষ্ট কথা কহিতে লাগিল। জজ সাহেব শুনিয়া তাহাদিগকে

তিরস্কার করিয়া, রুমাল দ্বারায় আপনার চক্ষু মুছিতে মুছিতে এজলাস হইতে নামিয়া বাটী চলিয়া গেলেন।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

বিদায়।

মনোরমা তাঁহার জ্ঞানশূন্য হইবার যে কারণ বিধুমুখীর নিকট বলিয়াছিলেন তাহার লালবিহারী বাবু শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন। তাহার প্রথম কারণ এই যে তিনি বিধুমুখীর তিরস্কার হইতে অব্যাহতি পাইলেন। দ্বিতীয় কারণ এই যে ভাবিলেন মনোরমা প্রকৃত কথা ব্যক্ত না করিয়া তাহার প্রতি অনুরাগের লক্ষণ প্রকাশ করিয়াছে। মনোরমা পরদিবস প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করিয়া বিধুমুখীকে কহিলেন আর তিনি তথায় থাকিবেন না। তাঁহার এত ভয় হইয়াছে যে তাঁহার একাকী এক কুটুরিতে থাকিতে সাহস হয় না।

লোকের মুখ দেখিলে ও কথা শুনিলে টের পাওয়া যায় যে সে কথা একাগ্রচিত্তে বলিতেছে কি না। বিধুমুখী জানিতে পারিলেন মনোরমা বাটী যাইবার কথা একাগ্রচিত্তে বলিতেছেন কিন্তু তথাপি আর কএক দিবস থাকিতে অনুরোধ করিলেন। মনোরমা কোনমতে শুনিলেন না। বস্তুত মনোরমা যেরূপ সুচরিত্র, সুবোধ ও স্নেহময়ী বিধুমুখীও তেমনি। উভয়েরি উপর পরস্পরের ভগ্নীভাব হইয়াছিল। কেহই কাহাকে ছাড়িতে

চান না। কিন্তু রাত্রে যে ঘটনা হইয়াছে তাহাতে আর মনোরমা সে বাটীতে থাকিতে পারেন না। বিধুমুখী তাহা জানিতে পারেন নাই; পারিলে বোধ হয় আর তথায় থাকিতে অনুরোধ করিতেন না। মনোরমার একাগ্রচিত্ততা দেখিয়া তিনি ডেপুটী বাবুকে অন্তঃপুরে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডেপুটী বাবু আসিলে কহিলেন "মনোরমা নিতান্ত বাড়ী যাবার জন্যে ব্যগ্র হয়েছে। আর হতেও পারে, এত দিন বাড়ীছেড়ে আছে, বিশেষ ওর বাড়ীতে আর কেউই নাই। আজ মনোরমাকে পাঠিয়ে দাও।" ডেপুটী বাবু মনে মনে করিলেন এভালই হইয়াছে। যদিচ কাল কোন কথা প্রকাশ করে নাই, কিন্তু আর অধিক দিন থাকিলে প্রকাশ করিবার অসম্ভাবনা কি? স্ত্রীলোকের পেটে কথা থাকে না। এই ভাবিয়া তিনি অবিলম্বে মনোরমাকে পাঠাইয়া দিতে সম্মত হইলেন। বাহিরে আসিয়া লালবিহারী বাবু পাল্কী বেহারা আনিবার হুকুম দিলেন। ক্ষণকাল পরেই ছয় জন বেহারা আসিল। পাল্কী লালবিহারী বাবুরই আছে।

অন্তঃপুরে মনোরমা ও বিধুমুখী উভয়ে কথোপকথন করিতে-ছেন। বিধুমুখী কহিলেন "দিদি, তুমি আজ যাচ্চ কিন্তু আমি যে কেমন করে থাকবো তা বুঝতে পারছি নে। এতদিন আমার ঘর আলোময় ছিল, আজ অন্ধকার হবে। যে দিন এসেছিলে সে দিন থেকে এত দিন কেমন আলোময় ছিল। আজ আবার যে আঁধার সেই আঁধার হবে।

মনোরমা। বালাই আঁধার কেন হবে? তবে একটা জানলার থাকলে বা একটা পাখী পুসলেও চলে গেলে কষ্ট হয়,

আমিতো একটা মানুষ। অবশ্য দু এক দিন একটু কষ্ট হবে কিন্তু তার পরেই সেরে যাবে।

বিধুমুখী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিলেন, পরে কহিলেন "দিদি তোমার মুখটা আজ ভারি ভারি বোধ হচ্চে কেন? তোমার মুখতো কখনও এমন দেখি নাই?"

মনোরমা। সাধে কি আমার মুখ ভারি ভারি বোধ হয়? আমি এত দিন যে সুখে আছি এমন সুখ আমার এ জন্মেও হয় নি, এ সুখ ছেড়ে যেতে হলে কার না মুখ ভারি হয়?

বিধুমুখী। সুখ তো ভারি! কেবল খেটে খেটে মরেছ।

মনোরমা। এমন খাটুনি যেন আমি চিরকাল খাটি। আমাদের খাটা অভ্যাস আছে; না খাটলেই অসুখ হয়। আমি কবে ভাইটীর বিয়ে দেব, কবে আমার ঘরে একটী ছেলে হবে তাই আমি ভাবছি। ছেলে পিলে নাড়া চাড়ার চাইতে কি আর সুখ আছে? তুমি চিরজীবী হয়ে থাক, ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হোক, আর এখন যেমন গরিবের উপর দয়া মায়া আছে এমনি যেন চিরকাল থাকে, এই আমার আশীর্ব্বাদ।

বিধুমুখী। আমার মাথা খাও একশবার গরিব গরিব বোলো না। ও কথাটা শুনলে আমার বুক ফেটে যায়। পরমেশ্বর করুন নলিন শীঘ্র পাস হোক তাহলে তোমার আর দুঃখ থাক্‌বে না।

মনোরমা। তোমার মুখে ফুলচন্দন পড়ুক তাই যেন শীঘ্র হয়। আমার নিজের জন্যে আমি কিছু দুঃখ করি না। আমি তো চিরদুঃখী আছিই। কিন্তু আমার ভাইটীর জন্যই আমি

ভাবি। পরের ছেলেরা যেমন খায় পরে, দাদা আমার তা পান না। যদি দুবেলা স্বচ্ছন্দে দুটী ডাল ভাত খেতে, আর একখানা ফরসা কাপড় পরতে দেখে যেতে পারি তাহলেই আমার ইহ জন্মের সুখ ভোগ হয়।

বিধুমুখী মনোরমার কথা শুনিয়া আর্দ্রচক্ষে বলিলেন "দিদি আমি যত দিন বেঁচে থাকব তত দিন নলিনের কোন কষ্ট হবে না।

মনোরমা। তুমি স্বয়ং লক্ষ্মী, তোমার আশ্রয়ে থাকলে কার কষ্ট হয়? এই কথার পরেই দাসী আসিয়া সম্বাদ দিল পাল্কী বেহারা প্রস্তুত, চড়িলেই হয়। বিধুমুখী মনোরমাকে কিঞ্চিৎ আহার করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মনোরমা আর ও গৃহে জলগ্রহণ করিবেন না মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন সুতরাং কিছুই আহার না করিয়া চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন।

বিধুমুখী। দিদি, আর কবে তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

মনোরমা। কালকার রাত্রে যে ভয় পেয়েছি তাতে বোধ হয় আমি আর অধিক দিন বাঁচবো না। আর দেখা শুনা পরমেশ্বরের হাতে।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

গ্রেপ্তার।

রামটহল যখন রায় মহাশয়ের আদেশ অনুসারে অজ্ঞাত বাস করিতে স্বীকৃত হইল তখন কলিকাতায় হুলী অর্থাৎ দোল যাত্রার মহাধুম। রামটহল সে আমোদ পরিত্যাগ করিয়া দেশে যাইবার কোন মতেই ইচ্ছা হইল না। প্রাতঃকালে ধূলি ধূসরিত হইয়া স্নানান্তে আবীরে বিভূষিত হইল। দেশস্থ অন্যান্য সকলের সঙ্গে মিলিয়া আমোদ প্রমোদে প্রমত্ত হইল। দেশী দারু অনেক খাইল ও খাওয়াইল। রায় মহাশয় যে আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে কাহাকেও কিছু না বলিয়া দেশে চলিয়া যাইবে সে কথা ভুলিয়া গেল। সায়ংকালে দেখিল আর কাহারো নিকট দারু খরিদ করিবার অর্থ নাই। তাহার আত্মীয়বর্গ তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া কহিল "এত কাল বাঙ্গালা দেশে ছিলে কিন্তু টাকা কোথায়? দেশেও যে ছাতু এখানেও কি সেই ছাতু খেতে হবে?" রামটহল লজ্জিত হইয়া কহিল "টাকার অভাব কি।" একশত

টাকার একখানি নোট তাহার এক বন্ধুর হস্তে দিল এবং কহিল "যত দারু দরকার হয় নিয়ে এস।" এই বলিয়া গান ধরিল।

"পরদেশী ঘুম আয়া ছগর বাঙ্গালা।"

রাম টহলের বন্ধু যে দোকানে দারু আনিতে গিয়াছিল তাহার দোকানে একশত টাকার নোটের টাকা ছিল না। সে দোসরা এক সওদাগরের দোকানে রাম টহলের বন্ধুকে লইয়া গেল। এ সওদাগরের দোকান বড় দোকান। গেজেটে যখন যে নোট চুরী যাওয়ার কথা প্রকাশ হয় তাহা প্রতিদিন গেজেট হইতে নকল করিয়া রাখে। রাম টহলের বন্ধু যে নোট খানি দিল তাহার নম্বর দেখিবামাত্রই সে নোট খানি যে হারাইয়া গিয়াছিল এবং সে বিষয় গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছিল তাহা অবিলম্বে জানিতে পারিল। অতঃপর রামটহলের বন্ধুকে পুলিসে ধরিয়া দিল। রাম টহলের বন্ধু কিছুই জানে না। তাহার সন্দেহ হইয়াছিল বটে যে একশত টাকার নোট রাম টহলের নিকট থাকা অসম্ভব কিন্তু রাম টহল বাঙ্গালা দেশে চাকরি করিয়াছে বিশেষ জমিদারের সরকারে, এরূপ অবস্থায় একশত টাকার নোট তাহার নিকট থাকার বিচিত্র নাই। যাহাই হউক কনষ্টেবল তাহাকে লইয়া থানায় চলিয়া গেল। সকলেই জানে "আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি" সুতরাং সে অনায়াসেই নোট খানি রামটহলের নিকট হইতে পাইয়াছিল বলিয়া দিল।

এদিকে রামটহল "পরদেশী ঘুম আয়া ছগর বাঙ্গালা" গাইতেছে এবং আর দু তিন জন তবলায় ও করতালে তাল

দিতেছে। এবং মুহুর্মুহু কখন দারু লইয়া তাহার বন্ধু আসিবে এই ভাবনা ভাবিতেছে এমন সময়ে কোথায় কাগজে মোড়া রক্তবর্ণ তরল বস্তু আসিবে তাহা না হইয়া রক্তবর্ণ শিরস্ত্রাণে বিভূষিত সাদ্ধ তিন হস্ত পরিমিত এক কনষ্টেবল আসিয়া উপস্থিত হইল। পশ্চাৎ পশ্চাৎ তাহার বন্ধু যিনি দারু আনিতে গিয়াছিলেন তিনিও সমাগত হইলেন দেখিয়া রামটহলের হৃৎকম্প হইল। অবিলম্বে রামটহলের সেই নোট খানির কথা মনে হইল। নেসা ছুটিয়া গেল, গীত বাদ্য বন্ধ হইল। রামটহল অকূল পাথারে পড়িল। পরে যাহা হইল তাহা সত্বরই পাটকবর্গ জানিতে পারিবেন।

সপ্তচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

নকড়ীর মার আবেদন।

নকড়ীর প্রাণদণ্ডের আদেশ হইলে নকড়ীর মাতা ও মঙ্গল প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ছোট লাট সাহেবের দ্বারের দুই পার্শ্বে দুই জন বসিয়া থাকে। তাহাদিগের বড় আশা ছিল যে জজ সাহেবের রায় হাইকোর্টে বাহাল থাকিবে না কিন্তু সে আশা নিষ্ফল হইল। হাইকোর্ট জজ সাহেবের হুকুম মঞ্জুর রাখিল। নকড়ীর মাতা ও মঙ্গল কোন মতেই বিশ্বাস করে নাই যে নকড়ীর দ্বারা রামটহলের প্রাণ বধ হইয়াছে এই জন্যই

ছোট লাট সাহেবের দ্বারে বসিয়া থাকিত যে একবার তাঁহার সহিত দেখা হইলে মনের কথা কহিবে। ছোট লাট সাহেব যখন বাহির হন এত লোক জন অগ্র পশ্চাতে গাড়ীতে ঘোড়াতে যায় এবং তাহাদিগের বেশভূষা এতই এক রকম যে কে লাট সাহেব তাহা কিছুই টের পায় না। যাহাকে দেখিতে পায় হুজুর হুজুর বলিয়া চীৎকার করে কিন্তু সে শব্দের অনুরোধে কেহ গাড়ী বা ঘোড়া কিছুই থামায় না।

এদিকে নকড়ীর ফাঁসি হইবার দিবস নিকট হইয়া আসিল। অদ্যই ছোট লাট সাহেবকে নকড়ীর মাতার প্রার্থনা না জানাইলে নয়। নকড়ীর মাতা নিরুপায় হইয়া যে রাস্তা দিয়া লাট সাহেবের গাড়ী যায় সেই রাস্তায় শয়ন করিয়া রহিল। লাট সাহেব ইতিপূর্ব্বে বাহিরে যাইবার সময় নকড়ীর মাতাকে ও মঙ্গলকে অনেকবার দেখিয়াছেন কিন্তু ভিখারী কিম্বা সামান্য লোক মনে করিয়া তাহাদের বিষয়ে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করেন নাই। অদ্য যেমন দ্রুতবেগে অশ্ব চালিত হইতেছিল কোচবান সম্মুখে নকড়ীর মাতাকে শায়িত দেখিয়া অশ্বের গতি থামাইল। লাট সাহেব বিরক্ত হইয়া অশ্বের গতি রোধের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। কোচবান কহিল সম্মুখে একটী স্ত্রীলোক শায়িত আছে। অশ্ব চালাইলে তাহার প্রাণ বধ হইবার আশ-ঙ্কায় চালাইতে পারে নাই। লাট সাহেব গাড়ীর জানালা দিয়া দেখিলেন যথার্থই একটী স্ত্রীলোক রাস্তায় শুইয়া আছে। আরও চিনিলেন যে সেই স্ত্রীলোকটীকে অনেক দিন তাঁহার দ্বারের দুই পার্শ্বে বসিয়া থাকিতে দেখিয়াছেন। এই নিমিত্ত তিনি মনে

করিলেন স্ত্রীলোকটীর কোন না কোন আবেদন আছে তখন কোচবানকে গাড়ী থামাইতে বলিয়া স্ত্রীলোকটীকে ডাকিলেন কহিলেন "তুমি রোজ রোজ এখানে কেন থাক আর আজই কেন রাস্তার সম্মুখে শুয়ে ছিলে। তোমার যদি কিছু বোলবার থাকে নির্ভয় চিত্তে আমাকে বল।

এ দেশের যেরূপ দস্তর আসল কথা কহিবার অগ্রে অনেক অসংলগ্ন ও অনাবশ্যক কথা কহে। নকড়ীর মাতাও সেইরূপ কহিতে লাগিল বলিল "বাবা তুমি সাহেবই হও আর বাঙ্গালিই হও তুমিত মানুষ? তোমার মাও ছিল বাপও ছিল। তোমার মা তোমাকে মাই খাইয়েছেন, তুমি আকাশ থেকে পড়ে লাট সাহেব হও নাই। তোমার মা বেঁচেই থাকুন আর মরেই যান তুমি তাঁর মাই খেয়ে মানুষ। আমার নকড়ী আমার ছেলে সে আমার মাই খেয়ে মানুষ হয়েছে। তাকে বিনা অপরাধে জজ সাহেব ফাঁসির হুকুম দিয়েছেন আর হাইকোর্টে ঐ রায় বাহাল করেচে। বাবা তোমার ফাসি দেবারও ক্ষমতা আছে বাঁচাবারও ক্ষমতা আছে। আমার এই ভিক্ষা আমার নকড়ীর প্রাণদণ্ড যেন না হয়। তোমার মা এখন থাকুক বা না থাকুক এককালে ছিল ত বটে। তোমার যদি ফাঁসির হুকুম হ'ত তাহলে তোমার মার মনে কি হ'ত ভেবে দেখ। আমি নকড়ীর মা। আমার সোনার নকড়ীর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। হাইকোর্ট সেই রায় বহাল করেচে। আমি আর কিছু চাইনে তুমি সেই কাগজ পত্র গুলা দেখ দেখে যা তোমার বিবেচনা হয় তাই কর কিন্তু মনে কোরো আমি সেই নকড়ীর মা। তোমার মা

তোমাকে যেমন করে, আমি গরিব কিন্তু আমারও তেমনি ক’রতে ইচ্ছা হয়” এই বলিয়া নকড়ীর মাতা ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল।

ছোট লাট সাহেবেরা ছোট কার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমে ক্রমে লাট সাহেব হন। এদেশের ভাষা তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে হয় এবং বহু দিবস থাকা বিধায় বাঙ্গালা ভাষা অনায়াসেই বুঝিতে এবং কহিতে পারেন সুতরাং নকড়ীর মাতা যাহা কহিল ছোট লাট সাহেব সমস্ত সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিলেন। বৈকালে বায়ু সেবনার্থ বাহিরে যাইতেছিলেন কিন্তু নকড়ীর মাতার কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন এবং অবিলম্বে গাড়ী ফিরাইতে কহিলেন। নিজ ভবনে আসিয়া নকড়ীর মাতাকে ডাকাইলেন পরে জিজ্ঞাসা করিলেন “ফাঁসির দিন কবে?” নকড়ীর মাতা কহিল “আর তিন দিন বই নাই।” তখন ছোট লাট সাহেব পেনসিল দ্বারা একখানি কাগজে লিখিয়া নকড়ীর মোকর্দ্দমার নথি হাইকোর্ট হইতে তলপ করিলেন এবং নকড়ীর মাতাকে কহিলেন “কাল বৈকালে তুমি এখানে আসিবে তাহা হইলে তোমার পুত্রের অদৃষ্টে কি হয় জানিতে পারিবে, কিন্তু একথা মনে রেখো যদি তোমার পুত্রের দোষ হইয়া থাকে তাহা হইলে আমি তাহাকে বাঁচাইতে পারিব না।”

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ।

সিংহ গর্ত্তে।

মনোরমা বিধুমুখীর নিকট হইতে বিদায় হর্ষোৎফুল্লচিত্তে শিবিকা আরোহণ করিলেন। হর্ষোৎফুল্ল কেন হইলেন তাহা পূর্ব্বেই পাঠকবর্গ জানিতে পারিয়াছেন। মনোরমার বাটী অধিক দূর নহে সুতরাং চারি জন অপেক্ষা বেশী বাহকের দরকার নাই। কিন্তু গগন শিবিকার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছে। মনোরমা দেখিয়া কহিলেন "গগন তুমি আবার আসচো কেন? আমি এখনই বাটী পৌঁছিব। তবে তোমার আস্‌বার দরকার কি?" গগন কহিল "পাছে আপনার রাস্তায় কোন কষ্ট হয় এই জন্য বাবু আমাকে আপনার সঙ্গে সঙ্গে যেতে হুকুম দিয়েছেন।"

মনোরমার মনে লালবিহারী বাবুর বিরুদ্ধে যে সমস্ত কথা উদিত হইয়াছিল গগনকে দেখিয়া তাহার অনেক হ্রাস হইয়া গেল। মনোরমা লেখা পড়া জানিতেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমং" ইহা শাস্ত্রের কথা। মনোরমা ভাবিলেন যদি মুনীদেরও মতিভ্রান্তি হইয়া থাকে তাহা হইলে

লালবিহারী বাবু সামান্য লোক তাঁহার মতিভ্রম হইবার অসম্ভাবনা কি ? ফলতঃ গগন আসায় মনোরমা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন এবং লালবিহারী বাবু যে কদাচরণ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় বিস্মৃত হইলেন।

প্রাতঃকালে শিবিকা আরোহণ করিয়াছেন, বেলা আড়াই প্রহর হইল তথাপি মনোরমা বাটী পৌছিতে পারিলেন না। বাটী পৌছান দূরে থাকুক বাটীর নিকটবর্ত্তী যে সমস্ত পথ ঘাট বৃক্ষ ইত্যাদি তাহার কিছুই তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল না। সাক্ষ্য দিতে আসিবার সময় অতি সত্বরেই নিজ বাটী হইতেই লালবিহারী বাবুর কার্য্যস্থলে পৌছিয়াছিলেন কিন্তু প্রত্যাগমন করিবার সময় এত দেরী হইতেছে কেন বুঝিতে পারিলেন না। শিবিকা বাহকগণ অপরিচিত। গগনের সহিত যদিও দুই এক বার কথোপকথন হইয়াছে তথাপি তাহাকে ডাকিয়া যে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন তাহাও লজ্জা ক্রমে পারিলেন না। ক্রমে অপরাহ্ণ হইতে দেখিয়া মনোরমা লজ্জা ত্যাগ করিয়া গগনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গগন এত দেরী হচ্চে কেন ? আমি আস্‌বার সময় অতি সত্বরই এসেছিল। কিন্তু এখন বৈকাল বেলা হয়ে গেল তবুও পৌছিতে পারছি না কেন ?"

লোকের চেহারা দেখিলে এমন কি নাম শুনিলেও তাহার চরিত্রের বিষয় কতক না কতক জ্ঞান উপলব্ধি হইয়া থাকে। গগন যখন প্রথমে নলিনের সহিত নলিনের বাটীতে যাইতেছিল তখন মনোরমা সম্বন্ধে তাহার যেরূপ মনের ভাব ছিল মনোরমাকে দেখিয়া সে সমস্তই পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছিল

একথা পাঠকবর্গ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছেন। তদবধি গগনের মনে মনোরমার প্রতি ভক্তিভাব ভিন্ন আর অন্য ভাব কিছুই ছিল না। অদ্য লালবিহারী বাবু শিবিকাবাহক-বর্গকে ও গগনকে বলিয়া দিয়াছেন মনোরমাকে নিজ বাটী না লইয়া গিয়া যেন সোনাপুরে লইয়া যায়। লাল-বিহারী বাবু মহাবিদ্যা আরাধনা করিয়া এই অভিসন্ধি স্থির করিয়াছিলেন। মনে করিয়াছিলেন মনোরমাকে নিজ বাটী না পাঠাইয়া দিয়া সোনাপুরে পাঠাইয়া দিলে তাঁহার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবেক। মনোরমা যে রাত্রে অজ্ঞান হন সে রাত্রের কথা বিধুমুখীকে না বলায় লালবিহারী বাবু একার্য্য মনোরমার মনোনিত হইবে বলিয়া মনে মনে স্থির করিয়াছিলেন। গগন লাল-বিহারী বাবুর সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ভৃত্য সুতরাং মনোরমাকে তাহার নিজ বাটী না লইয়া গিয়া সোনাপুরে লইয়া যাইবার ভার তাহা-রই উপর অর্পণ করিলেন। গগন ইহাতে কিঞ্চিৎ মাত্রও সুখী হয় নাই কিন্তু কি করে প্রভুর আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারে না। বাল্যকালাবধি সে লালবিহারী বাবুর ভৃত্য। এতকাল লালবিহারী বাবু যে বেতন দিতেন তাহা দ্বারা তাহার বৃদ্ধ পিতা মাতার ভরণ পোষণ করিয়াছেন। এখনও উভয়েই জীবিত। লালবিহারী বাবুর দাসত্ব ত্যাগ করিলে তাহাদিগের জীবন ধারণের আর অন্য উপায় নাই। সুতরাং অত্যন্ত অনিচ্ছা সত্বেও প্রভুর আদেশ পালন করিতে হইল।

মনোরমা বাটী পৌঁছিতে অত্যন্ত বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া গগনকে জিজ্ঞাসা করিলেন "গগন এত বিলম্ব হচ্চে কেন?"

উত্তর দিতে গগনের মুখ শুকাইয়া গেল, অতি কষ্টে কহিল "বেহারারা সত্বর পৌছিবে বলিয়া সদর রাস্তা ত্যাগ করিয়া মাঠের রাস্তায় আসিয়াছিল কিন্তু পথ ভুলিয়া গিয়া তাহাদিগের দ্বিগুণ পরিশ্রম হইয়াছে এখন যে কত দূর আছে তাহা তাহারা বলিতে পারে না। এ রাত্রে পৌছিতে পারিবে এরূপ বোধ হয় না। সম্মুখে দেখিতেছি সোনাপুর। সোনাপুরে বাবুর বাড়ী। সেখানে একটী দাসী ভিন্ন আর কেহই নাই। আমার বিবেচনায় আজ রাত্রে সোনাপুরে থাকা যাক কাল সকালে উঠিয়া আপনাকে পৌছিয়া দিব।"

গগনের কথা শুনিয়া মনোরমার কোন সন্দেহ হইল না কিন্তু তাহার চেহারা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত ভীত হইলেন। কি করেন, কোন উপায় নাই। গগনের কথায় সম্মত হইতেই হইবে। পরে পাল্কী সোনাপুরে ডেপুটী বাবুর দ্বারে সংলগ্ন হইল। মনোরমা পাল্কী হইতে নামিয়া বাটীর অভ্যন্তরে গমন করিলেন। গগন তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল। অনন্তর বৃদ্ধা দাসী সোনামণির সহিত আলাপ করাইয়া দিয়া সে নিজে বহি-র্বাটী আসিল। তামাক সাজিয়া টানিতে টানিতে মনে করিতে লাগিল "এখন কি করা উচিত। নলিন তাহাকে চিরকাল ভাল বাসিয়াছে। কখন অসন্তোষের কথা কহে নাই। জাতিতে ব্রাহ্মণ তথাপি নলিন যে গগন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ একথা প্রকাশ করিয়া বলে নাই। সংক্ষেপতঃ উভয়েরই পরস্পরের ভ্রাতৃভাব সংস্থাপিত হইয়াছিল। মনোরমাকে যদিও একবার ভিন্ন দেখে নাই তথাপি গগন তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি শ্রদ্ধা করিত।

লালবিহারী বাবু যখন গগনকে মনোরমার রক্ষণাবেক্ষণার্থ পাঠাইয়া দেন তখন তাহাকে কোন কথা স্পষ্ট করিয়া বলেন নাই সত্য কিন্তু তাঁহাকে নিজ বাটী না পাঠাইয়া সোনাপুরে লইয়া যাইবার আদেশ দেওয়ায় তাহার মনে নানাবিধ সন্দেহ উপস্থিত হইল। তখন গগন হঠাৎ হুকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিল। মনে করিল নলিনকে একথা বলিয়া দেওয়া সর্ব্বতোভাবে উচিত ইহাতে তাহার চাকরি থাকুক কিম্বা যাউক।

গগন সোনামণির সহিত মনোরমার আলাপ করাইয়া দিয়া বাহির বাটী আসিয়াছিল তদবধি মনোরমার সহিত আর তাহার দেখা হইল না। নূতন স্থান, কাহারও সহিত আলাপ নাই, একমাত্র গগন পূর্ব্ব পরিচিত সেও অনুপস্থিত। এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া মনোরমা যার পর নাই শঙ্কিত হইলেন। একাকী বিরলে বসিয়া তিনি কোথায় আইলেন, কোথায় থাকিবেন আর কোথাই বা যাইবেন মনোরমা এই ভাবনা ভাবিতেছিলেন। রাত্রে যে কিছু ফল মূল আহার করিবেন সে কথা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। পুনঃ পুনঃ গগনকে ডাকিলেন কিন্তু গগন কোথায় আছে কেহই বলিতে পারিল না। এজন্য তাঁহার আশঙ্কা অধিকতর বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এমন সময়ে সোনামণি আসিয়া কহিল "রাত্রে কি খাবে গা। কি উদ্যোগ কোরবো।" মনোরমা উত্তর করিলেন "আমি বিধবা মানুষ রাত্রে কিছুই খাইনে। আমার জন্য কোন উদ্যোগ কোরতে হবে না।" সোনামণি উত্তর করিল "এবাড়ীতে ঢের বিধবা দেখেছি। প্রথমে কেউ কিছু খেতে চায় না। পরে মাচ মাংস সবাই খেয়ে থাকে।"

ছাগল যেমন সিংহের গর্ত্তে গিয়া ভয় পায় সোনামণির কথা শুনিয়া মনোরমার তাহা অপেক্ষা সহস্র গুণ ভয় হইল। চকিতের মধ্যে বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার নিজ বাটী না পাঠাইয়া সোনাপুরে পাঠাইয়া দিবার কোন না কোন নিগূঢ় কারণ আছে। তখন তিনি সোনামণিকে কহিলেন "তোমার পায়ে পড়ি আমার মাথা খাও আজ রাত্রের জন্যে আমাকে একটী ঘরে থাকতে দাও। যেন সে ঘরে আর কেউই না আসে। আমি রাত পোয়ালেই নিজের বাড়ী চলে যাব।

সোনা।, সকলই এমনি বলে থাকে কিন্তু ক্রমে সকলেই পোষ মেনে যায় কিন্তু তোমার মত বাড়াবাড়ী কথা কেউ কখন কহে নাই।

মনোরমা শুনিয়া অবাক হইলেন। তিনি যথার্থই যে সিংহের গর্ত্তে প্রবেশ করিয়াছেন তখন তাহা প্রথমে স্পষ্টরূপে অবগত হইতে পারিলেন। করযোড় করিয়া সোনামণিকে বিনীত ভাবে কহিলেন "মা আমি তোমার কন্যা। তোমার আপন কন্যাকে যেরূপ স্নেহ কর আমাকেও সেইরূপ কোরো। আমার বোধ হচ্চে এখানে থাকলে অবশ্যই কোন না কোনরূপ বিপদ হবে। একমাত্র তুমিই আমাকে বিপদ হ'তে রক্ষা কোরতে পার। আমি তোমার পায়ে ধোরছি আমাকে বিপদ হতে রক্ষা কর। পূর্ব্বেই বলেছি আমি তোমার কন্যা আমি মিনতি কোরছি তোমার নিজের কন্যাকে যে চক্ষে দেখ আমাকেও সেইরূপ দেখো। তোমার আপন কন্যার কোন অনিষ্ট হলে তোমার মনে যেরূপ ব্যথা হয় আমার অনিষ্টেও

যেন সেইরূপ হয়; অধিক বলা বাহুল্য আমি নিরাশ্রয় ও অবলা স্ত্রীলোক। তুমি আমা হতে বয়সে অনেক বড়। আমার জাত মান সর্ব্বস্বই তোমার হাতে। তুমি রাখলে পার নষ্ট কোরলে পার। আমি গলবস্ত্র হয়ে পায়ে ধোরে বোল্‌ছি আমার যেন কোন অনিষ্ট না হয়।”

লৌহ হৃদয় সোনামণি (নামটী লৌহমণি হইলেই ভাল হইত) মনোরমার কাতর উক্তিতে কর্ণপাতও করিল না। মুসলমান যবাই করা মুর্গীর ছটফটানি যেরূপ নিরুদ্বেগে ও আহ্লাদিত চিত্তে অবলোকন করে সোনামণিও সেইরূপ মনোরমার মিনতি ও রোদন নিশ্চিন্ত চিত্তে শুনিল, কহিল “ভয় কি? এখানে তুমি পরমসুখে থাক্‌বে। কত লোক তোমার মত কেঁদেছে তোমার মত বলি কেন, তোমার অপেক্ষাও অধিক কেঁদেছে অধিক ছটফট কোরেছে কিন্তু ক্রমে তারা ভাগ্য বলে মেনেছে যে এবাড়ীতে প্রবেশ কোরেছিল। এ সংসার সোনার সংসার, খাওয়া পরা গয়না গেঁটে কোন বিষয়েই এ সংসারে কষ্ট নাই। এ কুবেরের ভাণ্ডার, যখন যা চাও তাই পাবে যখন যে ইচ্ছে হবে তাই পূর্ণ হবে।”

সোনামণির কথা শুনিয়া মনোরমার যে কিছু সন্দেহ ছিল তাহা একেবারে ভঞ্জন হইয়া গেল। ভাবিতে লাগিলেন আমার এ অপমানের মূলীভূত কারণ কে? দুটী নাম মাত্র মনে আসিল। ইহার কারণ হয় নলিন অথবা গগন। নলিন তাঁহার প্রাণের প্রিয়তম ভ্রাতা। তাহা দ্বারা এ কার্য্য হইবে এ কোন মতেই তাঁহার বিবেচনায় আসিল না। তবে কি গগন? মনে করিলেন

হে গগন আমি কায়মনোবাক্যে কখন তোমার কোন অপকার করি নাই। আমি স্বপ্নেও কখন তোমার কোন অনিষ্ট চিন্তা করি নাই। তুমি আমার ভাইকে ভাল বাসিতে এই জন্য প্রতিদিন শিবপূজা করিয়া তোমার আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। তোমাতে ও আমার ভাইতে কখন কোন তফাৎ ভাবি নাই। তবে তুমি কেন এরূপ কার্য্য করিলে? তুমিই করিয়াছ বোধ হইতেছে নতুবা তুমি আমাকে এখানে পৌছিয়া দিয়া কেন চোরের ন্যায় পালায়ন করিলে। ঈশ্বর জানেন আমি তোমার কখন কোন মন্দ চিন্তা করি নাই। আমার ভাইকেও যেমন দেখি তোমাকেও তেমনি দেখি। এইরূপ কার্য্য কি তোমার উচিত, গগন? তুমি আমাকে ভগ্নীর মত না ভাবিতে পার কিন্তু আমি তোমাকে সহোদরের মত স্নেহ করি। তোমার নিজেরও ভগ্নী আছে কিন্তু বোধ হয় আমি তোমাকে যেরূপ স্নেহ করি সে তাহা অপেক্ষা বেশী করে না। এইরূপ ভাবনা ভাবিতে ভাবিতে মনোরমা মনোদুঃখে রাত্রি যাপন করিলেন। কিঞ্চিৎমাত্রও নিদ্রা হইল না।

ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

হরিষে—

রজনী প্রভাত হইল। দশ দিক আলোকময় হইল কিন্তু মনোরমার অন্তঃকরণে সে আলোকের লেশ মাত্র প্রবিষ্ট হইল না। মনে করিয়াছিলেন শিবিকা বাহকেরা পথ ভুলিয়া আসিয়াছে। রাত্রে সেই খানেই আছে পরদিবস তাঁহাকে লইয়া নিজ বাটী পৌছিয়া দিবে। সোনামণির কথা শুনিয়া যদিও ইহাতে ঘোরতর সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল তথাপি শিবিকা বাহকেরা যে তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে এরূপ চিন্তা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয় নাই। কিন্তু প্রত্যূষে উঠিয়া বেহারা চলিয়া গিয়াছে দেখিয়া তাঁহার মন কিরূপ হইল তাহা সহজে অনুভূত হইতে পারে কিন্তু লিখিয়া ব্যক্ত করা দুঃসাধ্য। কি করেন আনায় মাঝারে পড়িয়াছেন ছট্‌ফট্‌ করিলে তাহাতে ব্যাধের দয়া হইবে না। যাঁহারা আমোদ করিয়া বর্শী দ্বারা মৎস্য ধরিতে যান মৎস্যটী অবিলম্বে উঠিলে তাঁহাদের আমোদ বোধ হয় না। মৎস্যটী প্রাণ ভয়ে এধার ওধার করিলে হুইলের

সুতা টানিয়া লইয়া গেলে তাঁহাদিগের যেরূপ আনন্দ বোধ হয় এক টানেই উঠিলে সেরূপ বোধ হয় না। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে মনোরমা মৎস্য সোনামণি মৎস্যধারিণী। মনোরমা যতই মনঃকষ্টে ছটফট করিতেছেন সোনামণির ততই আনন্দ বৃদ্ধি হইতেছে। মনোরমা কাঁদিয়া কাটিয়া অনাহারে রাত্রি জাগরণ করিয়া এক প্রকার বেহুঁসের ন্যায় হইয়া গেলেন। এবং বিনা শয্যায় ধরাতলে নিপতিত হইয়া পড়িয়া রহিলেন।

নকড়ীর মাতা যথাবিধ আদিষ্ট পরদিবস লাট সাহেবের বাটীতে উপস্থিত হইল। লাট সাহেব ইতি মধ্যে নকড়ীর মোকর্দ্দমা সম্বন্ধে সমস্ত কাগজ পত্র পাঠ করিয়াছেন। ডাক্তার সাহেব যে লাসটী পরীক্ষা করিয়াছিলেন তাহা যথার্থ রামটহলের কি না এ সম্বন্ধে তাঁহার অত্যন্ত সন্দেহ উপস্থিত হইল। আদালতে এ বিষয়ে কোন কথা উত্থাপিত হয় নাই। লাট সাহেব এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া নকড়ীকে বেকসুর খালাস দিয়া সেই হুকুম অন্যান্য কাগজাদির সঙ্গে হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। নকড়ীর মাতা লাট সাহেবের বাটী পৌছিলে লাট সাহেবের আজ্ঞা অনু-সারে তাহার পৌছান বার্ত্তা লাট সাহেবের নিকট নিবেদিত হইল। লাট সাহেব তৎশ্রবণে নিজে নিম্নে আসিয়া কহিলেন "তোমার পুত্ত্রকে রেহাই দিয়াছি তাহার প্রাণদণ্ড হইবে না।" নকড়ীর মাতা এই কথা শ্রবণমাত্র আনন্দে চীৎকার করিয়া বেহুঁস হইয়া ভূতলে পতিত হইল। লাট সাহেব স্বহস্তে তাহার

মুখে ও চক্ষে জল দিয়া মূর্চ্ছা ভঙ্গ করিলেন। জ্ঞান লাভ করিয়া নকড়ীর মাতা সাহেবকে যে আশীর্ব্বাদ করিল তাহাতে তাঁহার চক্ষু দিয়া অশ্রু বর্ষণ হইতে লাগিল, কহিলেন "তুমি অবিলম্বে যাও। কাল নকড়ীর ফাঁসির দিন, আমি তারে খবর পাঠাইতে আদেশ করিয়াছি নকড়ীর ফাঁসি হইবে না। যদি সে খবর নিয়মিত সময়ে না পৌঁছে তুমি বলিও 'দোহাই লাট সাহেবের ফাঁসি যেন না হয়।' এই কথা বলিলেই আর ফাঁসি হইবে না।

নকড়ীর ফাঁসির হুকুম হইয়াছে এবং অতি সত্বরই ফাঁসি হইবে এ কথা প্রচার হওয়ায় রায়মহাশয়ের বাটীতে আনন্দের সীমা রহিল না। ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের ফুর্ত্তি কে দেখে স্বস্ত্যয়ণের এরূপ ফল কখন ফলে নাই। নূতন করিয়া দ্বাদশটী শিব প্রস্তুত হইল সঙ্খ ঘণ্টা বাদ্যোদ্যমে পূজা হইতে লাগিল। নিকটস্থ কালীবাড়ীতে অসংখ্য ছাগলের প্রাণনাশ হইল। কাহারও সহিত শত্রুতা রহিল না। লক্ষ্মণের নিমন্ত্রণ হইল, নলিন আসিয়া দেখিয়া যাউক এই অভিপ্রায়ে তাহারও নিকট নিমন্ত্রণ পত্র গেল। এ দুই নিমন্ত্রণ সম্বন্ধে এবার ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের আপত্তি রহিল না এমন নহে তিনি নিজেই রায় মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করাইলেন। সূর্য্যোদয়ে প্রাতঃস্নান করিয়া রুদ্রাক্ষমালায় বিভূষিত হইয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় ববম বম শব্দ করত শিবের পূজা করিতেছেন।

এ অধ্যায়ে মনোরমা ভিন্ন সকলেরই হরিষ কাহারও বিষাদ নাই। ডেপুটী বাবু মনোরমাকে সোনাপুরে রাখিয়াছেন। মকড়ীর ফাঁসি প্রাতেই হবে, রায় মহাশয়ের বাটীতে মহা ধুমধাম হইতেছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় হর্ষোৎফুল্লচিত্তে শিব পূজা করিতেছেন।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ।

বিষাদ।

নলিনের প্রতি গগনের অকৃত্রিম স্নেহ ছিল। তাহার ভগ্নীর বিপদ দেখিয়া গগনের বোধ হইল তাহারই নিজের বিপদ ঘটিয়াছে। এই সংস্কার-পরতন্ত্র হইয়া তাহার চাকরি থাকুক না থাকুক বিবেচনা না করিয়া মনোরমাকে সোনাপুরে পোঁছিয়া দিয়াই পুনরায় রেলওয়ে চড়িয়া কলিকাতায় গমন করিল। প্রাতঃকালে নলিনের বাসায় উপনীত হইল।

পূর্ব্ব রাত্রিতে পড়া শুনা করিয়া নলিন নিদ্রা যাইতে চেষ্টা করিয়াছিল। কোন মতে সুনিদ্রা হয় নাই। নানাবিধ স্বপ্ন দ্বারা তাহার নিদ্রার যৎপরোনাস্তি ব্যাঘাৎ হইয়াছিল। কখন স্বপ্নে দেখিল সে নিজে মরিতেছে কখন বা দেখিল তাহার ভগ্নী মরিতেছে। পুনঃ পুনঃ এইরূপ স্বপ্ন দেখায় শেষ রাত্রে গাত্রো-থান করিয়া বারাণ্ডায় একাকী বেড়াইতেছিল। মন অত্যন্ত

খারাপ ছিল, কিসে ভাল হইবে টের পাইতে ছিল না। মনে করিয়াছিল অন্যান্য সকলে জাগ্রত হইলে পরস্পরের সহিত কথোপকথনে স্বপ্ন বৃত্তান্ত ভুলিয়া যাইবে। দাস দাসীরা এখন কেহই গাত্রোত্থান করে নাই। চন্দ্র এখন অস্তে যান নাই, কিন্তু যাইবারও আর অধিক বিলম্ব নাই। এমন সময় বহির্দ্বারে ধম ধম করিয়া শব্দ হইল। নলিন সবিস্ময়ে নিকটে গিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। যাহাকে কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই, যে আসিবে এরূপ কখন প্রত্যাশাও করেন নাই এমন লোক সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল; গগন! গগন যে?

গগন। হ্যাঁ দাদাঠাকুর, একটা কথা বল্‌তে এসেছি।

সে কথায় মনঃসংযোগ না করিয়া নলিন জিজ্ঞাসিলেন "বাড়ীর সব ভাল ত?"

গগন। প্রাণে প্রাণে ভাল বটে; কিন্তু তোমাকে যা বোলতে এসেছি স্থির হয়ে শুন। এখনও অন্য কেউ উঠে নাই সৌভাগ্যের বিষয় বোলতে হবে। এই বলিয়া মনোরমা সম্বন্ধীয় সমস্ত বিষয় আনুপুর্ব্বিক বর্ণন করিল।

শুনিয়া নলিনের শরীর শিহরিয়া উঠিল। ক্ষিপ্তের ন্যায় গগনকে জিজ্ঞাসা করিলেন " গগন এখন উপায়?"

গগন কহিল "এই দণ্ডেই আমার সঙ্গে এস। পরমেশ্বর সহায় থাকলে আমরা উভয়ে একত্র হয়ে এবিষয়ে কৃতকার্য্য হব। আমার চাকরি যায় যাবে তাতে আমার দুঃখ নাই, কিন্তু এখন আর অধিক কথা বোল্‌বার সময় নাই অবিলম্বে রেল ছাড়বে, এক্ষণেই যেতে হবে।

গগনের বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে বসিতে দিতে হইবে কিম্বা অন্য কোন আদর অভ্যর্থনা করিতে হইবে এ সমস্ত নলিনের মন হইতে তিরোহিত হইয়া গেল। তাহার শেষ কথা ক্রমে একটী জামা ও একখানি চাদর লইয়া এবং যে কিঞ্চিৎ অর্থ নিকটে ছিল তাহা পকেটে ফেলিয়া বাটী হইতে গগনের সহিত নিষ্ক্রান্ত হইল।

লালবিহারী বাবু বেশ ভূষায় বিভূষিত এবং আতর গোলাপে গন্ধীভূত হইয়া যে ট্রেনে নলিন ও গগন যাইতেছিল সেই ট্রেনের একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীতে আরোহণ করিলেন। পূর্ব্বে খবর পাঠাইয়া দিয়াছেন সোনাপুর হইতে তাঁহার গাড়ী যেন ষ্টেসনে আসিয়া উপস্থিত থাকে। মনো মধ্যে তাঁহার যে কত রকম ভাব উদিত হইতে লাগিল তাহা বলা অসাধ্য। বহু দিবস পর্য্যন্ত আশা ছিল যে সুখ সম্ভোগ করিবেন তাঁহার চেহারা দেখিয়া সেরূপ সম্ভাবনার কিছু মাত্র বোধ হইল না। মুখ ম্লান ও চক্ষু প্রতিভা শূন্য। স্থানান্তরে বলিয়াছি লোকের মুখ হৃদয়ের দর্পন স্বরূপ। মনে যখন যে ভাবের উদয় হয় মুখে সেইরূপ ভাবের চিহ্ন প্রকাশ পাওয়া যায়। অদ্য লালবিহারী বাবু যে কার্য্যে যাইতেছেন তাঁহার মুখ দেখিয়া তাহার কিছুই বোধ হইল না। তাঁহার নিজের অন্তঃকরণও ভাল ছিল না। মৃত্যু আসন্ন হইলে লোকে মন্দ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, লালবিহারী বাবুর ও তাহাই ঘটিয়াছিল। তাঁহার শ্যামনগর ষ্টেসনে নামিবার কথা

ছিল। সোনাপুরের বাটী হইতে সেইখানেই তাঁহার গাড়ী আসিয়াছে। রেলগাড়ী মৃদু মন্দ গতিতে আসিতেছে অচিরাৎ আসিয়া ষ্টেসনে সংলগ্ন হইবে এমন সময় অপর দিক হইতে আর একটী ট্রেন প্রবল বেগে আসিয়া উহার সহিত ধাক্কা লাগিল। মুহূর্ত্তে মধ্যে গাড়ী সকলের পরস্পর ধাক্কার ভয়ঙ্কর শব্দ শ্রবণকুহর রোধ করিয়া ফেলিল। প্রতি গাড়ীর ভিতর হইতে লোক জনের হাহাকার শব্দ উত্থিত হইল। কত গাড়ী চূর্ণ হইয়া গেল। কত লোক মরিয়া গেল। কতগুলি মৃতবৎ আঘাতিত এবং কেহ কেহ বা অল্প আঘাতিত হইল। মৃতের মধ্যে লালবিহারী বাবু একজন। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ী কোন ট্রেনে এক-খানির অধিক প্রায় থাকে না। সুতরাং লালবিহারী বাবুর মৃতদেহ রেলওয়ে কোম্পানির লোকে অবিলম্বে গাড়ী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া ফেলিল। নলিন ও গগন গাড়ী হইতে অবতীর্ণ হইয়া লালবিহারী বাবুর মৃত দেহ দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। কিন্তু তথায় আর থাকায় কোন ফল নাই ভাবিয়া উভয়েই সোনা-পুরে যাইতে উদ্যত হইল। ষ্টেসনের বাহিরে আসিয়া দেখিল লালবিহারী বাবুর গাড়ী অপেক্ষা করিতেছে। অধিক কথা-বার্ত্তা না কহিয়া সেই গাড়ীতে উভয়ে আরোহণ করিল। গাড়য়ান যখন জিজ্ঞাসা করিল "বাবু কোথায়" তখন অন্য কথা না কহিয়া সংক্ষেপে উত্তর দিল "তিনি আইসেন নাই।"

এদিকে সোনামণির শাসনে মনোরমা মৃতবৎ হইয়া আছেন। অনেক মিনতি করিলেন, অনেক অর্থ স্বীকার করিলেন, সোনা-মণির পদতলে পর্য্যন্ত পড়িলেন কিন্তু সোনামণি কোন মতেই

তাহাকে ছাড়িয়া দিল না। বিনা সোনামণির আদেশে কাহারও সে গৃহ হইতে বাহির হইবার যো নাই। মনোরমা যখন শুনিলেন যে লালবিহারী বাবু অদ্যই আসিবেন এবং তাঁহাকে আনিবার জন্য ষ্টেশনে গাড়ী রওনা হইয়াছে তখন তাঁহার মনের ভাব যে কি হইল তাহা অনুভূত হইতে পারে কিন্তু বর্ণনা করা যাইতে পারে না। কিন্তু তিনি পিঞ্জরবদ্ধপক্ষী, কি করিবেন ? তাঁহার যাহা সাধ্য ছিল তাহা তিনি ভাবিয়া স্থির করিয়া রাখিলেন। গাভিশালা হইতে একগাছি দড়ি আনিয়া লুকাইয়া রাখিলেন। মনে মনে স্থির করিলেন বিপদ উপস্থিত হইলে জীবন যায় সেও ভাল উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিবেন তাহাও সহস্রগুণে উত্তম তথাপি জীবন থাকিতে অপমানিত হইবেন না। এইরূপ সংকল্প করিয়া বসিয়া আছেন এমন সময় দূর হইতে গাড়ীর ঘর্ঘর শব্দ তাঁহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। সোনাপুর পল্লিগ্রাম। সেখানে আর কাহারও গাড়ী নাই। সুতরাং গাড়ীর শব্দ শুনিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে সে লালবিহারী বাবুর গাড়ী। এবং সেই গাড়ীতে বাবু স্বয়ং আসিতেছেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ী দ্বারে সংলগ্ন হইল। সোনামণি প্রভৃতি দাস দাসীরা বাবুকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে আগমন করিল। মনোরমা ভাবিলেন আর উপায়ান্তর নাই তখন সেই গাভিরজ্জু গলদেশে সংলগ্ন করিয়া জিহ্বা প্রাণত্যাগ করিলেন।

নলিন ও গগন যতক্ষণ রেলওয়ে ছিল ততক্ষণ পরস্পর কেহ কাহারও সহিত কথোপকথন করে নাই। নানাবিধ আশঙ্কায় উভয়েই মৃতবৎ হইয়াছিল। পরে যখন ষ্টেশনে আসিয়া লাল-

বিহারী বাবুর মৃতদেহ অবলোকন করিল তখন উভয়েই শিহরিয়া উঠিয়াছিল বটে—কিন্তু দুঃখ না হইয়া এ ঘটনায় উভয়েরই চিত্ত হর্ষোৎফুল্ল হইয়াছিল। মনোরমার উদ্ধার হইবে ইহা অপেক্ষা আর তাহাদের পক্ষে অধিক আহ্লাদের বিষয় কি হইতে পারে। গাড়ী যখন লালবিহারী বাবুর দ্বারে সংলগ্ন হইল নলিন উর্দ্ধ শ্বাসে দৌড়িয়া বাটীর মধ্যে প্রবেশে করিতে ছিলেন। সোনামণি দুই হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক দ্বার অবরোধ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, নলিন তাহা না মানিয়া এক ধাক্কা দিয়া সোনামণিকে তফাৎ করিয়া দৌড়িয়া গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। কিন্তু কি দেখিল? মনোরমার জীবন শূন্য দেহ ঝুলিতেছে। লালবিহারী বাবুকে মৃত দেখিয়া তাহার যেরূপ আহ্লাদ হইয়াছিল মনোরমার মৃত দেহ দেখিয়া নলিন সেইরূপ বিষাদিত হইল। উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া কহিল "দিদি! তোমাকে যে এ অবস্থায় দেখিতে হইবে ইহা আমি স্বপ্নেও ভাবি নাই। আমি তোমার বয়সে ছোট কিন্তু তুমি চিরকাল আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিতে। আমার একটু কষ্ট হইলে তোমার হৃদয়ে সে কষ্ট সহস্র গুণ অধিক বোধ হইত। এখন তুমি সে দাদাকে ফেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলে। একবার চক্ষু খুলিয়া চাও, একবার দাদা বলিয়া ডাক, তাহা হইলে আমি যে পরিশ্রম করিয়াছি তাহা আর পরিশ্রম বলিয়া বোধ হইবে না। একদিনের তরেও তুমি আমাকে রুষ্ট কথা কও নাই। আমি যখন যাহা বলিয়াছি তাহাই করিয়াছ, যাহা চাহিয়াছি তাহাই দিয়াছ। আমাকে ছোট ভায়ের মত দেখিতে না, আমাকে সন্তানের মত দেখিতে। তোমার আজ্ঞা আমি

কখন লঙ্ঘন করি নাই। তুমি যখন যাহা বলিয়াছ আমি তাহাই করিয়াছি এখন আমাকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলে। কে তোমাকে আর আমার মত যত্ন করিবে। আমি তোমাকে যেরূপ ভাল বাসিতাম এরূপ আর কে ভাল বাসিবে। তুমি আর কোথাও আর একটী নলিন পাইবে। আর কাহারো দুঃখ হইলে তোমার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে, আর কাহারো এক বিন্দু কষ্ট হইলে তোমার হৃদয়ে শতগুণ কষ্ট বোধ হইবে। হে বিধাতা! এত দিনের পর আমি পিতা মাতা ভাই ভগ্নী সমস্তই একত্রে হারাইলাম এই বলিয়া নলিন সংজ্ঞা শূন্য হইয়া ভূতলে পতিত হইল।

নকড়ীর মাতা লাট সাহেবের কথা শ্রবণ মাত্র উর্দ্ধশ্বাসে জেলার সদর স্থানে আসিবার জন্য তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। সচরাচর পদব্রজে কলিকাতা হইতে তথায় আসিতে হইলে তিন দিনের কমে আসা যায় না। কিন্তু নকড়ীর মাতা যে কারণে আসিতেছে সে সহজ কারণ নহে। বেলা এগারটার সময় কলিকাতা হইতে বাহির হইয়া পথে কোন স্থানে না বসিয়া বা এক বিন্দু জল মাত্রও পান না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে সমস্ত পথ দৌড়িতে দৌড়িতে পর দিবস প্রাতে সূর্য্যোদয়ের পরেই আসিয়া যথাস্থানে উপস্থিত হইল। সেখানে আসিয়া দেখিল দলে দলে লোকজন জেলখানার দিকে যাইতেছে। কেহ কহিতেছে আর কখনও ফাঁসি দেখি নাই আজ নূতন দেখিব, কেহ কহিতেছে

আমি অনেক দেখিয়াছি বটে কিন্তু আর দেখিতে ইচ্ছা নাই তবে লোকের অনুরোধ পরতন্ত্র হইয়া আসিতেছি। এই সমস্ত কথা শ্রবণ করিয়া নকড়ীর মাতা বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। উত্তরে জানিতে পারিল যে তাহারই পুত্রের ফাঁসি দর্শনার্থ সকলে গমন করিতেছে। নকড়ীর মাতাকে কেহ চেনে না সুতরাং নকড়ী নামক এক ব্যক্তির ফাঁসি হইবে এই কথামাত্র তাহাকে শুনাইল। আর অধিক কথা কেহ কহিল না। নকড়ীর মাতা শ্রবণ করিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল এবং কাঁদিতে কাঁদিতে বিদ্যুতের ন্যায় বেগে সকলকে অতিক্রম করিয়া ফাঁসি স্থানাভিমুখে দৌড়িয়া চলিল। গিয়া দেখিল সকলই প্রস্তুত হইয়াছে। ফাঁসি কাট যথা স্থানে সংস্থাপিত হইয়াছে। হাত কড়া দিয়া নকড়ীকে আনিয়াছে। জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উপস্থিত আছে। ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশক্রমে একজন জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটও আসিয়াছে। নকড়ীর মাতা পৌঁছিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল "দোহাই লাট সাহেবের নকড়ীকে ফাঁসি দিও না। লাট সাহেব নিজে নকড়ীকে মাপ করেছেন এবং আমাকে নিজ মুখে বলেছেন যে নকড়ীর ফাঁসি হবে না। তোমরা যে ইচ্ছে সেই সাহেবই হও লাট সাহেবের দোহাই অবশ্য মানবে। আমি লাট সাহেবের দোহাই দিচ্চি নকড়ীর ফাঁসি মকুব কর। তারে খবর এসেছে যে নকড়ীর ফাঁসি হবে না তোমরা অবশ্যই সে খবর পেয়ে থাকবে।"

সাহেবেরা শুনিয়া পরস্পর পরস্পরের মুখাবলোকন করিলেন। অনুসন্ধানে জানিতে পারিলেন স্ত্রীলোকটী নকড়ীর মাতা। তখন পুত্র শোকে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়াছে এই স্থির করিয়া জনেক পুলিস

কর্ম্মচারীকে নকড়ীর মাতাকে স্থানান্তর লইয়া যাইতে আদেশ করিলেন। নকড়ীর মাতা কোন মতেই যাইতে চাহে না। অবশেষে বলপূর্ব্বক জন কয়েক কনষ্টেবল্ তাহাকে স্থানান্তরে লইয়া গেল।

এদিকে ফাঁসির সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত। নকড়ীকে ফাঁসি কাটে উঠাইবার সময় যথা নিয়ম অনুসারে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার কিছু বলিবার আছে কি না।" নকড়ী উত্তর করিল "আমার আর কি বলবার থাকবে, তবে এক কথা এই আমি রামটহলকে যেরূপ প্রহার কোরেছিলাম তাতে তার মরবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সে যদি মরে থাকে তা হলে আমার এই প্রাণদণ্ড উচিত দণ্ড বটে তার সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আর কয়েক দিন দেরী কোরে এবং সবিশেষ অনুসন্ধান কোরে আমার ফাঁসি দিতেন তা হলে ভাল হ'ত। আজই আমার ফাঁসি দিচ্চেন তাতে আমার আপত্য নাই কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল বিলম্ব কোল্লে ভাল হ'ত।

নকড়ীর মাতা লাট সাহেবের দোহাই দিয়া অপেক্ষাকৃত হৃষ্টচিত্তে বসিয়া আছে, ভাবিতেছে নকড়ীর আর ফাঁসি হইবে না। কিন্তু এদিকে ফাঁসির সমস্ত প্রস্তুত। নকড়ীকে ফাঁসি কাটের উপর তুলিতেছে এমন সময় দৃষ্ট হইল দূরে একজন সাহেব একটী সোলার টুপি মাথায় দিয়া একটী বৃহৎ অশ্বোপরি আরোহণ পূর্ব্বক প্রবল বেগে অশ্ব চালন করিয়া ফাঁসির স্থানাভিমুখে আসিতেছে। তর্দ্দশনে জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কহিলেন "একটু বিলম্ব করিয়া ফাঁসি দিলে ভাল হয়। এই যে লোকটী

প্রবল বেগে অশ্ব চালনা করিয়া আসিতেছে বোধ হয় উহার কোন বিশেষ ব্যক্তব্য আছে। যেরূপ বেগে আসিতেছে বোধ হয় আর পাঁচ মিনিটের মধ্যেই এখানে আসিয়া পৌছিবে। আর পাঁচ মিনিটের দেরীতে কোন ক্ষতি হইবে না।

পুলিস সাহেব ও উকীল সরকার উভয়েই এক দলের লোক। লোকের দোষ সাব্যস্ত হইলে উভয়েই খুসি হন। জেলে গেলে কিম্বা ফাঁসি হইলে উভয়েরই আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু রেহাই পাইলে ইঁহাদিগের পুত্রশোকের অপেক্ষা অধিক কষ্ট হয়। জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কথার প্রত্যুত্তরে পুলিস সাহেব কহিলেন "ও কে আসিতেছে কে জানে, বোধ হয় কোন নীলকর ফাঁসি দেখিতে আসিতেছে। উহার অনুরোধে আমাদিগের উপস্থিত কার্য্যে বিলম্ব করিবার প্রয়োজন নাই" এই বলিয়া তিনি নকড়ীকে ঝুলাইবার আদেশ দিলেন।

পূর্ব্বদিবস যথা সময়ে লাট সাহেবের হুকুম হাইকোর্টে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। হাইকোর্ট হইতে সে হুকুম অবিলম্বে তার যোগে জেলায় পাঠান হইল। অর্থাৎ যে জেলায় নকড়ীর ফাঁসি হইবার কথা। হুকুমটী ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নামে আসিয়াছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের সর্দ্দার বেহারা দস্তখত দিয়া টেলিগ্রামটী লইল। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের হুকুম নাই যে সাত টার অগ্রে কেহ তাঁহাকে জাগরিত করে। এদিকে ফাঁসি সাড়ে ছয়টার সময় হইবে নির্দ্ধারিত হইয়াছে। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যখন সাত টার সময় গাত্রোত্থান করিলেন বেহারা টেলিগ্রামটী লইয়া তাঁহার নিকট পেস করিল। টেলিগ্রামটী দেখিয়া

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব জ্ঞান শূন্যপ্রায় হইলেন। অবিলম্বে তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগামী অশ্ব সাজাইতে বলিলেন। অশ্ব সজ্জিত হইবামাত্র তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ পূর্ব্বক দ্রুত বেগে অশ্ব চালাইতে লাগিলেন। পুলিস সাহেব ইঁহাকে দেখিয়াই নীলকর সাহেব মনে করিয়াছিলেন। সুতরাং ইঁহার যাইবার পূর্ব্বেই ফাঁসি কার্য্য সমাধা করিয়া বসিয়া ছিলেন। পরিশেষে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব গিয়া টেলিগ্রামের বার্ত্তা সকলকে অবগত করাইলেন তাহারা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি সন্তাপিত হইল। সকলেরই হরিষে বিষাদ হইল।

নকড়ীর মাতা লাট সাহেবের আদেশ অনুসারে লাট সাহেবের দোহাই দিয়াছিল। ভাবিয়াছিল আর নকড়ীর ফাঁসি হইবে না। কিন্তু ক্ষণকাল পরেই যে তাহার ফাঁসি হইল তাহা সে জানিতে পারে নাই। পুলিসের লোক তাঁহাকে স্থানান্তরে লইয়া গিয়াছিল। পরে যখন ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট যে টেলিগ্রাম আসিয়াছিল তাহার মর্ম্ম অবগত হইল তখন তাহার অহ্লাদের আর সীমা রহিল না। নকড়ীকে কোলে করিবে এই মনে করিয়া দৌড়িয়া যেখানে ফাঁসির আয়োজন হইয়াছিল সেইখানে গমন করিল। গমন করিয়াই দেখিল নকড়ীর মৃত দেহ ঝুলিতেছে। তখন "নকড়ীরে" বলিয়া এক চিৎকার করিয়া জ্ঞান শূন্য হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল এবং অবিলম্বে তাহার প্রাণ বায়ু বহির্গত হইল।

রামটহল ধৃত হইয়া প্রথমতঃ কলিকাতা পুলিসকোর্টে আনীত হইল। তথাকার ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশানুসারে সেনাক্ত করণার্থ রায় মহাশয়ের বাটী প্রেরিত হইল।

রায় মহাশয়ের বাটীতে সমারোহের সীমা নাই। বৈকালে কথকথা হইয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্য মহাশয় কথক, তিনিই এই কথকথা করিয়াছেন। সায়াহ্নে ঝাড় লণ্ঠন বাতিতে রায় মহাশয়ের বাটীতে বোধ হইল যেন রজনী প্রবেশ করিতে পারে নাই। সর্ব্বত্রই দিবাভাগের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। একদিকে গোবিন্দ অধিকারীর যাত্রা হইতেছে অপরদিকে দাসরথি রায়ের পাঁচালী হইতেছে। পান তামাক অনবরত বিতরিত হইতেছে, স্থান বিশেষ লিমনেড সোডাওয়াটর খরচ হইতেছে। দুই এক স্থানে অত্যন্ত গোপনে ব্রাণ্ডি হুইস্কিও চলিতেছে। সংক্ষেপত রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আনন্দের সীমা নাই। এমন সময় তাঁহার দ্বারবান আসিয়া সংবাদ দিল তিন চারি জন ব্যক্তি বাহিরে দণ্ডায়মান আছে, তাঁহার সহিত দেখা করিতে চাহিতেছে। কোন না কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি হইবে এই মনে করিয়া রায় মহাশয় শ্রবণমাত্র ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বহির্বাটী গমন করিলেন। বাহিরে গিয়া দেখিলেন রামটহল সশরীরে বিরাজমান। পথিক সম্মুখে সর্প দেখিয়া যতদূর ভীত না হয় রায় মহাশয় রামটহলকে অবলোকন করিয়া তদপেক্ষা সহস্রগুণ অধিক ভীত হইলেন। পূর্ব্বের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্মৃত হইয়া অকস্মাৎ "এ কে রামটহল যে" বলিয়া বিকৃতস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিলেন। পুলিসের লোকদিগের আর অধিক

কিছু জানিবার প্রয়োজন রহিল না। রায় মহাশয়কেও অবিলম্বে নিজ হাওয়ালে করিল। ক্ষণকাল পরে ভট্টাচার্য্য মহাশয়কেও তদ্রূপ বাহিরে ডাকিয়া আনিয়া রায় মহাশয়ের প্রতি যেরূপ করিয়াছিল সেইরূপ করিল। বটব্যালের ইতিপূর্ব্বে কাল হইয়াছে সুতরাং তিনি পার্থিব পুলিসের আর অধীনে নাই। রায় মহাশয়কে ও ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে পুলিসের লোক ধরিয়া লইয়া গেল।

গীত বাদ্য বন্ধ হইল। আনন্দের স্রোত বন্ধ হইল। নিমন্ত্রিত ব্যক্তিরা যে যাহার বাটীতে চলিয়া গেল। সূর্য্যালোক সদৃশ আলো নিবিয়া গেল। রায় মহাশয়ের হরিষে বিষাদ হইল।

রায় মহাশয় ভট্টাচার্য্য মহাশয় ও রামটহল মোকর্দ্দমা অন্তে যথাসময়ে পুলিপোলাও প্রেরিত হইলেন।

সমাপ্ত।